ISSN-0971-8435

যোজনা

ধনধান্যে

জুন ২০১৬ | উন্নয়নমূলক মাসিক পত্রিকা | ₹ ২২

প্রগতির পথে ভারত

উন্নয়নের লক্ষ্যপূরণ : চাই আমজনতার ক্ষমতায়ন

চরণ সিং

বৈদ্যুতিন-প্রশাসন : লক্ষ্য সর্বাধিক মানুষের কাছে পৌঁছনো

ড. রঞ্জিৎ মেটা

ফোকাস

কৃষি ও কৃষকের কল্যাণ : বর্তমান হালহকিকৎ

জে পি মিশ্র

বিশেষ বিভাগ : যোগ

সুস্থ ও মানসিক চাপমুক্ত জীবনযাপনে যোগচর্চার ভূমিকা

ড. ঈশ্বর এন আচার্য এবং ড. রাজীব রাস্তোগী

আধুনিক জীবনশৈলীর প্রেক্ষিতে যোগের গুরুত্ব

ঈশ্বর ভি. বাসবারেড্ডি

যোগ প্রশিক্ষণ : মূল্যায়ন ও শংসিতকরণ পদ্ধতির নানান দিক

রবি পি সিং এবং মণীশ পাণ্ডে

প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনার সূচনা

সূত্র : http://pib.nic.in

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ১ মে, ২০১৬-তে বালিয়ায় 'প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনা'-র সূচনা করেন। দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারি ৫ কোটি মানুষের জন্য আগামী তিন বছরের মধ্যে রান্নার গ্যাসের সংযোগের ব্যবস্থা করা এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য। এর জন্য ৮ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এই প্রকল্পে দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারি পরিবারগুলোকে সংযোগ পিছু ১৬০০ টাকার আর্থিক সহায়তা দেওয়া হবে। কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চল ও রাজ্য সরকারের সঙ্গে পরামর্শ করে সুবিধাভোগীদের চিহ্নিত করা হবে। ২০১৬-১৭, ২০১৭-১৮ ও ২০১৮-১৯—এই তিন অর্থ বছর ধরে এ প্রকল্পের কাজ চলবে। আমাদের দেশের ইতিহাসে এই প্রথমবার কোনও জনকল্যাণ প্রকল্প দরিদ্র থেকে দরিদ্রতম পরিবারের মহিলাদের প্রধান সুবিধাভোগী হিসেবে চিহ্নিত করেছে। এ দেশে খুব সীমিত সংখ্যক দরিদ্র মানুষের কাছে রান্নার গ্যাসের সংযোগ রয়েছে। শহর ও শহরতলিতে মূলত মধ্য ও উচ্চবিত্তদের মধ্যেই রান্নার গ্যাসের সংযোগের প্রসার ঘটেছে। কিন্তু জীবাশ্ম জ্বালানি রান্নার জন্য ব্যবহার করা স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকারক। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পরিসংখ্যান অনুযায়ী ভারতে প্রায় ৫ লক্ষ মানুষের মৃত্যুর কারণ রান্নার জন্য অস্বচ্ছ জ্বালানির ব্যবহার। এই সব অকাল মৃত্যুর বেশিরভাগই ঘটছে হৃদরোগ, স্ট্রোক, ক্রনিক অবস্ট্রাকটিভ পালমোনারি ডিজিজ (এক ধরণের দীর্ঘস্থায়ী ফুসফুসের অসুখ) ও ফুসফুসে ক্যান্সারের মতো অ-সংক্রামক রোগে। অনেক ক্ষেত্রে এও দেখা গেছে যে ঘরের ভিতরেরই দূষিত বায়ু (ইন্ডোর পলিউশান) ছোট বাচ্চাদের মধ্যে তীব্র শ্বাসকষ্ট জনিত অসুখের মূল কারণ। বিশেষজ্ঞদের মতে, অস্বাস্থ্যকর জ্বালানি দিয়ে রান্নাঘরে আগুন জালানো ঘণ্টায় ৪০০ সিগারেট পোড়ানোর সমান। দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারি পরিবারগুলোর কাছে রান্নার গ্যাসের সিলিন্ডার পৌঁছে দিতে পারলে দেশে এই পরিষেবার সর্বজনীন প্রসার সুনিশ্চিত করা সম্ভব হবে। এতে মহিলাদের ক্ষমতায়ণ ঘটবে ও তাদের সুস্বাস্থ্য রক্ষিত হবে; রান্না করার পরিশ্রম কমবে ও সময়ও বাঁচবে। এই প্রকল্পের ফলস্বরূপ গ্রামাঞ্চলে গ্যাস সিলিন্ডার সরবরাহ শৃঙ্খলে কর্মসংস্থানের সুযোগও সৃষ্টি হবে।

জুন, ২০১৬

যোজনা

পত্রিকা গোষ্ঠীর বাংলা মাসিক

ধনধান্যে

প্রধান সম্পাদক : **দীপিকা কাচ্ছাল**

সম্পাদক : **রমা মন্ডল**

সহ-সম্পাদক : **পম্পি শর্মা রায়চৌধুরী**

সম্পাদকীয় দপ্তর : ৮ এসপ্লানেড ইস্ট
কলকাতা-৭০০ ০৬৯

ফোন : (০৩৩) ২২৪৮-২৫৭৬

গ্রাহক মূল্য : ২৩০ টাকা (এক বছরে)
৪৩০ টাকা (দু-বছরে)
৬১০ টাকা (তিন বছরে)

ওয়েবসাইট : www.publicationsdivision.nic.in
www.facebook.com/bengaliyojana

প্রকাশিত মতামত লেখকের নিজস্ব, ভারত সরকারের নয়।

পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের বক্তব্য ও বানান আমাদের নয়।

- এই সংখ্যায় ৩
- এই সংখ্যা প্রসঙ্গে ৪

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

- উন্নয়নের লক্ষ্যপূরণ : চাই আমজনতার ক্ষমতায়ন — চরণ সিং ৫
- বৈদ্যুতিন-প্রশাসন : লক্ষ্য সর্বাধিক মানুষের কাছে পৌঁছনো — ড. রঞ্জিৎ মেটা ৮
- প্রধানমন্ত্রী জন-ধন যোজনা : আর্থিক অন্তর্ভুক্তিতে বড় ভূমিকা নিয়েছে — রঞ্জিৎ রায় ১১
- কূটনীতি : দেশে সবার উন্নয়ন ও বিশ্বাঙ্গণে আরও প্রভাব বিস্তার — অচল মালহোত্রা ১৮
- মিশন ইন্দ্রধনুষ : এক স্বপ্ন শপথ — ড. অজয় কুমার চক্রবর্তী ২২
- স্বচ্ছ ভারত মিশন (গ্রামীণ) : পশ্চিমবঙ্গের প্রেক্ষাপট ও মিশন নির্মল বাংলা — সোনালি দত্ত রায় ২৬

বিশেষ বিভাগ

- যোগ : রোগ প্রতিরোধ এবং সুস্বাস্থ্য ও জীবনশৈলীর গুণমান বাড়াতে এক কার্যকর পন্থা — ড. এইচ. আর. নাগেন্দ্র ৩৩
- সুস্থ ও মানসিক চাপমুক্ত জীবনযাপনে যোগচর্চার ভূমিকা — ড. ঈশ্বর এন. আচার্য এবং ড. রাজীব রাস্তোগী ৩৭
- আধুনিক জীবনশৈলীর প্রেক্ষিতে যোগের গুরুত্ব — ঈশ্বর ভি. বাসবারেড্ডি ৪০
- যোগ প্রশিক্ষণ : মূল্যায়ন ও শংসিতকরণ পদ্ধতির নানান দিক — রবি পি. সিং এবং মণীশ পাণ্ডে ৪৩

বিশেষ নিবন্ধ

- জীববৈচিত্র্য : একটি সাধারণ ধারণা ও কিছু কর্মকাণ্ড — ড. সৌমেন্দ্রনাথ ঘোষ ৪৭

ফোকাস

- কৃষি ও কৃষকের কল্যাণ : বর্তমান হালহকিকৎ — জে. পি. মিশ্র ৫২

নিয়মিত বিভাগ

- জানেন কি? — সংকলক : ভাটিকা চন্দ্রা ৫৫
- যোজনা ডায়েরি — সংকলক : রমা মন্ডল এবং পম্পি শর্মা রায়চৌধুরী ৫৬
- যোজনা ক্যুইজ — ঐ ৬৬

এই সংখ্যা প্রসঙ্গে

প্রগতির পথে এক রাষ্ট্র

রাষ্ট্রের বিকাশ অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতি, মানব সম্পদ ও পরিবেশের মতো একাধিক বিষয়ের উপর নির্ভরশীল। এই সব বিষয় একদিকে, একে অপরের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত; অন্যদিকে, এককভাবেও প্রত্যেকটি বিষয় জাতীয় উন্নয়নে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই সব ক্ষেত্রে এক বা একাধিক সমস্যার জেরে বেশির ভাগ উন্নয়নশীল দেশের প্রগতির পথে নানা বাধা-বিপত্তি মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। সামাজিক উন্নয়নের সঙ্গে তাল মিলিয়ে হতে হবে অর্থনৈতিক উন্নয়ন। কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, পরিবহণ, সেচ, শক্তি সম্পদ, প্রভৃতি ক্ষেত্রে উন্নতি অর্থনৈতিক পরিবর্তনের ইঙ্গিত; ঠিক একইভাবে, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, আবাসন, পানীয় জলের মতো ক্ষেত্রে উন্নতি সামাজিক উন্নয়নের প্রতীক। অবশ্য, উভয়ই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে সাধারণ মানুষের আর্থিক অবস্থার উপর নির্ভর করে।

আর্থিক বিকাশের আরও প্রসার ঘটিয়ে, এর সুফল সবার কাছে পৌঁছে দিয়ে, এই প্রক্রিয়াকে আরও সর্বাত্মক করার প্রয়োজন সব সময়ই অনুভব করা হয়েছে। সর্বাত্মক বিকাশের অর্থ হল এমন এক আর্থিক বিকাশ, যা মৌলিক প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম, যার ফলে সার্বিক কল্যাণের ভিত মজবুত হওয়ার পাশাপাশি সুযোগও সৃষ্টি হয়। সকলের জন্য সমান সুযোগ প্রদান করা, শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে মানুষের ক্ষমতায়নও এর অঙ্গ।

অবশ্য, সবচেয়ে বড় সমস্যা হল ১২০ কোটি জনসংখ্যা বহুল বৈচিত্রময় এই দেশের প্রতিটি প্রান্তে ও সমাজের সব স্তর পর্যন্ত বিকাশ প্রসারিত করা আর এখানেই সরকারের ভূমিকার প্রাসঙ্গিকতা। তাই, সব দিক বিচার করে সরকারি নীতি ও প্রকল্পের রূপরেখা নির্ধারণ করতে হয়। পরিকল্পনাকার ও নীতি প্রণেতাদের এ কথা মাথায় রাখতে হয় যে শুধু মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন ও মাথা পিছু আয় দিয়েই দেশের মানুষের উন্নয়ন সুনিশ্চিত করা সম্ভব নয়। দক্ষ মানব সম্পদই হল যে কোনও সমাজে বিকাশের প্রথম ধাপ। সকলের জন্য জীবিকা সুনিশ্চিত করার মতোই প্রত্যন্ত এলাকার বা দরিদ্রতম শিশু-সহ সকলের জন্য উচ্চমানের শিক্ষা সুনিশ্চিত করে মানব সম্পদ উন্নয়নও সমানভাবে জরুরি। উন্নয়নের মাপকাঠির তালিকায় এখন পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়ও যুক্ত করা হয়েছে। কারণ, আজ জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্কটের প্রভাব অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন, উভয় ক্ষেত্রেই পড়ছে। খরা ও বন্যার মতো দুর্যোগ, অর্থনীতির পাশাপাশি কৃষক সম্প্রদায়ের সামাজিক কাঠামোর উপরও আঘাত হানে, এবং সরকারকে এই বিষয়টাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

যোজনা

কেন্দ্রীয় সরকারের সাম্প্রতিক নীতি ও প্রকল্পের বেশিরভাগেরই মূল লক্ষ্য সমাজের সব থেকে নিচু স্তরের মানুষের কাছে পৌঁছে যাওয়া। কৃষিক্ষেত্র ও কৃষকের কল্যাণসাধনের উদ্দেশ্যে বাজেটে বিপুল অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে; সমাজের প্রান্তিক গোষ্ঠীর মানুষদের মূলস্রোতে আনতে ও তাদের দ্রুত আর্থিক বিকাশের সুযোগ-সুবিধা দিতে প্রধানমন্ত্রী জন ধন যোজনা, মুদ্রা ব্যাংক, সেতু (SETU), 'বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও'-এর মতো একাধিক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। দেশে সুস্থায়ী সুরক্ষা চক্র গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রী জীবন জ্যোতি বিমা যোজনা, প্রধানমন্ত্রী জীবন সুরক্ষা যোজনা ও অটল পেনশান যোজনার সূচনা করা হয়েছে। পরিকাঠামো প্রত্যেক নাগরিকের জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত বলে আবাসন, সড়ক, রেল বা গ্রামীণ পরিকাঠামো, সব ধরনের পরিকাঠামোর ক্ষেত্রেই যে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে, তা যুক্তিসঙ্গত। সাধারণ মানুষ যাতে উন্নয়নের সুবিধা পায়, তা সুনিশ্চিত করতে 'প্রত্যক্ষ সুবিধা হস্তান্তর'-এর মত প্রকল্পের মাধ্যমে সরকার 'ই-গভর্নেন্স' (বৈদুতিন পরিষেবা নির্ভর প্রশাসনিক ব্যবস্থা)-এর উপর জোর দিয়েছে। নিয়োগযোগ্যতা বৃদ্ধির জন্য দক্ষতা উন্নয়ন, উদ্যোগ স্থাপনের জন্য 'স্টার্ট আপ ইন্ডিয়া' ও 'স্ট্যান্ড আপ ইন্ডিয়া', এ সবই 'সবার বিকাশ'-এর লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে সাহায্য করেছে।

যদি নাগরিকরা সুস্থ থাকেন, তবেই উন্নয়নের সুফল উপভোগ করা সম্ভব। আজ সারা দুনিয়া সুস্বাস্থ্য বজায় রাখতে যোগের ভূমিকা অনুধাবন করেছে বলে, প্রত্যেক বছর ২১ জুন আন্তর্জাতিক যোগ দিবস হিসেবে পালন করা হচ্ছে। পৃথিবীর সর্বত্র যোগচর্চা পৌঁছে দিতে রাষ্ট্র হিসেবে ভারতের ভূমিকা সব থেকে তাৎপর্যপূর্ণ।

একটা সময় এমনও ছিল যে নির্ভরশীল ও অতি-দরিদ্র ভারতকে খাদ্য আমদানি করতে হত; বেকারত্ব, অপুষ্টি ও রোগব্যাধি আমাদের মানব সম্পদের ক্ষতি করছিল। সে সব দিন পিছনে ফেলে রেখে আজ আমাদের দেশ অনেক এগিয়ে গেছে। স্বাধীনতার পর ছ'দশকেরও বেশি সময় কেটে যাওয়ার পর এক স্বাধীন শক্তি হিসেবে গণ্য হবার লক্ষ্যের অনেক কাছে ভারত পৌঁছে গেছে। ভারত এখন প্রগতির পথে আগুয়ান এক রাষ্ট্র। ❑

উন্নয়নের লক্ষ্যপূরণ : চাই আমজনতার ক্ষমতায়ন

স্বাধীনতা-পরবর্তী সরকার নিয়ন্ত্রিত পরিকল্পিত অর্থনীতির ছত্রছায়া থেকে বেরিয়ে একুশ শতকের একদম গোড়ার দিকে ভারত বাজার অর্থনীতির এক গুরুত্বপূর্ণ দেশ হিসাবে স্বীকৃতি পায়। এবং ২০১৫ সালের পর থেকে ভারত বিশ্বের দ্রুততম বিকাশ অর্থনীতির দেশে পরিণত হয়। ফলত, দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী মানুষের সংখ্যাও মোট জনসংখ্যার ৩০ শতাংশেরও নিচে নেমে আসে। ভারতীয় অর্থনীতির এই অভূতপূর্ব বিকাশ ও উত্তরণের আখ্যানে হতাশাজনক বেশ কয়েকটি দিকও রয়েছে। দেশে জনসংখ্যার এক বিরাট অংশ তরুণ বয়সী এবং ২০২২ সাল নাগাদ কর্মপ্রার্থীর সংখ্যা বিপুল বৃদ্ধি পেয়ে ১০০ কোটিতে দাঁড়াবে। অথচ কর্মসংস্থানের সুযোগ অত্যন্ত সীমিত। এদিকে ব্যাংকিং নেটওয়ার্কের দুর্বলতার কারণে দেশের এক বিশাল সংখ্যক মানুষ ব্যাংকিং পরিষেবার আওতার বাইরেই রয়ে যাওয়ায় আর্থিক অন্তর্ভুক্তির দিকটি অবহেলিত রয়ে গিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে দেশের অর্থনীতিকে পুনরুজ্জীবিত করে ৯ শতাংশ বিকাশহারে পৌঁছানোর লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় সরকার গত দু'বছর ধরে ধাপে ধাপে বিভিন্ন কার্যকরী উদ্যোগ নিয়েছে। এই সব প্রকল্প/উদ্যোগের মধ্যে অন্যতম 'মেক ইন ইন্ডিয়া', PMJDY, মুদ্রা ব্যাংক, 'স্ট্যান্ড-আপ ইন্ডিয়া', অটল উদ্ভাবনী মিশন, স্কিল ইন্ডিয়া মিশন ইত্যাদি। বর্তমান নিবন্ধে এই সব প্রকল্পের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন—অধ্যাপক **চরণ সিং**

দেশের অর্থনীতিকে পুনরুজ্জীবিত করে ৯ শতাংশ কেন্দ্রীয় বিকাশহারে পৌঁছনোর লক্ষ্যে সরকার বিগত দু বছর ধরে সচেষ্ট। ২০১৪-এর মে মাসের পর থেকে পর্যায়ক্রমে ঘোষিত বিভিন্ন ব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য ছিল উন্নয়নমুখী নীতির সাহায্যে বিকাশের উচ্চতর হার সুনিশ্চিত করা। দীর্ঘ কয়েক শতক ধরে বিদেশি শাসনের বজ্রমুষ্টিতে দেশের সম্পদ রিক্ত হয়েছে, নিম্নমুখী হয়েছে মাথাপিছু অর্থনৈতিক অগ্রগতি। ১৯৫১ সালে জনসংখ্যার প্রায় ৫৩ শতাংশ (২০ কোটি) দারিদ্র্যসীমার নিচে থাকায় ভারত তখন এক অতিনিম্ন আয়বিশিষ্ট দেশ বলে চিহ্নিত হত। স্বাধীনোত্তর বছরগুলিতে অনুসৃত হয় প্রধানত সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনা-নির্ভর এক মিশ্র আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা। এরপর একাধিক পদক্ষেপ ও নীতি পরিবর্তনের মধ্যবর্তিতায় (যার কয়েকটির ক্ষেত্রে চালিকাশক্তি ছিল উদ্ভূত সঙ্কটের মোকাবিলা) একুশ শতকের গোড়ার দিকে ভারত একটি গুরুত্বপূর্ণ বাজার অর্থনীতির দেশ বলে স্বীকৃতি পায়। ২০১৫-এর পর থেকে ভারত বিশ্বের দ্রুততম বিকাশ অর্থনীতির দেশে পরিণত হয়, যে দেশে সংশোধিত ও উচ্চতর সূচক ধার্য হওয়া সত্ত্বেও দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী মানুষের সংখ্যা সাফল্যের সঙ্গে জনসংখ্যার ৩০ শতাংশেরও নিচে নেমে এসেছে। এখন আগামী ৫ বছরে অর্থনীতির সামনে লক্ষ্য হল ৭.৩ শতাংশ বা আরও বেশি বিকাশহার অর্জন করা। ভারতীয় অর্থনীতির এই অভূতপূর্ব বিকাশ ও উত্তরণের আখ্যানে একদিকে যেমন কৃষির অবদান সঙ্কুচিত হয়েছে, অন্যদিকে দ্রুত বেড়েছে পরিষেবা ক্ষেত্রের ভূমিকা। শিল্পক্ষেত্রটি অবশ্য প্রায় ২৫ শতাংশের স্থিতাবস্থায় রয়েছে। মজবুত ভিতের ওপর দাঁড়িয়ে অর্থনীতিকে স্থিতিশীল অগ্রগতির পথে নিয়ে যেতে শিল্পক্ষেত্রের ভূমিকাকে আরও শক্তিশালী করা দরকার। এই প্রেক্ষিতেই ২০১৪-এর মে মাসে ক্ষমতাসীন হওয়ার পর প্রধানমন্ত্রী যে 'মেক ইন ইন্ডিয়া' অভিযান শুরু করেছিলেন, তা তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

অগ্রগতি অর্জন ও শিল্পোৎপাদনের ভিত্তি গড়ে তুলতে আর্থিক সংস্থান-সহ আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত রয়েছে। উন্নয়নের প্রাথমিক স্তরে ব্যাংকিং ব্যবস্থার ব্যাপ্তি অপরিহার্য। তাই শুধুমাত্র ব্যাংকিং নেটওয়ার্ক স্থাপন করাই নয়, এই ব্যবস্থাকে সর্বত্র প্রসারিত করে সকল নাগরিকদের কাছে পৌঁছনোর প্রয়াস নেওয়া হয়েছিল। প্রয়োজন ছিল বিকাশের আদর্শ পরিমণ্ডল গড়ে তোলারও, যেখানে আর্থিক সম্পদের সংস্থান ছাড়াও ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা সহজ হবে এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা পাবে। প্রধানমন্ত্রীর জনধন যোজনার আওতায় ব্যাংক অ্যাকাউন্টের সুবিস্তার ঘটানো ছাড়াও সরকারি উদ্যোগে ঘোষিত হয়েছে মুদ্রা ব্যাংক, অটল উদ্ভাবনা মিশনের মতো আরও কয়েকটি সময়োচিত পদক্ষেপ।

প্রসঙ্গত, এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ভারত ইতিমধ্যেই বিশ্বের দ্রুততম বিকাশশীল দেশগুলির অন্যতম হয়ে উঠেছে এবং দেশের জনসংখ্যার এক বিরাট অংশ তরুণ বয়সী হওয়ায় এদের সম্ভাবনাকে এবার কাজে লাগাতে হবে। এজন্য কৃষি বাদে অন্যান্য ক্ষেত্রে আগামী এক দশকের মধ্যে এক কোটি দশ লক্ষ কর্মসংস্থান সুনিশ্চিত করতে হবে। কারণ এই সময়ের মধ্যে দেশের জনসংখ্যার প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ কর্মক্ষম হয়ে উঠবে। ২০২২ সাল নাগাদ ভারতে কর্মপ্রার্থীর সংখ্যা বিপুল বৃদ্ধি পেয়ে ১০০ কোটিতে দাঁড়াবে, তাই বেকারিজনিত কারণে সামাজিক আন্দোলন ও বিক্ষোভের উৎসারকে এড়াতে গেলে এদের যথাযথ কর্মনিযুক্তি আবশ্যক। স্বাধীনতা-পরবর্তী পরিকল্পিত অর্থনীতির বছরগুলিতে ক্রমবর্ধমান কর্মপ্রার্থীদের নিযুক্তির দায়িত্ব ছিল মুখ্যত সরকারের। তবে পরবর্তী ধাপে কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে বেসরকারি উদ্যোগগুলির ভূমিকাও বড় হয়ে ওঠে। এসব সত্ত্বেও ২০১২ সালের হিসাবেই দেখা

যায় দেশের কর্মরত মানুষদের ৯০ শতাংশই নিয়োজিত ছিলেন অসংগঠিত ক্ষেত্রগুলিতে। ভবিষ্যতের দিনগুলিতে বার্ষিক প্রায় ১ কোটি ১০ লক্ষের কর্মসংস্থানের সুরাহায় উদ্যোগপতি ও নিয়োগকারী সংস্থাগুলির উল্লেখযোগ্য ভূমিকার সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়েছে।

ব্যাংকিং-এর ভূমিকা কী হবে?

সুস্থিত উন্নয়নের জন্য একটি পাকাপোক্ত আর্থিক ব্যবস্থার ভূমিকা খুব জরুরি। সুষ্ঠু ব্যাংকিং ব্যবস্থার অন্যতম লক্ষ্য হল সঞ্চয়কারীদের সম্পদ উৎপাদনশীলতার স্বার্থেই বিনিয়োগকারীদের জন্য বরাদ্দ করা। সম্পদের রূপান্তর ক্ষেত্রে ব্যাংকের এই ভূমিকা অর্থনীতিকে এগিয়ে নিয়ে যায় এবং ব্যাংকিং ব্যবস্থার সর্বজনীনতা দারিদ্র্য দূরীকরণের সহায়ক হয়। আর্থিক পরিষেবা যদি সকলের কাছে পৌঁছতে ব্যর্থ হয়, তাহলে সম্পদহীন উদ্যোগীদের মূলধন ঘাটতিরও সুরাহা হবে না এবং আয়ের অসাম্য দারিদ্র্যকে আরও তীব্র করে তুলবে।

ব্যাংক ঋণ ও অর্থসাহায্য ব্যবস্থাকে প্রসারিত ও সহজলভ্য করার উদ্দেশ্যে, বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে, ১৯৫৫ সালের জুলাই মাসে স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার জাতীয়করণ ঘটে। পরবর্তী পর্যায়ে ১৯৬৯ সালে ১৪টি বাণিজ্যিক ব্যাংককে এবং ১৯৮০ সালে আরও ৫টি ব্যাংককে রাষ্ট্রায়ত্ত করা হয়। মুষ্টিমেয় কয়েকটি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান ব্যাংকিং সম্পদের নিয়ন্ত্রক হয়ে উঠবে বলে জনমানসে যেসব সংশয় ছিল তা দূর করাই হল জাতীয়করণের অন্যতম কারণ। সেই সঙ্গে সামাজিক ন্যায়বিচার-সহ আর্থিক অগ্রগতি অর্জনের কথাও ভাবা হয়েছিল। আরও পরে ভারতীয় ব্যাংকিং ব্যবস্থায় আমরা কাঠামোগত রূপান্তর দেখতে পাই; যার ফলে কৃষি, অতি-ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ এবং শিল্পক্ষেত্রে বিপুল পরিমাণ ঋণ জোগানো সম্ভব হয়। এতদিন অবধি সমাজের যেসব শ্রেণি ব্যাংকিং ব্যবস্থার আওতাধীন হননি তাদের অন্তর্ভুক্তির জন্য ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংক এবং জাতীয় কৃষি ও গ্রামোন্নয়ন ব্যাংক বা নাবার্ডের বলিষ্ঠ প্রয়াসও এখানে উল্লেখের দাবি রাখে। এত কিছু সত্ত্বেও ২০১১ সালের আদমশুমারি প্রতিবেদনে দেখা যায় যে, ভারতে ২৪ কোটি ৭০ লক্ষ পরিবারের মধ্যে মাত্র সাড়ে ১৪ কোটি (৫৮.৭ শতাংশ) পরিবারকে ব্যাংকিং পরিষেবার অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হয়েছে।

এটাই ছিল ২০১৪ সালের আগস্ট মাসে চালু হওয়া প্রধানমন্ত্রী জনধন যোজনার প্রারম্ভিক পটভূমিকা। যোজনাটির প্রধান লক্ষ্য হল সুলভে যাবতীয় ব্যাংকিং পরিষেবা, যেমন—অ্যাকাউন্ট খোলা, অর্থ প্রেরণ, ঋণ, বিমা, পেনসন প্রদান প্রভৃতির সুযোগ-সুবিধা সুলভে সকলের কাছে পৌঁছিয়ে দেওয়া। এর আওতায় চলতি বছরের ২৭ এপ্রিল পর্যন্ত খোলা হয়েছে ২১ কোটি ৭০ লক্ষ ব্যাংক অ্যাকাউন্ট। ২০১৪ সালের ৩১ মার্চ পর্যন্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলিতে অ্যাকাউন্ট গ্রহীতার সংখ্যার নিরিখে এবারের এই অন্তর্ভুক্তি বিপুল অগ্রগতির আভাস দেয়। আরও উল্লেখযোগ্য যে নতুন অ্যাকাউন্টগুলির মধ্যে ১৭ কোটি ৯০ লক্ষকে RuPay কার্ড ইস্যু করা হয়েছে, ৯ কোটি ৭০ লক্ষকে আধারযুক্ত করা হয়েছে এবং অ্যাকাউন্টগুলির ৮৩.৬ শতাংশই ইতিমধ্যে সক্রিয়তায় প্রমাণ দিয়েছে। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলি খুলেছে ২০ কোটি ৯০ লক্ষ অ্যাকাউন্ট, যার মধ্যে ১২ কোটি ৮০ লক্ষই গ্রামাঞ্চলে। রাজ্যওয়াড়ি হিসাবে সর্বোচ্চ সংখ্যক অ্যাকাউন্ট খোলা হয়েছে উত্তরপ্রদেশে (৩ কোটি ৩০ লক্ষ); যার ঠিক পরেই রয়েছে বিহার ও পশ্চিমবঙ্গ (প্রতিটিতে ২ কোটি)। সবচেয়ে বড় কথা এখন দেশের ৯৫ শতাংশের বেশি পরিবার ব্যাংকিং পরিষেবার আওতাভুক্ত হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী জনধন যোজনা এখন তথাকথিত 'জ্যাম' বা তিনের সমষ্টির অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এই ত্রিমুখী উদ্যোগ হল জনধন যোজনা, আধার এবং মোবাইল নম্বর যেগুলির সাহায্যে নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দরিদ্র পরিবারগুলির প্রতি সাহায্যের হাত প্রসারিত করা সম্ভব হবে। ওই তিনের সমষ্টিকে কারিগরি জ্ঞান ও সর্বাধুনিক পদ্ধতির ভিত্তিতে পরিচালিত করার দরুন একজন গ্রাহক ব্যাংকের শাখায় হাজিরা না দিয়ে মোবাইল ফোনের সাহায্যে ঋণ ও অন্যান্য ব্যাংকিং পরিষেবার সুযোগ নিতে পারবেন।

মুদ্রা ব্যাংক ও বিভিন্ন সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প

ক্ষুদ্র উদ্যোগীদের ঋণ দেবার উদ্দেশ্যে সরকারি প্রয়াসে ক্ষুদ্র ইউনিট উন্নয়ন অর্থ সাহায্য এজেন্সি (Micro Units Development Refinance Agency—MUDRA) বা মুদ্রা ব্যাংকের (MB) সূচনা হয় গত বছরের ৮ এপ্রিল। দেখা যায় যে, দেশে প্রায় ৬ কোটি এমন সংস্থা রয়েছে যেগুলির অধিকাংশই ব্যক্তিগত উদ্যোগে গড়ে উঠেছে এবং এগুলি নিয়োজিত রয়েছে ক্ষুদ্র উৎপাদন, ব্যবসা-বাণিজ্য বা পরিষেবামূলক কাজকর্মে এবং এদের মাত্র ৪ শতাংশ প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ বা অর্থ সাহায্যের সুযোগ নিতে পেরেছে। এসব ক্ষুদ্রায়তন সংস্থার বিকাশে তাদের দশ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ বা অর্থ সাহায্য জোগাতে মুদ্রা ব্যাংক অগ্রণী ও নিয়ন্ত্রণকারীর ভূমিকা নেবে। মুদ্রা ব্যাংকের উদ্যোগেই গ্রহীতাদের সুরক্ষার স্বার্থে রচিত হবে নীতি-নির্দেশাবলী; যাতে করে ক্ষুদ্র উদ্যোগীরা ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে কোনওভাবেই প্রতারিত না হন।

কেন্দ্রীয় সরকার গত বছরের ৯ মে অটল পেনসন যোজনা, প্রধানমন্ত্রী জীবনজ্যোতি বিমা যোজনা ও প্রধানমন্ত্রী সুরক্ষা বিমা যোজনা নামাঙ্কিত তিনটি জনমুখী প্রকল্প চালু করেন। তিনটি প্রকল্পই ব্যাংক অ্যাকাউন্টের সাহায্যে পরিচালিত হবে। এর ফলে একদিকে ব্যাংকিং শিল্পের বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি পাবে অন্যদিকে আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণের লক্ষ্যে অগ্রগতি আসবে।

খুব সম্প্রতি গত এপ্রিল মাসে প্রধানমন্ত্রী 'স্ট্যান্ড-আপ ইন্ডিয়া' প্রকল্প উদ্বোধন করেন। এই প্রকল্পের মধ্যবর্তিতায় সমাজের অবহেলিত শ্রেণি ও মহিলাদের ১০ লক্ষ থেকে ১ কোটি টাকা পর্যন্ত ঋণ দেওয়া হবে বাণিজ্যিক উদ্যোগ পরিচালনাকে উৎসাহ দিতে। এর আগে কেন্দ্রীয় বাজেটেও সদ্যস্থাপিত বা 'স্টার্ট আপ' ইউনিটগুলিকে উৎসাহিত ও শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে একাধিক ব্যবস্থা নেবার কথা ঘোষণা করা হয়। এগুলি হল সম্পদ বরাদ্দ, দক্ষতা বিকাশ কর্মসূচি প্রবর্তন, কর রেহাই, বাণিজ্য-সহায়ক পরিবেশ গঠন ইত্যাদি। বাজেট ঘোষণা ও

তার পরবর্তী ঘটনাবলি তথাকথিত স্টার্ট-আপ পদক্ষেপকে সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর স্থাপন করেছে এবং ভারতকে সত্বর 'কর্মসংস্থান সৃষ্টির' পথে নিয়ে যেতে সাহায্যকারীর ভূমিকা নিয়েছে।

একাধিক চ্যালেঞ্জ

সরকারের সাম্প্রতিক প্রয়াসসমূহ ফলপ্রসূ হচ্ছে। তবে আর্থিক ব্যবস্থায় সর্বজনীন অন্তর্ভুক্তি সুনিশ্চিত করে উচ্চতর বিকাশহারের লক্ষ্যপূরণে বেশ কয়েকটি চ্যালেঞ্জের সার্থক মোকাবিলা করা দরকার।

(১) **সুদের হার সম্পর্কিত বিষয়** : এটা স্বীকৃত সত্য যে, মহাজন বা কুসীদজীবীরা উচ্চহারে সুদ নেওয়া সত্ত্বেও খাতকরা বাণিজ্যিক ব্যাংককে এড়িয়ে তাদেরই শরণাপন্ন হয়ে থাকেন। কাছাকাছি ব্যাংক থাকলেও, এই অবস্থায় খতিয়ে দেখা দরকার কেন খাতকদের মধ্যে এই প্রবণতা? উচ্চহারে সুদের বিনিময়ে এদের থেকেই ঋণ নেবার এই সিদ্ধান্তের পিছনে হয়তো অন্য কোনও কারণ রয়েছে। সুদের হার ঋণ নেওয়ার সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করে থাকে বটে, তবে সেটাই একমাত্র কারণ—সেই সম্ভাবনা কম। এখানে প্রাচীন ইতিহাস থেকে চাণক্যের ঝুঁকি-ভারাক্রান্ত সুদের হার কাঠামোর কথা উল্লেখ করা যেতে পারে, যেখানে খাতকের ব্যবসায় ঝুঁকি থাকলে তার ক্ষেত্রে সুদের হারও বৃদ্ধি করার কথা বলা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, সাধারণ দাদনের ক্ষেত্রে বার্ষিক সুদের হার ১৫ শতাংশ হলেও ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে ওই হার দাঁড়াবে ৬০ শতাংশে। পণ্যসামগ্রী অরণ্যপথে বহন করা হলে ব্যবসায়ীকে ১২০ শতাংশ সুদ দিতে হবে অন্যদিকে যারা আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যের সঙ্গে জড়িত তাদের সুদের হার হবে বার্ষিক ২৪০ শতাংশ।

(২) **আর্থিক অন্তর্ভুক্তি** : প্রধানমন্ত্রী জনধন যোজনার আওতায় নতুন অ্যাকাউন্টগুলির সুষ্ঠু পরিচালনা ও এগুলিতে লেনদেনের পরিমাণ বাড়াতে সামগ্রিক ব্যাংকিং ব্যবস্থায় আস্থা সঞ্চার ও অনুকূল পরিমণ্ডল থাকা খুব জরুরি। আর্থিক অন্তর্ভুক্তির পথে যেসব বাধাবিপত্তি রয়েছে সেগুলি হল আয় ও সম্পদ মালিকানার স্বল্পতা, বিভিন্ন আর্থিক প্রয়াস সম্পর্কে জনচেতনার অভাব, ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পাদনের উচ্চ মূল্য, গ্রামীণ ও ব্যাংকবিহীন জনগোষ্ঠীর অনুপযোগী ও খরচসাপেক্ষ পরিষেবার বিদ্যমানতা।

গ্রামীণ ও ব্যাংকবিহীন জনগোষ্ঠীর কাছাকাছি পৌঁছতে হলে হয়তো আরও বেশি এটিএম খোলার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। উল্লেখনীয় যে গ্রামবাসীরা ৫ মিনিটের কম সময়ে স্থানীয় মহাজনের কাছে পৌঁছে যান, যেখানে নিকটবর্তী ব্যাংকে পৌঁছতে তাদের অনেক বেশি সময় লাগে। কারণ দেশের ৬ লক্ষ গ্রামের মধ্যে ৫০ হাজারেরও কমে ব্যাংকের শাখা রয়েছে।

(৩) **মুদ্রা ব্যাংক** : মুদ্রা ব্যাংকের আওতায় ক্ষুদ্র সংস্থাগুলিকে ঋণ দেবার প্রশ্নে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলির দীর্ঘদিনের মানসিকতা এবার অনেকাংশে পালটাতে হবে। ক্ষুদ্র ইউনিটগুলির বিশেষ চাহিদার প্রতি ব্যাংকগুলিকে যত্নবান হতে হবে, উৎসাহিত করতে হবে সেই সব কর্মসূচিকে যেখানে ঋণের সম্প্রসারণে কোনও বাধা থাকবে না।

(৪) **স্ট্যান্ড-আপ ও স্টার্ট-আপ** : স্ট্যান্ড-আপ ও স্টার্ট-আপ—এই দুই অভিনব পদক্ষেপকে শক্তিশালী করার প্রথম শর্ত হল নতুন উদ্যোগ স্থাপনের আদর্শ বাতাবরণ সৃষ্টি করা। আইআইটি, আইআইএম-এর ধাঁচে ভারতে এখন উদ্যোগ-সংগঠন নিয়ে বিশ্বমানের প্রতিষ্ঠান ও পাঠ্যক্রম চালু করার সম্ভাবনা বিবেচনা করা দরকার। এছাড়া দেশের শিক্ষা-নীতিতে পরিবর্তন সাধন করে বাণিজ্য, আইন, ব্যবসা সমীক্ষা ইত্যাদির ওপর জোর দিয়ে দেশের বিভিন্ন স্থানে আন্তর্জাতিক মানের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা যেতে পারে।

দেশে সুযোগ্য কর্মীবাহিনীর ঘাটতিজনিত সমস্যার সমাধান করতে হবে গুরুত্ব সহকারে। এক সরকারি বিশ্লেষণ অনুযায়ী, ভারতে প্রতি বছর ১ কোটি ২০ লক্ষ স্নাতক বিশ্ববিদ্যালয় ও কারিগরি কলেজের চৌকাঠ পেরোচ্ছেন যদিও তাদের মাত্র ১০ শতাংশই দক্ষ কর্মী-বাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত হবার যোগ্যতাসম্পন্ন।

ব্যবসা সংগঠনের ঝুঁকি সম্পর্কে আমাদের সমাজে উন্নাসিকতা ও দ্বিধাগ্রস্ততা লক্ষ করা যায়। ভারতীয় মূল্যবোধে ব্যর্থতার প্রতি সহনশীলতা খুব কম। অন্যদিকে সিলিকন ভ্যালিতে এমন অনেক সদাশয় বিনিয়োগকারী রয়েছেন যারা সেই সব উদ্যোগীদের তহবিল জুগিয়েছেন যে উদ্যোগীদের প্রাথমিক প্রয়াস ব্যর্থ হয়েছিল। ঝুঁকির সমস্যা থাকলে একটি সমাধানসূত্রও থাকা দরকার, যেখানে উদ্যোগীদের ব্যর্থ প্রয়াসের ক্ষেত্রে সরকার তাদের জন্য কোন না কোন সামাজিক নিরাপত্তা বা বিমার সংস্থান রাখার কথা বিবেচনা করবে।

উদ্যোগীদের সাফল্যের সঙ্গে এগিয়ে যেতে অনুকূল পরিমণ্ডল গড়ে তুলতে সরকারকে দ্রুত অনুমোদন ও অন্যান্য সহায়তা দানের পথ নিতে হবে। বাস্তব ছবিটি কিন্তু অন্য কথা বলছে। ১৯৮২ সাল থেকে ১১০টি বর্তমান সহায়ক প্রতিষ্ঠান/কেন্দ্রের মাধ্যমে বছরে মাত্র ৫০০টির মতো স্টার্ট-আপ ইউনিটকে প্রমোট করা সম্ভবপর হচ্ছে। এবং তখন থেকে এখনও পর্যন্ত মাত্র ৪০ হাজার প্রযুক্তিগত কর্মসংস্থান (চাকরি) সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে। সর্বোপরি সঠিক পরামর্শ ও অভিজ্ঞতা—বিনিময়ের সাহায্যে উদ্যোগ-পরিচালন প্রতিপালিত করার জন্য সরকারের তরফে বেতার ও দূরদর্শনে ডেডিকেটেড চ্যানেল চালু করার বিষয়টিও বিবেচিত হওয়া দরকার। যেমন চ্যানেল ইতিমধ্যেই কৃষির বিকাশে চালু হয়েছে।

উপসংহার

দ্রুত বিকাশশীল দেশ ভারতের জনসংখ্যায় এক বিপুল অংশ তরুণবয়সী। একমাত্র পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধার দ্বারাই জনসংখ্যার এই ইতিবাচক দিকটির সদ্ব্যবহার হতে পারে। গত দু' বছর যাবৎ সরকারের বিভিন্ন প্রয়াস সর্বজনীন ব্যাংকিং প্রসারের সদিচ্ছা এবং স্বনিযুক্তি ও বিকাশের সুষ্ঠু বাতাবরণ সৃষ্টির সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে। যুব সম্প্রদায়ের ক্ষমতায়নই ভারতকে ৯ শতাংশ অগ্রগতি চরিতার্থতার পথে নিয়ে যাবে বলে আশা করা যায়। বলা বাহুল্য অদূর ভবিষ্যতে বিশ্বশক্তির মর্যাদা পেতে এর কোন বিকল্প নেই।❑

(**লেখক পরিচিতি** : লেখক ব্যাঙ্গালোরস্থিত আইআইএম-আরবিআই চেয়ার অধ্যাপক। মতামত লেখকের ব্যক্তিগত। ইমেল : charansingh60@gmail.com)

বৈদ্যুতিন-প্রশাসন : লক্ষ্য সর্বাধিক মানুষের কাছে পৌঁছনো

*সব দেশের সরকার চায় জনগণকে জানতে ও জানাতে। সুশাসন সুনিশ্চিত করার এ এক মস্ত সোপান। ভারতের মত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে একথা আরও বেশি করে খাটে। আর্থিক বিকাশহার বৃদ্ধি শেষ কথা নয়। লক্ষ্য হওয়া উচিত মানুষের কল্যাণ। এই উদ্দেশ্য পূরণে বর্তমান সরকার চায় সর্বজনীন উন্নয়ন—ইনক্লুসিভ ডেভলপমেন্ট। বিকাশের সুফল পায় যেন সবাই। সর্বজনীন উন্নয়নের স্বার্থে সরকারকে পৌঁছতে হবে মানুষের কাছে। তথ্য-প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে বিদ্যুতিন-প্রশাসনের মাধ্যমে সেই লক্ষ্য পূরণের জন্য ভারত সরকারের তৎপরতা নিয়ে কলম ধরেছেন—***ড. রঞ্জিৎ মেটা**

ই-গভর্ন্যান্স বা বিদ্যুতিন-প্রশাসন হচ্ছে সরকারের সঙ্গে, জাতীয়, রাজ্য, পুর, স্থানীয় স্তরে প্রশাসন কর্তৃপক্ষের মধ্যে, নাগরিক ও শিল্প-বাণিজ্য সংস্থার মধ্যে তথ্য ও কাজকর্মের আদান-প্রদানে দক্ষতা, কার্যকারিতা, স্বচ্ছতা, দায়বদ্ধতায় রূপান্তর ঘটানোর জন্য তথ্য এবং যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রয়োগ।

ওয়েব এর অগ্রগতির অন্যতম উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে এই বিদ্যুতিন-প্রশাসনের উত্থান। ইন্টারনেটের সহায়তায় ডিজিটাল সমাজগুলির ক্রমবিকাশ এবং ধরে নেওয়া যায় যে, দেশ (এবং বিশ্ব) জুড়ে মানুষকে একত্রিত করতে তারা বাস্তবিকই বড় ভূমিকা নিচ্ছে। তাই তারা জাতীয় সরকারের সামনে কিছু চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেবার পাশাপাশি হাজির করছে সুযোগও। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সরকার মূলত এক প্রতিনিধিত্বমূলক প্রক্রিয়া। নাগরিকদের পক্ষ থেকে কিছু নির্বাচিত ব্যক্তি বিতর্কের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নেয়, তৈরি করে আইন। এর কয়েকটি দিক বিদ্যুতিন-প্রশাসনের প্রেক্ষিতে খুব গুরুত্বপূর্ণ বলে প্রতিপন্ন হতে পারে।

সব দেশের সরকার আরও বেশি করে তথ্য-প্রযুক্তি কাজে লাগানোর দিকে ঝুঁকছে। ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব এসে পড়ায়, নয়ের দশকে এই প্রবণতার সূচনা। সেই ইস্তক এক লম্বা পথ পাড়ি দিয়ে এসেছে এই প্রযুক্তি এবং বিদ্যুতিন-প্রশাসন উদ্যোগও। ইন্টারনেট ও মোবাইল সংযোগ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে নাগরিকরা সরকার এবং কর্পোরেট সংস্থার কাছ থেকে তথ্য জানা এবং পরিষেবার সুযোগ নেবার জন্য নতুন পদ্ধতি শিখে নিচ্ছে। আরও আরও অনলাইন তথ্য ও পরিষেবা তারা আশা করছে। এ থেকে স্পষ্ট প্রমাণিত, নয়া ই-নাগরিকতা প্রসার লাভ করছে।

ভারতে বিদ্যুতিন-প্রশাসনের সূত্রপাত বিগত শতকের ছয়ের-দশকের শেষাশেষি ও সাত-এর দশকের গোড়ায়। প্রতিরক্ষা, অর্থনৈতিক পরিকল্পনা, জনগণনা, নির্বাচন, কর সংগ্রহ ইত্যাদিতে কম্পিউটার ব্যবহারে তখন জোর দেওয়া হয়েছিল। ছবিটা বদলাতে শুরু করে নয়ের দশকের গোড়া থেকে। তথ্য-প্রযুক্তি কাজে লাগিয়ে বিদ্যুতিন-প্রশাসন ব্যাপক মাত্রা পেল। গ্রামাঞ্চলে পৌঁছে যাওয়া এবং স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ও বেসরকারি ক্ষেত্র থেকে আরও বেশি তথ্যাদি নেবার জন্য নীতিতে জোর দেওয়া হয়। প্রাথমিকভাবে অটোমেশন এবং কম্পিউটারাইজেশন গুরুত্ব পেলেও, পরে কানেকটিভিটি, নেটওয়ার্কিং, তথ্য প্রক্রিয়াকরণ পদ্ধতি গড়ে তোলার দিকে নজর পড়ে। সাধারণ মানুষকে তার বাড়ির কাছাকাছি কমন সার্ভিস ডেলিভারি আউটলেট মারফৎ সরকারি পরিষেবা পাবার সুযোগ দেওয়া ছিল ২০০৬ সালের মে মাসে সূচিত জাতীয় বিদ্যুতিন-প্রশাসন পরিকল্পনার অভীষ্ট লক্ষ। মানুষকে কম খরচে সরকারি পরিষেবা জোগানো এবং সেই সঙ্গে দক্ষতা, স্বচ্ছতা ও নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিত করা।

জাতীয় বিদ্যুতিন-প্রশাসন পরিকল্পনায় এখন ২৭-টি মিশন মোড প্রজেক্ট এবং ৮-টি সাপোর্ট কমপোনেন্ট আছে। কেন্দ্র, রাজ্য ও স্থানীয় শাসন স্তরে এগুলি রূপায়িত হবে। কেন্দ্রীয় স্তরে এসব প্রকল্পের অন্যতম আয়কর, আমদানি ও উৎপাদন শুল্ক, পাসপোর্ট। রাজ্য স্তরে আছে জমির রেকর্ড, কৃষি এবং ই-জেলা। স্থানীয় স্তরে পঞ্চায়েত ও পুরসভা।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সফল প্রয়োগের ফলে সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের কাজকর্মে দক্ষতা বেড়েছে। কমেছে যোগাযোগ ব্যয়। স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পেয়েছে। অনলাইন ফর্ম ভর্তি, বিল জোগাড় ও মেটানো ইত্যাদি সহজ অ্যাপ্লিকেশন বা দূরশিক্ষা এবং টেলিমেডিসিন-এর মত কমপ্লেক্স অ্যাপ্লিকেশন যাই হোক না কেন, নাগরিকরা উপকার পাচ্ছে।

বিদ্যুতিন-প্রশাসনে সরকারের সাম্প্রতিক কিছু পদক্ষেপ আলাদা করে উল্লেখের দাবি রাখে।

পহল

রান্নার গ্যাস সিলিন্ডারে নগদ ভরতুকি দেবার জন্য ২০১৩-র ১ জুন পহল প্রকল্প—এলপিজি-তে সরাসরি উপকার হস্তান্তর (ডিবিটিএল) চালু করে দেশের বিগত সরকার। ২৯১টি জেলায়। বর্তমান সরকার প্রকল্পটি পুঙ্খানুপুঙ্খ খুঁটিয়ে পরীক্ষা করেছে। গ্রাহকদের সমস্যাদি খতিয়ে দেখার পর এই প্রকল্প সংশোধন করা হয়। ২০১৪-র ১৫ নভেম্বর পহল ফের চালু হয় ৫৪-টি জেলাতে। এর আওতায় আসে আড়াই কোটি পরিবার।

দ্বিতীয় পর্যায়ে এই সংশোধিত প্রকল্প ২০১৫-র ১ জানুয়ারি সব জেলায় ছড়িয়ে দেওয়া হয়। এলপিজি সিলিন্ডারে ভরতুকি পাবার জন্য আগের প্রকল্পে সব গ্রাহকের আধার নম্বর থাকতে হত। আধার কার্ড না থাকার দরুন অনেক গ্রাহকের ভরতুকি জোটেনি।

পহল প্রকল্পে যোগ দিতে ইচ্ছুক গ্রাহককে তার আধার নম্বর ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ও এলপিজি কনজিউমার নম্বরের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। আধার নম্বর না থাকলে ১৭ সংখ্যার এলপিজি আইডি-র সঙ্গে গ্রাহকের ব্যাংক অ্যাকাউন্টের সরাসরি যোগ থাকা দরকার। প্রকল্পটিতে সামিল হওয়া মাত্রই গ্রাহক বাজার দামে সিলিন্ডার পাবে। ভরতুকির টাকা সরাসরি জমা পড়বে তার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে। গ্রাহকের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে আগাম ৫৬৮ টাকা দেবে সরকার। প্রকল্পে যোগদানকারী গ্রাহক পয়লা সিলিন্ডারটি বুক করার সঙ্গে সঙ্গে। বাজার দামে প্রথম সিলিন্ডারটি কিনতে গ্রাহকের টাকার অভাব যাতে না হয়। এই অগ্রিম প্রতিটি সিলিন্ডার-পিছু ভরতুকি বাবদ দেওয়া টাকার অতিরিক্ত।

প্রকল্পে তার স্টেটাস সম্পর্কে গ্রাহককে ওয়াকিবহাল রাখতে প্রতিটি পর্যায়ে তাকে এসএমএস পাঠানো হয়। এজন্য গ্রাহককে অনুরোধ করা হয় ডিস্ট্রিবিউটরের কাছে তার মোবাইল নম্বর জানিয়ে দিতে। গ্রাহককে পরামর্শ দেওয়া হয় সিলিন্ডারের সঙ্গে ক্যাশ মেমোটিও নেবার জন্য। ভরতুকি ব্যাংকে জমা পড়ার বিষয়টি এতে সুনিশ্চিত হয়।

প্রকল্পের আওতায় আনা হবে দেশের সবকটি অর্থাৎ ৬৭৬ জেলায় ১৫ কোটি ৩০ লক্ষের বেশি গ্রাহককে। বর্তমানে এই প্রকল্পে যোগ দিয়েছে ৬ কোটি ৫০ লক্ষের বেশি গ্রাহক।

পহলের লক্ষ রান্নার গ্যাসে ভরতুকি সরাসরি প্রকৃত গ্রাহকের কাছে পৌঁছে দেওয়া। ভরতুকি নিয়ে যেন কোন কারচুপি না হয়। ফলে বাঁচবে সরকারের টাকাও।

পহল প্রকল্পের সূচনা ২০১৪-র ১৫ নভেম্বর। সে বছরের ৩০ ডিসেম্বর অবধি ২০ লক্ষ গ্রাহকের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে হস্তান্তর করা হয়েছে ৬২৪ কোটি টাকা। এই প্রকল্পে স্বেচ্ছায় ভরতুকি ছেড়ে দেওয়া যায়। ভারত সরকার গত বছর মার্চে ''ভরতুকি ছাড়' প্রচারাভিযান শুরু করে। এ বছর এপ্রিল ইস্তক ভরতুকি ছেড়ে দিয়েছে কোটিখানেক গ্রাহক। এদের মধ্যে আছেন মধ্যবিত্ত এবং অবসরপ্রাপ্তরাও।

ডিজিটাল ভারত

সর্বজনীন ব্রডব্যান্ড ও মোবাইল সংযোগের ব্যবস্থা করার লক্ষ্যে সরকার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। এসব কর্মসূচি রূপায়ণে ঢিলেমি দূর করে গতি আনার জন্য ডিজিটাল ভারত প্রকল্পের উদ্যোগ। বিএসএনএল, রেলটেল ও পাওয়ার গ্রিড কর্পোরেশন-এর মত রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা মারফত সরাসরি ব্যয়ের পরিমাণ কমবে, কিন্তু গ্রামাঞ্চলে বসবাসকারী ভারতের ৬৮ শতাংশ মানুষের কাছে অনলাইনের সুযোগ মিললে পরোক্ষ চাহিদা বেড়ে যাবে অনেকখানি।

ডিজিটাল ভারত কর্মসূচির লক্ষ্য বৈদ্যুতিন পরিষেবা, পণ্য, উৎপাদন ও কর্মসংস্থান সুযোগ-এর মত ক্ষেত্রে সবার বিকাশ। এই কর্মসূচির তিনটি মূল দিক—

- প্রতিটি নাগরিকের জন্য ডিজিটাল পরিকাঠামো;
- চাওয়ামাত্র প্রশাসন ও পরিষেবা;
- নাগরিকদের ডিজিটাল ক্ষমতায়ন।

এসব দর্শন মাথায় রেখে ডিজিটাল ভারত কর্মসূচির উদ্দেশ্য ব্রডব্যান্ড হাইওয়ে, সকলের জন্য মোবাইল সংযোগ, পাবলিক ইন্টারনেট অ্যাকসেস প্রোগ্রাম, বিদ্যুতিন-প্রশাসন : প্রযুক্তির মাধ্যমে সরকার সংস্কার, ই-ক্রান্তি— পরিষেবার বৈদ্যুতিন বিলিবণ্টন, সবার জন্য তথ্য, বৈদ্যুতিন সামগ্রী উৎপাদন : বৈদ্যুতিন পণ্য আমদানি-রপ্তানিতে ভারসাম্য (টার্গেট নেট জিরো ইমপোর্টস), কর্মসংস্থানের জন্য তথ্যপ্রযুক্তি। ডিজিটাল ভারতে একটিমাত্র কর্মসূচির আওতায় বিভিন্ন উদ্যোগ চালু আছে। জ্ঞান অর্থনীতি হয়ে ওঠার জন্য ভারতকে প্রস্তুত করাই প্রতিটি উদ্যোগের লক্ষ্য। সেই সঙ্গে, এই কর্মসূচি চায় সরকারের সব বিভাগের মধ্যে সমন্বয় মারফত নাগরিকদের কাছে সুশাসন পৌঁছে দিতে।

বিভিন্ন কেন্দ্রীয় মন্ত্রক/দপ্তর ও রাজ্য সরকারের সহযোগিতায় এই কর্মসূচির ভাবনা-চিন্তা ও সমন্বয় করেছে বৈদ্যুতিন ও তথ্য-প্রযুক্তি দপ্তর। ডিজিটাল ভারত সংক্রান্ত নজরদারি কমিটির চেয়ারম্যান খোদ প্রধানমন্ত্রী। ডিজিটাল ভারত উদ্যোগের কাজকর্মে তাই তীক্ষ্ণ দিয়ে নজর রাখা হয়। ডিজিটাল ভারত কর্মসূচির নীতির সঙ্গে তালমিল রাখতে বিদ্যুতিন-প্রশাসন সম্পর্কিত যাবতীয় চলতি উদ্যোগ পুনর্গঠন করা হয়েছে।

ডিজিটাল ভারত-এর বেশ কয়েকটি অংশ আছে। সবচেয়ে বড় অংশটি হচ্ছে লাস্ট-মাইল কানেকটিভিটি। সরকার চায় ফাইবার অপটিকসের মাধ্যমে সব গ্রাম পঞ্চায়েত ও কমন সার্ভিস সেন্টারকে যুক্ত করতে।

গ্রামাঞ্চলে ব্রডব্যান্ড ও মোবাইল সংযোগের জন্য ফাইবার অপটিকস কেবল পাততে সরকার দায়িত্ব দিয়েছে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলিকে। এখানে ব্যবসার অংশটি দেখা হয়নি। লাস্ট মাইল কানেকটিভিটির লক্ষে পৌঁছতে গ্রামাঞ্চলে ইন্টারনেট পরিষেবা দেবার জন্য সরকার এখন চায় বেসরকারি উদ্যোক্তাদেরও। ছোটখাটো ব্যবসা সংগঠন ইন্টারনেট পরিষেবা প্রদানের লাইসেন্স পেলে এ কাজ দ্রুত এগিয়ে যাবে। এ পর্যায়ে পৌঁছতে অবশ্য লাগবে বেশ কয়েকটা বছর। ফাইবার অপটিক্স নেটওয়ার্কের মত ডিজিটাল পরিকাঠামো কাজে লাগিয়ে ইন্টারনেট পরিষেবা জোগানো হয়।

ভারতীয় অর্থনীতির বিকাশ অব্যাহত। সেই সঙ্গে ডিজিটাল ভারত কর্মসূচির ফলে দেশে কোম্পানিগুলি প্রযুক্তি সংক্রান্ত খরচপাতিতে বিমুখ নয়। এক রিপোর্ট অনুসারে, ২০১৬ এবং ২০১৭-এ ভারতে প্রযুক্তি বিষয়ক কেনাকাটা টাকার অঙ্কে বাড়বে ১২ শতাংশ। এই সওদার মধ্যে পড়ে কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক সাজসরঞ্জাম, যোগাযোগ সরঞ্জাম, সফটওয়্যার, প্রযুক্তি পরামর্শ পরিষেবা, প্রযুক্তি আউটসোর্সিং এবং হার্ডওয়্যার ইত্যাদি।

প্রযুক্তি ব্যয় ২০১৫-এ ছিল ২ লক্ষ ৮ হাজার কোটি টাকা। ২০১৬-তে তা বেড়ে দাঁড়াবে ২ লক্ষ ৩২ হাজার কোটিতে। আর ২০১৭-তে ২ লক্ষ ৫৯ হাজার কোটি। ভারতীয় কোম্পানিগুলির সবচেয়ে বেশি ব্যয় হার্ডওয়্যার বাবদ। মোট ব্যয়ের এক-

তৃতীয়াংশ। অন্যান্যের তুলনায় যোগাযোগ সরঞ্জামের ব্যয় অবশ্য বাড়বে কম। কেন না, বাজারে দাম কমছে এসবের। ডিজিটাল ইন্ডিয়া কর্মসূচি রূপায়ণে গতি এলেও এবং টেলিকম সংস্থাগুলি ফোর জি-এর মত নতুন ও উন্নত নেটওয়ার্ক চালু করার পথে হাঁটলেও এটা ঘটবে।

কেন্দ্রীয় সরকার ২০১৪-১৫-তে প্রথমে ১ লক্ষ গ্রাম ফাইবার অপটিকস দিয়ে যুক্ত করার পরিকল্পনা করেছিল। পরে এই লক্ষমাত্রা নামিয়ে আনা হয় ৫০ হাজারে। ২০১৫-এর মার্চ পর্যন্ত ন্যাশনাল অপটিক্যাল ফাইবার নেটওয়ার্কের আওতায় মাত্র ২০ হাজার গ্রামে সংযোগ দেওয়া সম্ভব হয়। পরে এই নেটওয়ার্কের নাম হয় ভারতনেট।

সরকারি তথ্য অনুযায়ী; ২০১৫-র ডিসেম্বর অবধি ৩২,২৭২-টি গ্রাম পঞ্চায়েতকে যুক্ত করা গেছে। পাতা হয়েছে ৭৬,৬২৪ কিলোমিটার দীর্ঘ ফাইবার কেবল। ভারতনেট প্রকল্পের লক্ষ্য ২০১৭-র মধ্যে গ্রামাঞ্চলের সব বাড়ি ও প্রতিষ্ঠানে ২ এমবিপিএস থেকে ২০ এমবিপিএস ব্রডব্যান্ড পৌঁছে দেওয়া।

● **ডিজিটাল ভারত কর্মসূচির মুখ্য প্রকল্প:**

বেশকিছু প্রকল্প/পণ্য ইতোমধ্যে চালু হয়েছে বা শুরু হবার মুখে :

(১) ডিজিটাল লকার সিস্টেমের লক্ষ্য ভৌত নথিপত্রের (ফিজিক্যাল ডকুমেন্টস) ব্যবহার কমান এবং বিভিন্ন এজেন্সিকে ই-নথিপত্র শেয়ার করতে সক্ষম করা।

(২) আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে প্রশাসনে নাগরিকদের অংশগ্রহণের জন্য মাইগভডটইন (Mygov.in) এক প্ল্যাটফর্ম হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

(৩) স্বচ্ছ ভারত মিশনের লক্ষ্য অর্জনের জন্য নাগরিকরা ও সরকারি সংস্থাগুলি স্বচ্ছ ভারত মিশন মোবাইল অ্যাপ ব্যবহার করবে।

(৪) আধার ব্যবহার করে নাগরিককে নথিপত্র ডিজিটাল সই করতে দেবে ই-সাইন ফ্রেমওয়ার্ক।

(৫) ই-হসপিটাল অ্যাপলিকেশনের আওতায় খোলা হয়েছে অনলাইন রেজিস্ট্রেশন সিস্টেম। এর মারফত অনলাইন রেজিস্ট্রি, ফিজ ও অ্যাপয়েন্টমেন্ট-এর টাকা মেটানো, অনলাইন ডায়াগনস্টিক রিপোর্ট, রক্ত পাওয়া যাবে কিনা তা অনলাইনে জানা ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ পরিষেবা মিলবে।

(৬) ভারত সরকারের দেওয়া বৃত্তি সম্পর্কিত যাবতীয় কাজকর্ম, যেমন, আবেদন জমা দেওয়া, ভেরিফিকেশন, মঞ্জুরি প্রদান ইত্যাদি কাজ সারার জন্য আছে ন্যাশনাল স্কলারশিপস পোর্টাল।

(৭) দেশে প্রচুর পরিমাণ নথিপত্র ডিজিটাইজেশন-এর জন্য ডিজিটাইজ ইন্ডিয়া প্ল্যাটফর্ম নামে এক উদ্যোগে হাত দিয়েছে ডেইট ওয়াই (Deit Y)। নাগরিককে পরিষেবা দক্ষভাবে জোগানোর কাজে সাহায্য করবে এই প্ল্যাটফর্ম।

(৮) দেশে আড়াই লক্ষ গ্রামের সবকটিকে হাইস্পিড ডিজিটাল হাইওয়েতে যুক্ত করার জন্য ভারতনেট নামে এক প্রকল্প হাতে নিয়েছে ভারত সরকার। অপটিক্যাল ফাইবার ব্যবহার করে গ্রামাঞ্চলে ব্রডব্যান্ড পরিষেবা প্রকল্পের ক্ষেত্রে এটাই হবে বিশ্বের বৃহত্তম।

(৯) তিরিশ বছরের পুরনো সব এক্সচেঞ্জ বদলানোর জন্য নেক্সট জেনারেশন নেটওয়ার্ক প্রবর্তন করেছে বিএসএনএল। ভয়েস, ডেটা, মাল্টিমিডিয়া/ভিডিও-র মত পরিষেবা দেবার জন্য এই নেটওয়ার্ক এক আইপিভিত্তিক প্রযুক্তি।

(১০) দেশজুড়ে ব্যাপকভাবে ওয়াই-ফাই হটস্পট-এর উদ্যোগ নিয়েছে বিএসএনএল। ব্যবহারকারীরা তাদের মোবাইল দিয়ে বিএসএনএল-এর ওয়াই-ফাই নেটওয়ার্ক কাজে লাগাতে পারে।

(১১) নাগরিককে বৈদ্যুতিন উপায়ে পরিষেবা জোগানো এবং নাগরিক ও কর্তৃপক্ষের মধ্যে পারস্পরিক লেনদেন বা যোগাযোগের উপায় উন্নত করার জন্য সর্বত্র সংযুক্তি আবশ্যক। এটা বুঝে ভারত সরকারও ডিজিটাল ভারত কর্মসূচির অন্যতম স্তম্ভ হিসেবে ব্রডব্যান্ড হাইওয়েকে অন্তর্ভুক্ত করেছে।

নীতি উদ্যোগ

ই-ক্রান্তি ফ্রেমওয়ার্ক, পলিসি অন অ্যাডাপশন অব ওপন সোর্স সফটওয়্যার ফর গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া, ফ্রেমওয়ার্ক ফর অ্যাডাপশন অব ওপন সোর্স সফটওয়্যার ইন ই-গভর্ন্যান্স সিস্টেমস, পলিসি অন ওপন অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রামিং ইন্টারফেসেস ফর গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া, ই-মেল পলিসি অব গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া, পলিসি অন ইউজ অব আইটি রিসোর্সেস অব গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া, পলিসি অন কোল্যাবরেটিভ অ্যাপ্লিকেশন ডেভলপমেন্ট বাই ওপনিং দ্য সোর্স কোড অব গভর্নমেন্ট অ্যাপ্লিকেশনস, অ্যাপ্লিকেশন ডেভলপমেন্ট অ্যান্ড রি-এঞ্জিনিয়ারিং গাইডলাইনস ফর ক্লাউড রেডি অ্যাপ্লিকেশনস-এর মত নীতি উদ্যোগও নিয়েছে বৈদ্যুতিন ও তথ্য-প্রযুক্তি দপ্তর।

● উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন রাজ্যে বিপিও কেন্দ্র খোলার জন্য বিপিও নীতি অনুমোদিত হয়েছে। অন্যান্য রাজ্যের ছোটখাটো/মফস্বল শহরের জন্যও এ নীতি খাটবে।

● ইলেক্ট্রনিকস ডেভলপমেন্ট ফান্ড নীতির লক্ষ্য উদ্ভাবনা, বিকাশ ও গবেষণা, পণ্য উন্নয়ন-এর বিকাশ এবং ভেঞ্চার ফান্ড-এর জন্য দেশে আইপি-র এক সম্পদ ভাণ্ডার গড়ে তোলা।

● উদীয়মান ক্ষেত্র ফ্লেক্সিবল ইলেক্ট্রনিকসে গবেষণা ও উদ্ভাবন প্রসারে ভারত সরকারের এক উদ্যোগ হচ্ছে ন্যাশনাল সেন্টার ফর ফ্লেক্সিবল ইলেক্ট্রনিকস।

● সেন্টার অব এক্সেলেন্স অন ইন্টারনেট অন থিংগস হল বৈদ্যুতিন ও তথ্য-প্রযুক্তি দপ্তর, ন্যাসকম এবং আর একটি সংস্থার যৌথ উদ্যোগ।

ভারতে গরিবি দূরীকরণ কর্মসূচির উন্নতির জন্য বিদ্যুতিন-প্রশাসন সংস্কার এক শক্তিশালী মঞ্চ হিসেবে কাজ করতে পেরেছে। আমরা মনে করি, এ ধরনের হস্তক্ষেপে গরিব মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়। সবচেয়ে গরিবদের সর্বাধিক উপকারের জন্য এই মঞ্চকে কিভাবে কাজে লাগানো যায়, তা ঠিক করতে হবে এখন।❑

(**লেখক পরিচিতি** : লেখক পিএইচডি চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-র অধিকর্তা। ইমেল : ranjeetmehta@gmail.com)

প্রধানমন্ত্রী জন-ধন যোজনা : আর্থিক অন্তর্ভুক্তিতে বড় ভূমিকা নিয়েছে

*স্বাধীনতার ৬৭ বছর পরও সারা দেশের অন্তত দুই-তৃতীয়াংশ পরিবার অর্থনীতির মূল ভিত্তি, ব্যাংক পরিষেবা থেকে বঞ্চিত রয়ে গিয়েছিলেন। সংগঠিত অর্থনীতির মূল স্রোত থেকে বাদ পড়ে যাওয়া সমাজের এই অংশকে জাতীয় অর্থব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত করার লক্ষ্যকে সামনে রেখেই বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার ক্ষমতায় আসার কয়েক মাসের মধ্যেই চালু করে বিশ্বের ইতিহাসে অভূতপূর্ব এক প্রকল্প—'প্রধানমন্ত্রী জন-ধন যোজনা'। ২০১৪ সালের ২৮ আগস্ট দেশব্যাপী ব্যাংক খাতা খোলার সুবিশাল এই কর্মযজ্ঞের সূচনা। বর্তমান নিবন্ধে এই প্রকল্পের প্রয়োজনীয়তা, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, নিয়ম-নীতি, পর্যায়, অগ্রগতি, সাফল্য ইত্যাদি দিকগুলি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। দেশের পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গে এই যোজনার হালহকিকৎ নিয়েও আলাদাভাবে পর্যালোচনা করা হয়েছে। লিখেছেন—***রঞ্জিৎ রায়***

"দেশের অর্থনৈতিক সম্পদ দরিদ্রশ্রেণির আর্থিক সচ্ছলতা বৃদ্ধির কাজেই ব্যবহৃত হওয়া উচিত। আর এই বিন্দু থেকেই আসবে সত্যিকারের অর্থনৈতিক পরিবর্তন" যে পরিবর্তন সম্পদ বণ্টন ব্যবস্থাতে নিয়ে আসবে সাম্য। যে পরিবর্তন আক্ষরিক অর্থেই সমাজে অর্থনৈতিক বৈষম্যকে দূর করবে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বিশ্বাস করেন এমনই একটি মানবিক অর্থ ব্যবস্থাতে; তাই আমাদের আর্থিক বিকাশের মূল মন্ত্রই হল—সর্বজনীন আর্থিক উন্নতি— "সবকা সাথ, সবকা বিকাশ"। এই অর্থনৈতিক দর্শনের উপর ভিত্তি করেই প্রধানমন্ত্রী গত ১৫ আগস্ট, ২০১৪-তে ঘোষণা করেন—"প্রধানমন্ত্রী জন-ধন যোজনা"। যে যোজনা জাতীয় স্তরে এক মিশন আকারে কাজ করবে, যার মাধ্যমে সমস্ত গ্রামীণ এবং শহুরে পরিবারগুলোর জন্যে খুলে যায় অতি সহজ শর্তে ব্যাংক থেকে ন্যূনতম আর্থিক পরিষেবা পাবার অধিকার। এই সর্বজনীন আর্থিক অন্তর্ভুক্তির মূল লক্ষ্যই হল সমাজের পিছিয়ে পড়া দুর্বলতম শ্রেণি, বিশেষ করে মহিলা, ছোট ও প্রান্তিক চাষি, গ্রামীণ ও শহুরে শ্রমিকশ্রেণি, বস্তিবাসী দরিদ্র খেটে খাওয়া মানুষদের দুর্বল অর্থনীতিকে ব্যাংক সহায়তার মাধ্যমে সবল ও সার্থক করে তোলা।

এমন একটি যোজনার প্রয়োজন পড়ল কেন?

স্বাধীনতার ৬৭ বছর পরেও আমরা দেখতে পাচ্ছি সারা দেশের অন্তত দুই-

তৃতীয়াংশ পরিবার অর্থনীতির মূল ব্যবস্থা, ব্যাংক পরিষেবা থেকে বঞ্চিতই রয়ে গেছেন। আর স্বভাবতই তারা মহাজনী ঋণ ব্যবস্থার শিকার হয়ে ক্রমাগত শোষিত ও প্রতারিত হচ্ছেন। তাই এই জন-ধন যোজনার মূল লক্ষ্য ও আদর্শ হল, সংগঠিত অর্থনীতির মূল স্রোত থেকে বাদ পড়ে যাওয়া সমাজের এই অংশকে জাতীয় অর্থব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত করা; যা অবশ্যই অত্যন্ত স্বচ্ছ ও সুচারুভাবে সরকারি অনুদান, আর্থিক সাহায্য, বৃত্তি অথবা অবসরকালীন ভাতা, তাদের নিজস্ব ব্যাংক খাতার মাধ্যমে পৌঁছে দেবে এই অনগ্রসর মানুষজনের কাছে। তথ্য-প্রযুক্তির সাহায্যে বৈদ্যুতিন ব্যবস্থার আধুনিক ব্যাংকিং পরিষেবা, যেমন—সঞ্চয়, ক্ষুদ্র ঋণ, বিমা ও অর্থ হস্তান্তর-এর মতো সুবিধাগুলো এই যোজনার মাধ্যমে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে সমাজের প্রান্তিক মানুষজনের কাছে; তা রাজস্থানের মরুভূমি অঞ্চলেই হোক, অথবা নাগাল্যান্ডের পার্বত্য অঞ্চল অথবা আন্দামান নিকোবরের মতো দ্বীপপুঞ্জ। আর এটাকেই আমরা বলছি সার্বিকভাবে আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণ।

আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণের মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে কারণ বহুসংখ্যক মানুষ আর্থিক পরিষেবার বাইরে থেকে গেলে দেশের প্রগতি ব্যাহত হবে। একথা মাথায় রেখেই ভারত সরকার, বিকাশ ও ক্রমবৃদ্ধির সুফল জনগণের সাথে ভাগ করে নেবার জন্যই নিয়ে আসে জন-ধন যোজনা। ২০১৪ সালের ২৮ আগস্ট প্রধানমন্ত্রীর ভাষণের মধ্যে দিয়ে, দেশব্যাপী ব্যাংক খাতা খোলার বিশাল শিবির অনুষ্ঠান উৎসবের মাধ্যমে উদ্বোধন করা হয় প্রধানমন্ত্রী জন-ধন যোজনার, যা পৃথিবীর সব চাইতে

বড়ো আর্থিক অন্তর্ভুক্তির এক সার্থক প্রচেষ্টা।

জাতীয় স্তরে দিল্লিতে অনুষ্ঠিত শিবিরের সাথে সাথে দেশজুড়ে ৭৭৮৯২-টি শিবির খোলা হল ২৮ আগস্ট, ২০১৪ সালে। এক অভূতপূর্ব উদ্দীপনের সঙ্গে শুরু হয় আপামর জনগণের ব্যাংক খাতা খোলার নিরবিচ্ছিন্ন প্রয়াস। এই প্রচেষ্টারই অঙ্গ হিসেবে কলকাতাতে ভারত সরকারের সংখ্যালঘু উন্নয়ন মন্ত্রী নাজমা হেপতুল্লার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয় রাজ্যভিত্তিক ব্যাংক খাতা খোলার বিশাল শিবির। সমস্ত জেলাসদর ও পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি বড় শহরেও অনুষ্ঠিত হয় এই শিবির; অত্যন্ত উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে। অর্থনৈতিক অস্পৃশ্যতার থেকে মুক্তির সূচনা করতে প্রধানমন্ত্রী ব্যক্তিগতভাবে চিঠি লিখে ৭.২৫ লক্ষ ব্যাংককর্মীকে উজ্জিবিত করেন ৭.৫ কোটি ব্যাংক খাতা খোলার লক্ষ্যে (প্রাথমিক লক্ষ্যমাত্রা)। এই যোজনার প্রতি মানুষের প্রত্যাশার প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায় যখন শিবির খোলার প্রথম দিনেই দেশজুড়ে প্রায় ১.৫ কোটি খাতা খোলা হয়ে যায়। সেদিন পশ্চিমবঙ্গেও খোলা হয় ২,৬৭,২৯৮-টি সঞ্চয় খাতা।

ভারতীয় অর্থনীতির ইতিহাসে এই প্রচেষ্টা কি একেবারেই নূতন?

২০১১ সাল থেকেই দেশে আর্থিক অন্তর্ভুক্তির সূচনা করা হয়েছিল "স্বভিমান" প্রকল্পের মাধ্যমে। যেখানে পূর্ববর্তী প্রকল্পের মূল লক্ষ্য ছিল গ্রামভিত্তিক আর্থিক অন্তর্ভুক্তি, সেখানে জন-ধন যোজনার লক্ষ্যবিন্দু হল পরিবারকেন্দ্রিক পরিষেবা। আগের আর্থিক অন্তর্ভুক্তি প্রকল্পের লক্ষ্য ছিল, যে গ্রামগুলির লোকসংখ্যা ২০০০-এর বেশি সেই গ্রামগুলিকে ব্যাংকিং পরিষেবার আওতায় নিয়ে আসা। যার ফলে দেশের ৫.৯২ লক্ষ গ্রামের মধ্যে শুধুমাত্র ৭৪,৩৫১-টি গ্রামকে এর আওতায় আনা সম্ভব হয়েছিল বিগত চার বছরে (২০১১-২০১৪)।

এই পরিপ্রেক্ষিতে জন-ধন যোজনাতে পরিবারভিত্তিক সেবা পৌঁছে দেবার লক্ষ্যে প্রতিটি গ্রামকে ১০০০ থেকে ১৫০০ পরিবারের ভিত্তিতে এক একটি সাব-সার্ভিস অঞ্চলে ভাগ করা হয়, যাতে প্রত্যেকে ন্যায়সংগত দূরত্ব, অর্থাৎ ৫ কিলোমিটারের মধ্যেই ব্যাংকিং পরিষেবা পেতে পারেন। শহরাঞ্চলে, যেমন—পৌরসভাগুলোতে প্রতিটি ওয়ার্ডকেই এক একটি সাব-সার্ভিস এলাকা বলে গণ্য করা হয়। রাজ্যভিত্তিক ব্যাংকার্স সমিতির (SLBC) মাধ্যমে প্রতিটি সাব-সার্ভিস অঞ্চল ভাগ করে দেওয়া হয় বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাংক, গ্রামীণ ব্যাংকগুলোর মধ্যে, যারা রাজ্যে রাজ্যে ব্যাংকিং পরিষেবা দিয়ে চলেছে।

জন-ধন যোজনার বৈশিষ্ট্য ও বিশেষ সুযোগ-সুবিধা

আর্থিক অন্তর্ভুক্তির প্রথম ধাপই হল ব্যাংকে একটি সঞ্চয় খাতা খোলা। ব্যাংক খাতা খোলাকে অত্যন্ত সহজ ও উপযোগী করে তোলার লক্ষ্যে এই যোজনাতে যুক্ত করা হয় কিন্তু বিশেষ সুবিধা। যেমন—প্রাথমিক কোনও জমা রাশি ছাড়াই ব্যাংকে খাতা খোলার অবাধ সুযোগ। খাতা খোলার প্রক্রিয়াকে সহজ করার জন্য এক পাতার একটি বিশেষ আবেদনপত্রও তৈরি হয়, যা সমস্ত ব্যাংকের সকল শাখাতেই প্রযোজ্য ও স্বীকৃত। আধুনিক তথ্য-প্রযুক্তির সহায়তায় কেওয়াইসি (Know Your Customer, আপনার গ্রাহককে জানুন) তত্ত্বকে সহজ করে ই-কেওয়াইসি (e-KYC) সুযোগ নিতে বলা হয় ব্যাংকগুলোকে। এই যোজনাতে প্রতিটি ব্যাংক অ্যাকাউন্টের সঙ্গেই পাওয়া যাবে একটি রুপে (RuPay) ডেবিট কার্ড, যার সঙ্গে গ্রাহক বিনামূল্যে ১ লক্ষ টাকার দুর্ঘটনাজনিত বিমার সুযোগ পাবেন। এই রুপে ডেবিট কার্ড হল একটি দেশীয় ডেবিট কার্ড, যার প্রবর্তক হচ্ছে ন্যাশনাল পেমেন্ট কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া। এটি সমস্ত ব্যাংকের এটিএম-গুলিতে (টাকা তোলার জন্য) ব্যবহার করা যাবে এবং অধিকাংশ পিওএস মেশিনেও (point of sale) কেনাকাটা করে নগদ টাকা ছাড়া দাম মেটানোর জন্যও ব্যবহার করা যাবে। নিরক্ষর গ্রাহককেও এই রুপে ডেবিট কার্ড দেওয়া হবে, তবে ব্যাংকের শাখা প্রবন্ধক এই কার্ড দেবার আগে গ্রাহককে এর সম্ভাব্য বিপদ ও ঝুঁকির কথা ও প্রয়োজনীয় সতর্কতার কথা বিশদে অবশ্যই জানাবেন।

দুর্ঘটনাজনিত বিমার সুবিধা পাবার জন্য রুপে ডেবিট কার্ডকে বিমা সংক্রান্ত দাবি পেশের আগে ৪৫ দিনের মধ্যে অবশ্যই অন্তত একবার ব্যবহার করতে হবে, যাতে রুপে ডেবিট কার্ডটি কার্যকরী থাকে। যদিও দুর্ঘটনাজনিত বিমার পরিমাণ ₹ ১ লক্ষ টাকা, এর জন্য বিমার সুবিধাভোগকারী গ্রাহককে কোন প্রিমিয়াম বা শুল্ক দিতে হবে না।

জন-ধন যোজনাতে দশ বছরের বেশি বয়সী যে কোনও ব্যক্তি এই সঞ্চয় খাতা খুলতে পারেন এবং এই খাতাতে ন্যূনতম কোন জমা রাশি রেখে দেবার কোনও প্রয়োজন হয় না।

যদি কোনও গ্রাহকের দু'টি বা তার বেশি ব্যাংক খাতা ও রুপে ডেবিট কার্ড থাকে, দুর্ঘটনাজনিত বিমার সুযোগ শুধুমাত্র একটি অ্যাকাউন্টেই পাওয়া যাবে। যে ব্যক্তির ইতিমধ্যেই ব্যাংক খাতা রয়েছে তাকে আর নূতন করে প্রধানমন্ত্রী জন-ধন যোজনার অধীনে আরও একটি ব্যাংক খাতা খুলতে হবে না। এই যোজনার সুবিধাগুলো পাবার জন্য তাকে শুধুমাত্র বর্তমান অ্যাকাউন্টে একটি রুপে ডেবিট কার্ড নিতে হবে।

জন-ধন যোজনার মাধ্যমে খোলা এই ব্যাংক খাতাতেও সাধারণ সঞ্চয় খাতার মতো হারে সুদ পাওয়া যাবে (বর্তমানে শতকরা বার্ষিক ৪ টাকা)। এই সঞ্চয় খাতার মাধ্যমে টাকা স্থানান্তকরণের সুবিধাও পাওয়া যাবে। অন্তত ৫ মাস সন্তোষজনকভাবে সঞ্চয় খাতা চালানোর পর গ্রাহক পাবেন ৫,০০০ টাকার ওভারড্রাফ্টের সুযোগ, অর্থাৎ নিজের জমা টাকার থেকেও অতিরিক্ত ৫,০০০ টাকা তোলার সুবিধা। এই ওভারড্রাফ্টের সুবিধা প্রতি পরিবারপিছু একটিমাত্র অ্যাকাউন্টেই পাওয়া যাবে এবং এক্ষেত্রে গৃহকর্ত্রীর (যিনি সর্বাপেক্ষা বয়ঃজ্যেষ্ঠা) অ্যাকাউন্টটিকেই অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

২৮ আগস্ট ২০১৪, প্রধানমন্ত্রী এই যোজনার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আরও ঘোষণা করেন যে ২৬ জানুয়ারি, ২০১৫ সালের মধ্যে যে সমস্ত গ্রাহক এই যোজনার আওতায় ব্যাংক খাতা খুলবেন, তারা অতিরিক্ত

৩০,০০০ টাকায় জীবন বিমার সুবিধাও লাভ করবেন। গ্রামীণ ও শহুরে নিম্নবিত্ত মানুষ, যারা কোনও সরকারি জীবন বিমার আওতায় আসতে পারেন না, তাদের পরিবারে বিমা সুরক্ষার জন্যই এই সুবিধাও যোগ করা হল। সমস্ত সরকারি প্রকল্পের ভরতুকি অথবা অনুদান, পেনশন, রান্নার গ্যাসের ভরতুকি অথবা ১০০ দিনের কাজের মজুরি, যাই হোক না কেন, সুবিধা প্রাপকরা সরাসরি এই ব্যাংক খাতার মাধ্যমে পেয়ে যাবেন তার প্রাপ্য ধনরাশি।

যদি স্বামী ও স্ত্রী দুজনই প্রধানমন্ত্রী জন-ধন যোজনাতে ব্যাংকে খাতা খোলেন, তবে দুজনেই আলাদা আলাদাভাবে এক লক্ষ টাকার দুর্ঘটনাজনিত বিমা ও ত্রিশ হাজার টাকার জীবন বিমার সুবিধা পাবেন, কিন্তু পাঁচ হাজার টাকার ওভারড্রাফ্টের সুবিধা পরিবারপিছু একটিমাত্র অ্যাকাউন্টে পাওয়া যাবে এবং এক্ষেত্রে বিশেষত গৃহকর্ত্রীর অ্যাকাউন্টকেই অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

প্রধানমন্ত্রী জন-ধন যোজনাতে খাতা খোলাকে আরও সরল ও সহজলভ্য করার উদ্দেশ্যে কিছু পদক্ষেপ

এই যোজনাতে ব্যাংকে খাতা খোলার জন্য যদি আধার কার্ড বা আধার নম্বর থাকে তাহলে তার কোনও পরিচয় প্রমাণপত্র লাগবে না। যদি আধার কার্ডে উল্লেখিত ঠিকানা পরিবর্তন হয়ে থাকে, তাহলে বর্তমান ঠিকানা সম্বন্ধে নিজের দেওয়া শংসাপত্র হলেই চলবে। যদি আধার কার্ড না থাকে, তাহলে নিম্নলিখিত যে কোনও একটি বৈধ সরকারি প্রমাণপত্র লাগবে। (১) সচিত্র ভোটার পরিচয়পত্র, (২) ড্রাইভিং লাইসেন্স, প্যান কার্ড, পাসপোর্ট এবং এনআরইজি জব কার্ড। যদি এই প্রমাণপত্রগুলোর মধ্যে গ্রাহকের ঠিকানা উল্লেখিত থাকে, তাহলে সেটি তার পরিচয় ও ঠিকানার প্রমাণপত্র হিসাবে গ্রহণযোগ্য হবে। আর সেক্ষেত্রে পরিচয় ও ঠিকানা প্রমাণের জন্য দুটো আলাদা-আলাদা প্রমাণপত্রের প্রয়োজন নেই।

যদি উপরে উল্লিখিত কোনও বৈধ সরকারি প্রমাণপত্র গ্রাহকের কাছে না থাকে তবে, রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার ২৬.০৮.২০১৪ তারিখের প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে, সেই সব ব্যক্তি ব্যাংকে "ক্ষুদ্র অ্যাকাউন্ট" (স্মল অ্যাকাউন্ট) খুলতে পারবেন। ক্ষুদ্র অ্যাকাউন্ট খুলবার জন্য স্বপ্রত্যায়িত ছবি এবং ব্যাংক আধিকারিকের উপস্থিতিতে স্বাক্ষর বা টিপ সই দিতে হবে। তবে এই অ্যাকাউন্টগুলোর কিছু সীমাবদ্ধতা থাকবে, যেমন—মোট টাকা জমা দেবার পরিমাণ বছরে এক লক্ষ টাকার বেশি হবে না। মাসে মোট দশ হাজার টাকার বেশি তোলা যাবে না। অ্যাকাউন্টে মোট জমা রাশির পরিমাণ কোনও সময়েই পঞ্চাশ হাজার টাকার বেশি হবে না। এই জাতীয় ক্ষুদ্র অ্যাকাউন্টগুলো সাধারণত ১২ মাসের জন্য বৈধ থাকবে। তারপরেও এই অ্যাকাউন্টগুলো পরবর্তী আরও ১২ মাস বৈধ থাকতে পারে; যদি গ্রাহক এই মর্মে কোনও নথি দাখিল করতে পারেন যে, অ্যাকাউন্ট খোলার ১২ মাসের মধ্যে কোনও সরকারি বৈধ প্রমাণপত্রের জন্য তিনি আবেদন করেছেন।

প্রধানমন্ত্রী জন-ধন যোজনার আওতায় খোলা অ্যাকাউন্ট ন্যূনতম কোনও টাকা জমা না রেখেই খোলা যায়, তবে যদি কোনও গ্রাহক চেক বই পেতে চান, তবে তাকে অ্যাকাউন্টে ব্যাংক নির্ধারিত জমারাশি রাখতে হবে।

জন-ধন যোজনা রূপায়ণের নির্ধারিত সময়সীমা

দেশের এই সুবিশাল জনগোষ্ঠীর ব্যাংক খাতা খোলার কর্মকাণ্ডকে নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে সুষ্ঠুভাবে কার্যাকর করার লক্ষ্যে দু'টি পর্যায়ে ভাগ করে নেওয়া হয়।

● **প্রথম পর্যায়**—১৫ আগস্ট, ২০১৪ থেকে ১৪ আগস্ট ২০১৫। এই পর্যায়ে সম্পন্ন করা হয় সর্বজনীন ব্যাংক খাতা খোলার লক্ষ্যমাত্রা—অর্থাৎ, সকল পরিবারের জন্য অন্তত একটি করে ব্যাংক সঞ্চয় খাতা, তা ব্যাংক শাখা থেকে খোলা হোক অথবা নির্দিষ্ট স্থানে উপলব্ধ ব্যাংক মিত্রের সাহায্যে খোলা হোক।

প্রতিটি সঞ্চয় খাতা গ্রাহককে একই সাথে একটি রুপে ডেবিট কার্ড বিতরণ ও কার্ডটিকে ব্যবহারের জন্য সচল করে তোলা। অর্থনৈতিক সাক্ষরতার সম্প্রচার ও প্রসার। ২৮ আগস্ট, ২০১৪ তারিখ থেকেই দিল্লিতে জন-ধন যোজনার মিশন ডিরেক্টর প্রতিদিন বিশেষ কন্ট্রোল রুমের মাধ্যমে সারা দেশের ব্যাংকগুলো থেকে জেলাওয়াড়ি খাতা খোলার পরিসংখ্যান সংগ্রহ করেছেন।

জন-ধন যোজনাতে খাতা খোলার অভূতপূর্ব সাফল্যকে সামনে রেখে প্রথম

"পশ্চিমবঙ্গের লালগোলায় ডিএফপি আয়োজিত ব্যাংক খাতা খোলার শিবির"

সারণি-১

পশ্চিমবঙ্গে জেলাভিত্তিক জন-ধন যোজনার অন্তর্গত পরিবারভিত্তিক খাতা খোলার সার্বিক চিত্র

৩১.১২.২০১৪ (সকল ব্যাংক সহযোগে)

জেলা	সাব-সার্ভিস অঞ্চল সংখ্যা ব্যাংকে বণ্টিত এবং ব্যাংকে সেবা পৌঁছে দেওয়া হয়েছে	ব্যাংকে বণ্টিত ওয়ার্ড সংখ্যা	মোট পরিবার সংখ্যা (সাব-সার্ভিস অঞ্চল)	অন্তত একটি ব্যাংক খাতা খোলা হয়েছে এমন পরিবার সংখ্যা (সাব-সার্ভিস অঞ্চল)	মোট পরিবার সংখ্যা (ওয়ার্ড)	অন্তত একটি খাতা খোলা হয়েছে এমন পরিবার সংখ্যা (ওয়ার্ড)	শতকরা সাফল্যের পরিমাণ (সাব-সার্ভিস অঞ্চল)	শতকরা সাফল্যের পরিমাণ (ওয়ার্ড)
আলিপুরদুয়ার	২৩৬	২০	৩১৯৬৯৭	৩১৯৬৯৭	১৫৫৫৬	১৫৫৫৬	১০০	১০০
বাঁকুড়া	৫৭৭	৯৭	৭১৭০৫১	৭১৭০৫১	৪৩১১৮	৪৩১১৮	১০০	১০০
বর্ধমান	৮৪৭	২৯১	৯৩৭৭১৩	৯৩৭৭১৩	৪৮২০৫৪	৪৮২০৫৪	১০০	১০০
দক্ষিণ দিনাজপুর	২৯০	৪৩	৩৪৫৮৬৮	৩৪৫৮৬৮	৫১৫৮৩	৫১৫৮৩	১০০	১০০
দার্জিলিং	২৫১	১৩১	২৮৪২২১	২৮৪২২১	১৫৬৯৩৩	১৫৬৯৩৩	১০০	১০০
হাওড়া	৫৩১	১১৪	৭১১৬২২	৭১১৬২২	৩৪৯৭১৪	৩৪৯৭১৪	১০০	১০০
হুগলি	৭০৮	২৯৫	৯২৬০০৪	৯২৬৩০৪	৩৬৫৩৪৫	৩৬৫৩৪৫	১০০	১০০
জলপাইগুড়ি	৩১৭	৫৬	৪৪০৬৭৫	৪৪০৬৭৫	২৪৩১	৪২৪০১	১০০	১০০
কোচবিহার	৪২৮	৮০	৬৩৭৫০৬	৬৩৭৫০৬	৪৪১৪০	৪৪১৪০	১০০	১০০
কলকাতা	০	১৪১	০	০	১১৬১৯০৮	১১৬১৯০৮	১০০	১০০
মালদা	৬১৩	৪৩	৭৯৩৬৪০	৭৯৩৬৪০	৫৯৩৪৬	৫৯৩৪৬	১০০	১০০
মুর্শিদাবাদ	৯৩১	১২৬	১৪৬৩৭০৮	১৪৬৩৭০৮	৮৯৩০৬	৮৯৩০৬	১০০	১০০
উত্তর ২৪-পরগণা	৬০৩	৭১১	৯১৯৭২৫	৯১৯৭২৫	১২১৭৭২৪	১২১৭৭২৪	১০০	১০০
পশ্চিম মেদিনীপুর	৯০৩	১৩৬	১১৪৩১৮২	১১৪৩১৮৩	১০৯৫৮১	১০৯৫৮১	১০০	১০০
পূর্ব মেদিনীপুর	৭১৮	৭৯	৮৬৪৯৭৫	৮৬৪৯৭৫	৮১৪৯০	৮১৪৯০	১০০	১০০
পুরুলিয়া	৩৭৯	৪৭	৪১৮৬১৮	৪১৮৬১৮	২৬৯৫৯	২৬৯৫৯	১০০	১০০
নদীয়া	৬৭৭	১৯২	১০২৫৪২৬	১০২৫৪২৬	২০৬৮৫৬	২০৬৮৫৬	১০০	১০০
বীরভূম	৫৩২	১০০	৭৪৩২৬৩	৭৪৩২৬৩	৭৪৭৭৭	৭৪৭৭৭	১০০	১০০
দক্ষিণ ২৪-পরগণা	৭৬০	১৫২	১৬২৪৩৬০	১৬২৪৩৬০	২৭৫১৭৭	২৭৫১৭৭	১০০	১০০
উত্তর দিনাজপুর	৪৫৫	৭৫	৫৩৩৮৬৬	৫৩৩৮৬৬	৬৫৯৩৮	৬৫৯৩৮	১০০	১০০
মোট	**১০৭৫৬**	**২৯২৯**	**১৪৮৫১৪২০**	**১৫৮৫১৪২০**	**৪৯০৩৩৬**	**৪৯০৩৩৬**	**১০০**	**১০০**

পর্যায়ের নির্ধারিত সময়সীমাকে এগিয়ে নিয়ে আসা হয় ২৬ জানুয়ারি, ২০১৫-তে। এই পরিপ্রেক্ষিতে অত্যন্ত আনন্দের বিষয় হল পশ্চিমবঙ্গ এই লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করে নেয় ৩১.১২.২০১৪ তারিখের মধ্যেই।

● **দ্বিতীয় পর্যায়**—১৫ আগস্ট, ২০১৫ থেকে ১৪ আগস্ট, ২০১৮। এই পর্যায়ে জন-ধন যোজনার উপভোক্তাদের কাছে শর্তসাপেক্ষে পৌঁছে দেওয়া হয় ৫,০০০ টাকার ওভারড্রাফ্টের সুবিধা। সব ধরনের ক্ষুদ্র বিমা প্রকল্প/জাতীয় সামাজিক বিমাগুলো, অসংগঠিত ক্ষেত্রের পেনশন প্রকল্প, যেমন—স্বাবলম্বন যোজনা তথা সমস্ত ধরনের সরকারি অনুদান বা ভোগতান সরাসরি ব্যাংক খাতার মাধ্যমেই করানো সুনিশ্চিত করা হয় এই পর্যায়ে।

পশ্চিমবঙ্গে ব্যাংকিং ব্যবস্থার পরিকাঠামোগত অবস্থান

দু'টি পর্যায়ে প্রধানমন্ত্রী জন-ধন যোজনার রূপায়ণের জন্য ব্যাংকিং ব্যবস্থাতে ডিসেম্বর, ২০১৫ পর্যন্ত যে পরিকাঠামো আমরা দেখতে পাচ্ছি তা হল :

● মোট ব্যাংক শাখার সংখ্যা—৭৭৫৯

● তার মধ্যে গ্রামীণ এলাকার শাখা সংখ্যা—৩৫০৭

● ব্যাংকহীন গ্রামে খোলা শাখার সংখ্যা—১২০৮

● মোট ব্যাংক মিত্র বা ব্যবসায়িক প্রতিনিধি—১৪৩৪৯ জন

● মোট ব্যাংক শাখা এবং ব্যবসায়িক প্রতিনিধির দ্বারা আর্থিক পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া যাচ্ছে এমন গ্রামের সংখ্যা—৩৫৫৯২

[**সূত্র** : ব্যাংকার্স সমিতি (SLBL)]

যেসব অঞ্চলে কোনও ঘরে ব্যাংক শাখা খোলা বা এটিএম রাখা ব্যাংকের পক্ষে লাভজনক নয়, সেই সব অঞ্চলে ব্যাংকের পরিষেবা পৌঁছে দেবার জন্য ব্যাংক

ব্যবসায়িক পরিষেবা প্রতিনিধি বা ব্যাংক মিত্র নিয়েঙ্গগ করেছে। এরা গ্রামের মধ্যে কোনও একটি নির্দিষ্ট স্থানে বসে প্রতিদিন ব্যাংকিং পরিষেবা পৌঁছে দেবে। যে ব্যাংকের কাছে যে সাব-সার্ভিস অঞ্চলটি সংযুক্ত করা হয়েছে, ব্যাংক মিত্র নিয়োগের মাধ্যমে সেই অঞ্চলে সমস্ত প্রাথমিক ব্যাংকিং পরিষেবা পৌঁছে দেবার দায়িত্ব সেই ব্যাংকের উপরেই বর্তাবে।

এই সব ব্যাংক মিত্রের সাহায্যে নিম্নলিখিত পরিষেবাগুলো আধুনিক তথ্য-প্রযুক্তির মধ্য দিয়ে বৈদ্যুতিন ব্যবস্থার মাধ্যমে মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে।

(১) প্রাথমিকভাবে পূরণ করা বিভিন্ন সঞ্চয় সংক্রান্ত দরখাস্ত সংগ্রহ করে বাড়িতেই ব্যাংক সঞ্চয় খাতা খুলে দেওয়া এবং ব্যাংকের পাসবই বিলি করা।

(২) হাতে রাখা একটি ছোট কম্পিউটার ব্যবস্থার মাধ্যমে অল্প পরিমাণ টাকার আমানত সংগ্রহ করা এবং টাকা তোলার সুবিধা দেওয়া; যে লেনদেন একই সময়ে ব্যাংকের মূল হিসাবের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে নেটওয়ার্ক ব্যবস্থার মাধ্যমে।

(৩) অল্প পরিমাণ টাকা ব্যাংক খাতার মাধ্যমে স্থানান্তরকরণ/টাকা প্রদান সংক্রান্ত বিভিন্ন নির্দেশ পালন করা ইত্যাদি।

(৪) সঞ্চয় সম্বন্ধে সচেতনতা তৈরি করা ও ব্যাংকের বিভিন্ন পরিষেবা সম্বন্ধে অবহিত করা, টাকার উপযুক্ত ব্যবহার সম্বন্ধে শিক্ষা ও ঋণ সংক্রান্ত পরামর্শ প্রদান।

(৫) সম্ভাবনাযুক্ত গ্রাহককে চিহ্নিত করা ও তাকে ব্যাংকিং ব্যবস্থার সুফল ওঠাতে সাহায্য করা।

সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের গ্রাম এবং পৌরসভাগুলোকে সাব-সার্ভিস অঞ্চলে ভাগ করে বিভিন্ন ব্যাংকের মধ্যে দায়িত্ব ভাগ করে দেওয়া হয়েছে, তার একটা রূপরেখা 'সারণি-১'-এ তুলে ধরা হল। একই সঙ্গে জন-দন যোজনাতে প্রাথমিক লক্ষ্য হিসাবে প্রতি পরিবারপিছু একটি খাতা খোলার জেলাভিত্তিক সাফল্যও দেখানো হল।

সরকারি সহযোগিতায় প্রতিটি সাব-সার্ভিস অঞ্চলে পরিবারভিত্তিক সমীক্ষা চালিয়ে লক্ষ্যমাত্রা স্থির করে নেওয়া হয় এবং এই সমীক্ষার ভিত্তিতে যে সমস্ত পরিবারপিছু অন্তত একজনেরও ব্যাংক খাতা নেই, তাদের সকলের খাতা খোলার মাধ্যমে জন-ধন যোজনাকে কার্যকরী রূপ দেওয়া হয়। এই সমীক্ষাভিত্তিক সাফল্যকেই সারণি-১-এ দেখানো হয়েছে।

ব্যাংক খাতা খোলার এই অগ্রগতি প্রতিটি জেলাতে জেলাশাসকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ডিসিসি (District Consultative Committee) মিটিং-এ পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং জেলা অগ্রণী ব্যাংক আধিকারিক (L.D.M.) এই মর্মে শংসাপত্র প্রদান করেছেন।

জেলা স্তরে পর্যালোচনা ও সমীক্ষার পর রাজ্যভিত্তিক জন-ধন যোজনা কার্যকরী সমিতিও ব্যাংক খাতা খোলার কার্যকারিতা ও বিস্তার বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যালোচনা করে এবং পশ্চিমবঙ্গকে শতকরা ১০০ শতাংশ সফল বলে ঘোষণাও করে। প্রাথমিক পর্যায়ে পশ্চিমবঙ্গে সকল পরিবারের জন্য একটি ব্যাংক খাতা খোলার যে লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করা হয়েছিল, নির্ধারিত সময়ের আগেই, অর্থাৎ ৩১.১১.২০১৪ তারিখের মধ্যেই তা পূরণ হয়ে যায়।

যদিও ১৬.১.২০১৫ তারিখের আগেই পশ্চিমবঙ্গ জন-ধন যোজনাতে সঞ্চয় খাতা খোলার লক্ষ্যমাত্রা (প্রতি পরিবারপিছু অন্তত একটি ব্যাংক খাতা) অর্জন করে নেয়, তাহলেও এই যোজনার মাধ্যমে খাতা খোলা কিন্তু বন্ধ হয়ে যায়নি। আজও উন্মুক্ত করে রাখা আছে প্রান্তিক মানুষজনের জন্য, যারা যে কোনও কারণেই হোক এই অন্তর্ভুক্তি কর্মসূচির সুযোগ এযাবৎ নিতে পারেননি। দেখে নেওয়া যাক আমাদের রাজ্য সাম্প্রতিককাল পর্যন্ত জন-ধন যোজনার

সারণি-২
জাতীয় স্তরে সাফল্যের খতিয়ান (১১.০৫.২০১৬ পর্যন্ত)

সমস্ত সংখ্যা কোটিতে

ব্যাংক	গ্রামীণ খাতা সংখ্যা	শহুরে খাতা সংখ্যা	মোট খাতা সংখ্যা	রূপে কার্ড বিলির মোট সংখ্যা	আধার নং সংযুক্তি-করণ	সঞ্চয় খাতার জমা ধনরাশি (মোট)	বিনা ধনরাশি জমা খাতায় শতকরা সংখ্যা
জাতীয়কৃত ব্যাংক	৯.৫৮	৭.৫৭	১৭.১৫	১৪.৪৮	৮.২৬	২৯৫৯৫.৬৩	২৬.৬৬
গ্রামীণ ব্যাংক	৩.৩১	০.৫৪	৩.৮৬	২.৭৩	১.২৩	৬৫৮৯.৮৩	২২.২৯
প্রাইভেট ব্যাংক	০.৫০	০.৩১	০.৮১	০.৭৬	০.৩২	১৪৩১.১১	৩৭.৮৮
মোট	১৩.৩৯	৮.৪২	২১.৮১	১৭.৯৭	৯.৮১	৩৭৬১৬.৫৮	২৬.৩১
শতাংশ শতকরা হিসাব	৬১.৩৯	৩৮.৬১	—	৮২.৩৯	৪৪.৯৭	—	—

প্রতি খাতায় গড় জমা ধনরাশির পরিমাণ ₹ ১৭২৫
জাতীয় স্তরে উপরে উল্লিখিত সাফল্যের নিরিখে পশ্চিমবঙ্গের অবস্থান (১১.৫.২০১৬) পর্যন্ত।

পশ্চিমবঙ্গের সাফল্যের খতিয়ান (১১.০৫.২০১৬ পর্যন্ত)

সমস্ত সংখ্যা কোটিতে

গ্রামীণ মোট খাতা সংখ্যা	শহুরে মোট খাতা সংখ্যা	মোট খাতা সংখ্যা	রূপে কার্ড বিলির মোট সংখ্যা	আধার সংযুক্তি-করণ	সঞ্চয় খাতাতে জমা মোট ধনরাশি টাকা (কোটি)	বিনা ধনরাশি খাতা সংখ্যা	শতাংশ বিনা ধন-রাশি খাতা সংখ্যার শতকরা হিসাব
১.৩১	০.৬০	১.৯১	১.৩৭	০.৬৪	৪৯১৮.৫৯	০.৪০	২১.১৬
৬৮.৬৪	৩১.৩৫	—	৭১.৪৪	৩৩.১৪	—	০.৪০	—

প্রতি খাতায় গড় জমা ধনরাশির পরিমাণ ₹ ২৫৭০

সারণি-৩
পশ্চিমবঙ্গে জেলাভিত্তিক জন-ধন যোজনার অগ্রগতির প্রতিবেদন ১১.০৫.২০১৬ পর্যন্ত

ক্রমিক সংখ্যা	জেলা	গ্রামীণ মোট খাতা সংখ্যা	শহুরে মোট খাতা সংখ্যা	মোট খাতা সংখ্যা	মোট জমা ধনরাশি (লক্ষ টাকা)	বিনা ধনরাশিতে খোলা খাতার সংখ্যা	রূপে কার্ড বিতরণ	আধার নং সংযুক্তিকরণ	শতাংশ ধনরাশির খাতা	শতাংশ রূপে কার্ড বিতরণ	শতাংশ আধার নম্বর সংযুক্তিকরণ
১	আলিপুরদুয়ার	৩৪৬২২	১৮৬২৯	৫৩২৫১	১৩৫১.৬৪	১১৭৯৫	৫২২৮১	১০৩৩৪	২২.১৫	৯৮.১৮	১৯.৪১
২	বাঁকুড়া	৮৩০৬৮২	১২২০৬৩	৯৫২৭৪৫	১৯৪৮৪.১৫	২০৮৯৭২	৫৯০১৩৩	২০২৫৩৮	২১.৯৩	৬১.৯৪	২১.২৬
৩	বর্ধমান	৭৯৪৬৫৪	৪০১৯৩৭	১১৯৬৫৯১	৩৩৬৩০.৭১	২৩৭৭৩৮	৮৮৪৪৫৮	৩৮১৮১৯	১৯. ৮৭	৭৯.৯১	৩১.৯১
৪	বীরভূম	৬৯৮৬৭৬	২৩৫৩৫১	৯৩৪০২৭	১৬৭২৭.৯৩	২১৯৩৭৫	৬৬৭৪৩৩	২৯৫২১২	২৩.৪৯	৭১.৪৬	৩১.৬১
৫	দক্ষিণ দিনাজপুর	৪২৯২৯৪	৫৪১২৩	৪৮৩৪১৭	৬৮৬৬.৬০	১২৫০৭৩	৩৩১৮৩৪	১৩৪৩৬৫	২৫.৮৭	৬৮.৬৪	২৭.৭৯
৬	দার্জিলিং	২৭৩৩৪৯	২০২৮৯৩	৪৭৬২৪২	১১৫৫৬.৪৪	১১০২৬৯	৪২৭০৮৭	১৮১৮৮৬	২৩.১৫	৮৯.৬৮	৩৮.১৯
৭	হাওড়া	৪১৩৮৮০	২৮৭২৪৭	৭০১১২৭	২২৪০০.৩৬	৯৫৯১৬	৫৮৫৩৫৬	৩৭৭০৩১	১৩.৬৮	৮৩.৪৯	৫৩.৭৭
৮	হুগলি	৫৪৪৮০২	৩৯০৩৩৬	৯৩৫১৩৮	২৯২৬৭.২০	১৩৩৫৩৬	৬৮৯৯৪৭	৫৬৭৫৩৪	১৪.২৮	৭৩.৭৮	৬০.৯০
৯	জলপাইগুড়ি	৪৫৮৬৫৮	৪২৩২৪৮	৮৮১৯০৬	১৮৬১৫.৯৩	২২৩৬৭৭	৬৫৭৯৩১	৩২৮৪২৬	২৫.৩৬	৭৪.৬০	৩৭.২৪
১০	কোচবিহার	৪১৫৪৯৯	২০২৪৫০	৬১৭৯৪৯	৮৭৭৭.২৫	১৪৪৮৭২	৪৭৫৭১৫	২০৭৮৪৯	২৩.৪৪	৭৬.৯৮	৩৩.৬৪
১১	কোলকাতা	১২২৩৩	৬৯১৬৯০	৭০৩৯২৩	৫২৯১৪.৪৫	১১৪৭৫৫	৫৮০৬০৫	৩০০৫৯৭	১৬.৩০	৮২.৪৮	৪২.৭০
১২	মালদা	১০৫৭৫৩৯	৮১২৯২	১১৩৮৮৩১	২১৭৯০.০১	২৭৬৬১৯	৭০৬৯৭১	৩৩২০৮৮	২৪.২৯	৬১.০৮	২৯.১৬
১৩	মুর্শিদাবাদ	৯৭১৪১১	৫০৫৩০২	১৪৭৬৭১৩	৩১৫১১.৭৩	৩৬৫০৮০	৯৭৩৫২৭	৫৯০৭৪৪	২৪.৭২	৬৫.৯০	৪০.০০
১৪	নদীয়া	৮১৯৬২৩	৪৭৬৫৮৭	১২৯৬২১০	৩৩০২৭.১৫	২৮২৬১২	৯১৭৪৭২	৩৫৭৫৭৮	২১.৮০	৭০.৭৮	২৭.৫৯
১৫	উত্তর ২৪-পরগণা	৮৭২৩৪১	৪৩৫৯৯৪	১৭০৮৩৩৯	৬৪৭০৪.৮৩	৩০১৫৩০	১৩২৪২৯২	৬১৩৫৫৯	১৭.৬৫	৭৭.৫২	৩৫.৯২
১৬	পশ্চিম মেদিনীপুর	৮৯৮৪২৮	২২০৪৭৯	১১১৮৯০৭	২৮৩০৭.৩৬	১৫২১৭০	৭৮৮৫৭৫	৩২৬৮৯১	১৩.৬০	৭০.৪৮	২৯.২২
১৭	পূর্ব মেদিনীপুর	৮৩৯৪১৫	১৪৯৫৯৪	৯৮৯০০৯	২৪২৭৫.৬৫	১৪২১৩৫	৭১৯৫৬৬	২৩০০৩৫	১৪.৩৭	৭২.৭৬	২৩.২৬
১৮	পুরুলিয়া	৫৯৮৩৪০	১৫৭৬১৬	৭৫৫৯৫৬	১৩৪৮৪.৪৪	২১০৯৫৮	৪৮৮৫৮৮	১৮৭১৬২	২৭.৯১	৬৪.৬৩	২৪.৭৬
১৯	দক্ষিণ ২৪-পরগণা	১৩২৪৮৭৮	৩২৮৯০৩	১৬৫৩৭৮১	৪৩১৮০.১৭	৩৪১৮২৪	১০৫৮০৭৬	৫০০০৯৪	২০.৬৭	৬৩.৯৮	৩০.২৪
২০	উত্তর দিনাজপুর	৮৪৯০৬২	২১৩৮০২	১০৬২৮৬৪	৯৯৮১.৫১	৩৫১১৭৭	৬৭৮১৩০	২১৮০০৩	৩৩.০৪	৬৩.৮০	২০.৫১
	মোট	**১৩১৩৭৩৮৬**	**৫৯৯৯৫৪০**	**১৯১৩৬৯২৬**	**৪৯১৮৫৯.৫১**	**৪০৫০০৮৩**	**১৩৫৯৭৯৭৭**	**৬৩৪৩৭৪৫**	**২১.১৬**	**৭১.০৬**	**৩৩.১৫**

অন্তর্গত সাফল্য কতখানি আয়ত্ত করতে পেরেছে (সারণি-২ দ্রষ্টব্য)।

জাতীয় স্তরে ১১.০৫.২০১৬ পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী জন-ধন যোজনাতে মোট ২১.৮১ কোটি সঞ্চয় খাতা খোলা হয়েছে, যাতে মোট আমানতের পরিমাণ ₹ ৩৭,৬১৬.৫৮ কোটি। সেই পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চিমবঙ্গে মোট ১.৯১ কোটি সঞ্চয় খাতা খোলা হয়েছে, যাতে মোট আমানতের পরিমাণ হচ্ছে ₹ ৪৯১৮.৫৯ কোটি টাকা। তাহলে পশ্চিমবঙ্গে প্রতিটি জন-ধন যোজনা অ্যাকাউন্টে গড় জমারাশির পরিমাণ দাঁড়ালো ₹ ২৫৭০ টাকা, যা জাতীয় স্তরের গড় জমা রাশির ₹ ১৭২৫ টাকার চাইতে বেশি। এই রাজ্যে এই যোজনার অন্তর্গত জমা খাতার সঙ্গে আধার সংযুক্তিকরণ শতকরা হিসাবে ৩৩.১৪ শতাংশ, যা জাতীয় স্তরে ৪৪.৯৭ শতাংশ। রাজ্যে জন-ধন যোজনার জমা খাতার নিরিখে বিনা ধনরাশির খাতা সংখ্যা শতকরা ২১.১৬ শতাংশ, যদিও সারা দেশজুড়ে বিনা ধনরাশির খাতার সংখ্যা আজও ১৬.৩০ শতাংশ। এইসব বিনা ধনরাশির জমা খাতাকে লেনদেনের আওতায় নিয়ে এসে গ্রামীণ অলস সঞ্চয় রাশিকে জাতীয় অর্থব্যবস্থায় সামিল করাই এক বিশেষ অগ্নিপরীক্ষা আমাদের দেশের ব্যাংকগুলোর সামনে। নিম্নবিত্ত ও অসংগঠিত জনগোষ্ঠীর অবদান হিসেবে জাতীয় অর্থব্যবস্থাতে স্বল্প সময়ে ₹ ৩৭,৬১৬.৫৮ কোটি টাকার সম্পদ সৃষ্টি স্বাধীন ভারতবর্ষে এক অভূতপূর্ব ঘটনা।

এই রাজ্যে জেলাভিত্তিক জন-ধন যোজনার অগ্রগতির পরিসংখ্যান দেওয়া হল সারণি-৩-এ। জেলাগুলোর মধ্যে সব চাইতে বেশি সংখ্যক খাতা খোলা হয়েছে উত্তর ২৪-পরগণাতে—মোট ১৭ লক্ষেরও বেশি। তারপরই রয়েছে দক্ষিণ ২৪-পরগণা জেলা—যেখানে খোলা হয়েছে মোট ১৬.৫৩ লক্ষ জন-ধন খাতা।

জন-ধন যোজনার দ্বিতীয় পর্যায়

প্রথম পর্যায়ের সঞ্চয় খাতা খোলার এই বিরাট সাফল্যের পর, ৯ মে, ২০১৫ সালে প্রধানমন্ত্রী এই কলকাতাতেই এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে জাতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেন তিনটি সামাজিক সুরক্ষা যোজনা। এবং

প্রসারিত হয় দ্বিতীয় পর্যায়ের জন-ধন যোজনার অগ্রগতির সোপান।

১. প্রধানমন্ত্রী সুরক্ষা বিমা যোজনা (PMSBY) : ১৮ থেকে ৭০ বৎসর বয়সের যে কোনও ব্যাংকের গ্রাহক বার্ষিক ₹ ১২ টাকা বিমা শুল্ক দিয়ে মোট ₹ ২.০০ লক্ষ টাকার দুর্ঘটনা বিমার অধিকারী হতে পারেন। একমাত্র শর্ত যে গ্রাহকের অনুমতি সাপেক্ষে ব্যাংকের সঞ্চয় খাতা থেকেই ব্যাংক সরাসরি বিমা শুল্ক আদায় করে নেবে। বিমার বার্ষিক নবীকরণের জন্যও গ্রাহককে শুধুমাত্র ব্যাংক খাতাতে বিমা শুল্কের ₹ ১২ টাকা জমা রাখতে হবে মাত্র। ব্যাংক নিজ দায়িত্বে বিমা শুল্ক গ্রাহকের খাতা থেকে কেটে নিয়ে বিমার মেয়াদ বাড়িয়ে দেবে।

২. প্রধানমন্ত্রী জীবন জ্যোতি বিমা যোজনা (PMJJBY) : ঠিক একই পদ্ধতিতে ১৮ থেকে ৫০ বৎসর বয়সের যে কোনও ব্যাংক খাতাধারী লিখিত আবেদন করে মাত্র ₹ ৩৩০ টাকা বার্ষিক বিমা শুল্ক দিয়ে মোট ₹ ২.০০ লক্ষ টাকা জীবন বিমার সুযোগ পেতে পারেন। গ্রাহকের আবেদনের ভিত্তিতে বিমা শুল্ক ব্যাংক গ্রাহকের সঞ্চয় খাতা থেকে সরাসরি তুলে নিয়ে আপনার বিমার সুবিধা পৌঁছে দেবে এবং একই পদ্ধতিতে নবীকরণও করে দেবে।

৩. অটল পেনশন যোজনা (APY) : এই যোজনার সাহায্যে ১৮ থেকে ৪০ বৎসরের যে কোনও ব্যাংক সঞ্চয় খাতা ধারী ব্যক্তি মাসিক ছোট শুল্কের বিনিময়ে ₹ ১০০০ থেকে ₹ ৫০০০ টাকা পর্যন্ত মাসিক সুনিশ্চিত পেনশন পেতে পারেন ৬০ বৎসর বয়স থেকে। এই যোজনার অন্তর্গত সুবিধা পাবার একমাত্র শর্ত হল গ্রাহকের যে কোনও ব্যাংকে সঞ্চয় খাতা থাকা আবশ্যিক। যদি ১৮ বৎসর বয়সে কোনও ব্যক্তি এই অটল পেনশন যোজনায় নাম নথিভুক্ত করেন, তবে মাত্র মাসিক ₹ ৪২ টাকার বিনিময়ে ৬০ বৎসর বয়স থেকে মাসিক ₹ ১০০০ টাকার সুনিশ্চিত পেনশন পেতে থাকবেন। যে সমস্ত গ্রাহক ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৫ তারিখের পূর্বেই এই যোজনাতে যোগদান করেছেন, ভারত সরকার ৫ বৎসর ধরে প্রতি বৎসর বিমা শুল্কের শতকরা ৫০ শতাংশ অথবা ₹ ১০০০ টাকা গ্রাহকের হয়ে জমা করে দেবে।

সারণি-৪
১৫-০২-২০১৬ তারিখ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের তিন সামাজিক সুরক্ষা যোজনার অগ্রগতি

ব্যাংক	প্রধানমন্ত্রী সুরক্ষা বিমা যোজনা	প্রধানমন্ত্রী জীবন-জ্যোতি বিমা যোজনা	অটল পেনশন যোজনা	মোট
জাতীয়কৃত ব্যাংক	৫১৮৮৩৩২	১০৯২৯৪১	৯৬১৬৭	৬৩৭৭৪৪০
গ্রামীণ ব্যাংক	৫১১৩৯৯	৯৪০৬৪	৪৬৬৩	৬১০১২৬
বেসরকারি ব্যাংক	১৩০৯৩৮	৫৪০৯০	৪৯৭০	১৯০২৯৮
সমবায় ব্যাংক	২৬৬৪১	৯৩০২	০	৩৫৯৪৩
মোট	**৫৮৫৭৩১০**	**১২৫০৬৯৭**	**১০৫৮০০**	**৭২১৩৮০৭**

সূত্র : পশ্চিমবঙ্গ SLBC

জন-ধন যোজনাতে ব্যাংক খাতা খোলার সুযোগ গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে খুলে যাবে সামাজিক সুরক্ষার উপরোক্ত তিন যোজনার অধিকার। আপনাকে শুধুমাত্র একটি চিঠি দিয়ে ব্যাংক কর্তৃপক্ষকে আপনার যোগদানের ইচ্ছে জানিয়ে দিতে হবে। ১৫.০২.২০১৬ তারিখ পর্যন্ত এই তিন সমাজ সুরক্ষা যোজনার অগ্রগতি সারণি-৪-এ তুলে ধরা হল।

প্রধানমন্ত্রী জন-ধন যোজনার সাফল্যের পেছনে পশ্চিমবাংলার অবদান সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। জাতীয় স্তরে জন-ধন যোজনাতে সফল যোগদানের উৎকর্ষতার জন্য ২০১৫ সালের সেরা ব্যাংকের শিরোপা পায় এই বাংলারই ব্যাংক—ইউনাইটেড ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া।

উপসংহার

ভারতীয় অর্থনীতির আঙ্গিনায় প্রধানমন্ত্রী জন-ধন যোজনার সাফল্য অনেকাংশেই নির্ভর করছে ব্যাংকের হাতে সহজলভ্য তথ্য-প্রযুক্তিগত কৌশলের উপর। ই-কেওয়াইসি, ইউএসডিডি-নির্ভর মোবাইল ব্যাংকিং, আইএমপিএস, মাইক্রো এটিএম, ন্যাশনাল ইউনিফাইড প্ল্যাটফর্ম, রুপে ডেবিট কার্ড, আধার কার্ডভিত্তিক ধনরাশি গ্রাহকের সঞ্চয় খাতাতে জমা করার বৈদ্যুতিন প্রযুক্তি ইত্যাদি সুযোগ করে দিয়েছে শাখাহীন ব্যাংকিং লেনদেনের বহুমুখী সরল ব্যবস্থার গ্রামীণ এলাকার বিশাল জনগোষ্ঠীর আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকে এর ফলে সম্ভব ও সফল করা সম্ভব হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী জন-ধন যোজনা সারা ভারতের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গেও খুলে দিয়েছে এক সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ উন্নতির দিশা।

জন-ধন যোজনাতে সারা দেশে প্রায় ২২ কোটি সঞ্চয় খাতার মধ্যে এখনও প্রায় ২৬ শতাংশ খাতা কোনও ধন-রাশি জমা ছাড়াই রয়ে গেছে এই বিপুল সংখ্যক খাতাকে লেনদেনের আওতায় নিয়ে আসার জন্য চাই সার্বিক আর্থিক সাক্ষরতা অভিযান। আর ব্যাংকগুলোর সামনে এখন এটাই সব চাইতে বড় যুদ্ধ জয়ের আহ্বান। দারিদ্র্য দূরীকরণের প্রকৃত সুফল আমরা শুধু তখনই দেখতে পাব। গ্রামীণ ভারতের অর্থনীতিতে এক নতুন দিশা এবং আশার আলো জাগিয়েছে এই প্রধানমন্ত্রী জন-ধন যোজনা।❑

[**লেখক পরিচিতি** : লেখক প্রাক্তন AGM, ইউনাইটেড ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া। বর্তমানে W.B. State Rural Livelihood Mission-এর ব্যাংকিং কনসালট্যান্ট। email : ranjitroy.52.ubi@gmail.com]

কূটনীতি : দেশে সবার উন্নয়ন ও বিশ্বাঙ্গণে আরও প্রভাব বিস্তার

শুধুমাত্র বিকাশহার বৃদ্ধি নয়। নতুন সরকার চায় সর্বস্তরের মানুষের উন্নয়ন। উন্নয়নের সুফল পাবার অধিকার আছে প্রতিটি মানুষের। সমতা ও ন্যায়ের তত্ত্বেও মেলে এর সমর্থন। বিশ্ব এখন এক ভুবনগ্রাম। ২০১৪-র মে মাসে কেন্দ্রে ক্ষমতায় আসার পরপরই, নতুন সরকার দীর্ঘমেয়াদি প্রেক্ষিতে একগোছা নয়া উদ্যোগ ঘোষণা করে। এসবের মধ্যে মেক ইন ইন্ডিয়া, স্কিল ইন্ডিয়া, স্মার্ট সিটি, পরিকাঠামো উন্নয়ন, ডিজিটাল ইন্ডিয়া, পরিচ্ছন্ন ভারত-এর মত কিছু কর্মসূচি আপাতদৃষ্টিতে অভ্যন্তরীণ তালিকাভুক্ত। এসব কর্মসূচি সফল করতে অবশ্য বিদেশি অংশীদার, প্রত্যক্ষ বিদেশি লগ্নি, আর্থিক সাহায্য ও প্রযুক্তি হস্তান্তরের মত বৈদেশিক উপকরণ যথেষ্ট জরুরি। এহেন পরিস্থিতি যথাযথ সামাল দিয়েছে ভারতের কূটনীতি। এবং স্বল্প সময়ের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটিয়ে অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিয়েছে। নয়া কলেবরের এই বিদেশ নীতি এখন কর্মতৎপর, বাস্তবমুখী, রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কূটনীতির এক খাসা মিলমিশ এবং উন্নয়নকেন্দ্রিক। দেশের সর্বস্তরের মানুষের বিকাশের নিমিত্ত এক অনুকূল বহির্জগৎ গড়ে তোলা এর লক্ষ্য। অভ্যন্তরীণ কর্মসূচির আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে কূটনৈতিক উদ্যোগকে মানানসই করাই নতুন এই বিদেশনীতির মূলকথা। এছাড়া, বিশেষ করে, পড়শি দেশগুলির আস্থা অর্জনে খামতির সমস্যাদি ঘোচানো এর লক্ষ্য। এই বিদেশনীতি চায়, বিশ্বে সব দেশের সঙ্গে মৈত্রী ও সহযোগিতার সম্পর্ক গড়ে তুলতে। আন্তর্জাতিক আঙ্গিনায় ভারতের মর্যাদা আরও বাড়াতে। *লিখছেন*—**অচল মালহোত্রা**

প্রতিটি দেশের অর্থনীতি এক সুতোয় গাঁথা। দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে। সবাইকে উন্নয়নের ভাগীদার করার লক্ষ্যে ভুবনগ্রামের পুঁজির হাটে দেশের অর্থনীতির উজ্জ্বল ভাবমূর্তি বিকোতে ভারতের কূটনীতি ইদানীং দস্তুরমত তৎপর।

ভারতের স্বপ্ন পূরণের কর্মপ্রচেষ্টায় আন্তর্জাতিক অংশীদারদের সামিল করার জন্য এই রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক কূটনীতির উদ্যোগে সাড়া মিলেছে চমৎকার। এর কিছু কিছু এখানে তুলে ধরা হচ্ছে।

দেশে সবার বিকাশপূর্ণ কূটনীতি

● **পরিকাঠামো ও অর্থসংস্থান :** দেশে অত্যাধুনিক পরিকাঠামোর দ্রুত বিস্তার ভারতের লক্ষ্য। এজন্য দরকার প্রচুর লগ্নি। গত বছর আগস্টে প্রধানমন্ত্রীর দুবাই সফরকালে এই খাতে পুঁজি ঢালার জন্য সংযুক্ত আরব আমিরশাহি-ভারত পরিকাঠামো বিনিয়োগ তহবিল গড়ার কথা ঘোষণা করা হয়। ভারতে পরিকাঠামো খাতে লগ্নির জন্য এই তহবিলে ৭৫০০ কোটি ডলার জোগাড় করার লক্ষ্য ধার্য করা হয়েছে। ভারতের জাতীয় পরিকাঠামো বিনিয়োগ তহবিলের কর্তৃত্বাধীনে এক অংশীদারি কোষ খুলেছে ভারত ও ব্রিটেন। বিদেশি সহযোগিতার ও সহায়তা থেকে বিশেষ করে ফায়দা তোলার আশা ভারতের রেল ও সড়ক ক্ষেত্রের। উত্তর-পূর্বাঞ্চলে সড়ক যোগাযোগের উন্নয়নে ঋণ জোগাতে জাপান রাজি। জাপানের সহযোগিতায় মুম্বই-আমেদাবাদ রুটে চলবে দ্রুতগতির বুলেট ট্রেন। এখন মুম্বই থেকে ট্রেনে আমেদাবাদ পাড়ি দিতে সময় লাগে সাত ঘণ্টা। বুলেট ট্রেন সময় নেবে মাত্র ঘণ্টা দুয়েক। চেন্নাই ও আমেদাবাদ মেট্রো প্রকল্পের জন্য বিদেশ উন্নয়ন সহায়তা তহবিল থেকে ১০ হাজার কোটি ইয়েন ঋণ দেবে টোকিও। ব্যেঙ্গালুরু এবং কোচি মেট্রো প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্যায়ে ফ্রান্স লগ্নি করবে। নাগপুর মেট্রোর জন্যও মিলবে ফরাসি পুঁজি। ব্যেঙ্গালুরু এবং নাগপুর মেট্রো প্রকল্পে ৫০ কোটি ইউরো করে ঋণ দেবে জার্মানিও। রেল ক্ষেত্রে সহযোগিতা বাড়ানোর জন্য ভারত ও চিন একমত। প্রস্তাবিত প্রকল্পগুলির অন্যতম হচ্ছে চেন্নাই-ব্যেঙ্গালুরু-মনিপুর রেলপথে ট্রেনের গতিবৃদ্ধি। বিহারের মাধেপুরায় বৈদ্যুতিক রেল ইঞ্জিন কারখানা গড়তে ৩২০ কোটি ইউরো লগ্নি করবে ফরাসি সংস্থা অ্যানস্টম। ভারতে রেল পরিকাঠামোয় অর্থসংস্থানের জন্য লন্ডনে এই প্রথম ভারতীয় মুদ্রায় বন্ড বা ঋণপত্র ছাড়ার তোড়জোড় চলছে।

● **ভারত বানাও কর্মসূচি (Make in India) :** বিভিন্ন দেশ থেকে এই কর্মসূচিতে মিলেছে ব্যাপক সাড়া। ভারতে Ka226 হেলিকপ্টার যৌথভাবে উৎপাদনে রাশিয়া রাজি। মেক ইন ইন্ডিয়া কর্মসূচির আওতায়, কয়েকটি পরমাণু বিদ্যুৎ কারখানা তৈরির ক্ষেত্রে স্থানীয় কাঁচামাল ব্যবহার এবং ভারতে যন্ত্রাংশ উৎপাদনেও সে দেশের সায় মিলেছে। এ ব্যাপারে এক কর্মসূচি চূড়ান্ত করেছে রাশিয়ার রসঅ্যাটম (RosAtom) ও ভারতের পরমাণু শক্তি দপ্তর। জইতাপুর পরমাণু বিদ্যুৎ প্রকল্পে দেশি সাজসরঞ্জাম-কাঁচামশলা ব্যবহার বৃদ্ধি ও প্রযুক্তি হস্তান্তরে সম্মত এল অ্যান্ড টি এবং ফরাসি সংস্থা আরিভা (AREVA)। ভারতে C295 হেলিকপ্টার যৌথভাবে নির্মাণ করবে এয়ারবাস (AIRBUS) ও টাটা। হেলিকপ্টার তৈরির জন্য মহীন্দ্রার সঙ্গেও

প্রাথমিক চুক্তি সেরে ফেলেছে এয়ারবাস সংস্থা। AH64 অ্যাপাচে হেলিকপ্টারের কাঠামো বানাবে বোয়িং (BOEING)। ভারতে বানাও কর্মসূচিতে লগ্নি করতে ১২০০ কোটি ডলারের এক বিশেষ তহবিল গড়েছে ভারত-জাপান। জাপানে রপ্তানির জন্য ভারতে গাড়ি তৈরি করবে মারুতি সংস্থা।

● **বিদেশি লগ্নি :** কূটনৈতিক উদ্যোগের দরুন ভারতীয় অর্থনীতির বাড়বাড়ন্তে আস্থার চিহ্ন ফুটে উঠেছে প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ থেকে। ২০১৫-য় এই বিনিয়োগ তার আগের বছরের তুলনায় বেড়েছে ৪০ শতাংশ। ভারত ও চিনের সংস্থাগুলি ২২০০ কোটি ডলারের সমঝোতাপত্র সই করেছে। আর ভারতীয় ও ব্রিটিশ বেসরকারি সংস্থাগুলির মধ্যে ৯২০ কোটি পাউন্ডের চুক্তি হয়েছে। এর মধ্যে এক ভোডাফোনই লগ্নি করবে ১৩০ কোটি পাউন্ড। পরিকাঠামো প্রকল্প ও স্মার্ট সিটির জন্য আগামী ৫ বছরে ৩৫০০ কোটি ডলার বিনিয়োগের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে জাপান। দক্ষিণ কোরিয়া লগ্নি করবে ১ হাজার কোটি ডলার; অর্থনৈতিক উন্নয়ন সহযোগিতা তহবিল বাবদ ১০০ কোটি ডলার এবং রেল, বিদ্যুৎ উৎপাদন ও পরিবহণের জন্য ৯০০ কোটি ডলার। ভারতে ৩-টি নতুন কারখানা গড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে নামজাদা জার্মান অটোমোটিভ এঞ্জিনিয়ারিং সংস্থা বশ (Bosch)। এজন্য বিনিয়োগ করবে ১০ হাজার কোটি পাউন্ড।

● **স্মার্ট সিটি :** ভারতে স্মার্ট সিটির উন্নয়নে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছে বেশকিছু দেশ। বিশাখাপত্তনম, আমেদাবাদ, এলাহাবাদ-এর উন্নয়নে রাজি হয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। ফ্রান্স স্মার্ট সিটি প্রকল্পে ২০০ কোটি ইউরোর বেশি লগ্নির আশ্বাস দিয়েছে। এর বেশিরভাগটাই খরচ হবে চণ্ডীগড়, নাগপুর ও পুদুচেরির জন্য।

● **ডিজিটাল ইন্ডিয়া ও স্কিল ইন্ডিয়া :** ডিজিটাল ইন্ডিয়া কর্মসূচি রূপায়ণে যথেষ্ট পরিমাণ বিনিয়োগের কথা দিয়েছে মাইক্রোসফট ও গুগলের মত বিভিন্ন বহুজাতিক সংস্থা। আর স্কিল ইন্ডিয়া কর্মসূচির ক্ষেত্রে ভারতকে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি এসেছে আমেরিকা, জার্মানি, ব্রিটেন, কানাডা, জাপান, সিঙ্গাপুর ও মালয়েশিয়ার-সহ বেশকিছু দেশ থেকে।

● **পরিচ্ছন্ন গঙ্গা :** গঙ্গা নদীকে আগের চেহারায় ফিরিয়ে আনার জন্য আর্থিক সাহায্য, বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ ও প্রযুক্তি জোগানোর প্রস্তাব দিয়েছে জাপান ও জার্মানি।

● **শক্তি নিরাপত্তা :** এক্ষেত্রে, কূটনৈতিক উদ্যোগ মূলত পরিচ্ছন্ন শক্তির জন্য অংশীদারিত্বের লক্ষ্যে। গত বছর ডিসেম্বরে প্যারিস জলবায়ু সম্মেলনের ফাঁকে ভারতের প্রচেষ্টায় শতাধিক দেশের আন্তর্জাতিক সৌরশক্তি সংক্রান্ত গোষ্ঠী গঠন এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। এই গোষ্ঠীর সচিবালয় গড়তে ভারত জমি দিয়েছে গুড়গাঁওয়ে। সচিবালয়ের পরিকাঠামো নির্মাণের জন্য বরাদ্দ করেছে ৩ কোটি ডলার। পরিচ্ছন্ন শক্তি উৎপাদনের অংশভাগ বাড়ানো ভারতের লক্ষ। এজন্য বিদেশ থেকে ইউরেনিয়াম আমদানি ও ভারতে পরমাণু বিদ্যুৎ কারখানা গড়ার ক্ষেত্রে অসামরিক পরমাণু সহযোগিতা চুক্তি সম্পাদনে যথেষ্ট অগ্রগতি লক্ষ করা গেছে।

আস্থা বর্ধন, ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন ও বিশ্বাঙ্গণে বৃহত্তর ভূমিকার জন্য কূটনীতি

পি-৫, অর্থাৎ রাষ্ট্রসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের ৫ স্থায়ী সদস্যদেশ ছাড়াও, বিশ্বের সব গুরুত্বপূর্ণ এলাকা—দক্ষিণ এশিয়া, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, পশ্চিম এশিয়া, মধ্য এশিয়া, উপসাগরীয় অঞ্চল, আফ্রিকা, এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে ভারতের কূটনীতি সক্রিয়। আসিয়ান, ইএএস (ইস্ট এশিয়া সামিট), ন্যাম, জি-২০, ব্রিকস, এসসিও (সাংহাই কোঅপারেশন অর্গানাইজেশন) এহেন আঞ্চলিক গোষ্ঠীর সঙ্গে ভারত নিয়ত যোগাযোগ রেখে চলছে। রাষ্ট্রসংঘের অধিবেশনেও ভারতীয় প্রতিনিধিরা তৎপর।

● **সর্বাগ্রে পড়শি দেশ :** এই নীতি এক গুরুত্বপূর্ণ ও বড়সড় কূটনৈতিক উদ্যোগ। নতুন প্রধানমন্ত্রী আনুষ্ঠানিকভাবে ক্ষমতাভার গ্রহণের আগেই এই নীতি ঘোষণা করেন। ২০১৪-এর মে মাসে নরেন্দ্র মোদীর প্রধানমন্ত্রী পদে শপথ নেবার অনুষ্ঠানে সার্ক-এর সব সরকার/রাষ্ট্রপ্রধানকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। পড়শি দেশগুলির সঙ্গে সম্পর্ককে ভারতের নতুন রাজনৈতিক জমানা যে কতটা গুরুত্ব দেয় এ তার এক চমৎকার নজির। প্রারম্ভিক যোগাযোগ স্থাপন করতে এটা সাহায্য করেছিল। পরে সফর বিনিময় এবং আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সম্মেলনের ফাঁকে বৈঠকের মাধ্যমে তা জারি রাখা হয়। থমকে যাওয়া ভারত-পাক আলোচনা প্রক্রিয়া ফের চালু করতে এই শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান কাজে লেগেছিল অনেকখানি। এককথায়, ভারতের 'সর্বাগ্রে পড়শি দেশ' এর উদ্যোগ যথেষ্ট সন্তোষজনক। ভুটান ও বাংলাদেশের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক বেশ মজবুত। এই সম্পর্ক ক্রমশ আরও জোরদার হচ্ছে। স্থল সীমান্ত চুক্তি অনুমোদনের ফলে ভারত-বাংলাদেশ-এর মধ্যে ৪০৯৬ কিলোমিটার সীমান্ত সমস্যা মিটেছে। অনুপ্রবেশ, মানুষ পাচার, চোরাচালান কমাতেও সাহায্য করবে এই চুক্তি। ১৬১-টি ছিটমহলের ৫০ হাজার মানুষ পেয়েছে নাগরিকত্বের অধিকার। নেপালের সঙ্গে চিড় খাওয়া সম্পর্কে কিছুটা প্রলেপ পড়েছে। শ্রীলঙ্কা ও মলদ্বীপের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক নতুন করে গড়ে তোলা সম্ভব হয়েছে। আফগানিস্তান-ভারত দ্বিপাক্ষিক কৌশলগত অংশীদারিত্ব এখন ফের জোরদার। খেদের কথা, ভারত যথেষ্ট নমনীয়তা দেখানো সত্ত্বেও পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক এখনও তলানিতে। সান্ত্বনা এই যে, আলোচনার দরজা-জানলা পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়নি। অদূর ভবিষ্যতে এ ব্যাপারে অগ্রগতির আশা রাখতে দোষ কি?

● **পি-৫ :** আমেরিকা, চিন, ব্রিটেন, রাশিয়া ও ফ্রান্স সফরের মাঝে রাষ্ট্রসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের ৫ স্থায়ী সদস্য দেশের সঙ্গে সম্পর্ক নতুন করে গতি পেয়েছে। ২০১৪-র মে মাসে দিল্লিতে নতুন সরকার ক্ষমতায় আসা ইস্তক একটা ধারণা চাউর হচ্ছিল যে, মার্কিন নেতৃত্বাধীন পশ্চিমী জগতের কাছ ঘেঁষার চেষ্টায় ভারত তার বহুদিনের পরীক্ষিত মিত্র রাশিয়া থেকে ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে। এই প্রেক্ষিতে ২০১৫-য় প্রধানমন্ত্রী মোদীর মস্কো যাত্রা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সফরের দরুন রাশিয়ার উদ্বেগ কাটানো গেছে। পারস্পরিক আস্থা এসেছে ফিরে। বিশ্ব ক্রমশ বেশি করে বহু মেরুর হয়ে উঠছে। ইদানীংকার এই বিশ্বে খাপ খাইয়ে চলতে একে অন্যের বাধ্যবাধকতাও মালুম করতে পেরেছে ভারত ও রাশিয়া।

● **অ্যাক্ট ইস্ট নীতি :** লুক ইস্ট পলিসি বা পুবে তাকাও নীতির ঘোষণা ১৯৯০-এর

দশকের গোড়ার দিকে। এই নীতির এখন উত্তরণ ঘটেছে অ্যাক্ট ইস্ট পলিসিতে। পুবে কাজ কর নীতিতে আসিয়ানের সঙ্গে বিশেষ করে অর্থনৈতিক সম্পর্কে ভারত জোর দিয়েছে নতুন করে। আসিয়ান-ভারত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি উন্নয়ন তহবিলে দিল্লি তার দেয় টাকার অঙ্ক ১০ লক্ষ ডলার থেকে ৫০ লক্ষে বাড়ানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

● **দ্বীপ :** সমুদ্রপথের নিরাপত্তা এবং সমুদ্র অর্থনীতির প্রেক্ষিতে মলদ্বীপ, শ্রীলঙ্কা ও মরিশাসের মত দ্বীপরাষ্ট্রের প্রতি কূটনীতিতে নজর দেওয়ার উদ্যোগ গুরুত্ব পাওয়ার দাবি রাখে। চিনের স্ট্রিং অব পার্লস-এর এক মোক্ষম জবাব এই কৌশল।

● **উপসাগর ও পশ্চিম এশিয়া/মধ্যপ্রাচ্য :** ভারতের শক্তি নিরাপত্তা ও বহু অনাবাসী ভারতীয়ের কর্মস্থল হওয়ার দরুন এই অঞ্চল গুরুত্বপূর্ণ। আইএস-এর মতো গোঁড়া ও সন্ত্রাসবাদী শক্তি ইদানীং মাথাচাড়া দেওয়ায় জঙ্গিহানার আশঙ্কাও জুড়েছে এর সঙ্গে। ২০১৫-য় প্রধানমন্ত্রীর সংযুক্ত আরব আমিরশাহি ও এ বছর এপ্রিলে সৌদি আরব সফরকালে এমন ইস্যু খতিয়ে দেখা হয়। আমিরশাহি সফরের ফলে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক হয়েছে আরও জোরদার। দু পক্ষের সম্পর্ক এখন উন্নীত হয়েছে 'পূর্ণাঙ্গ কৌশলগত অংশীদারিত্বে'। সৌদি আরবের সঙ্গে কৌশলগত অংশীদারিত্ব আরও পোক্ত হয়েছে। উপসাগর ও ভারত মহাসাগরে সমুদ্রপথে নিরাপত্তা ও সাইবার নিরাপত্তা-সহ প্রতিরক্ষা ক্ষেত্র ও সন্ত্রাস দমনে সহযোগিতা যথেষ্ট গুরুত্ব পেয়েছে। সন্ত্রাস, টাকাকড়ি তছরূপ ও জঙ্গিদের অর্থ জোগান সম্পর্কিত গোয়েন্দা তথ্য একে অন্যকে জানাতে দু দেশ একমত।

● **দিল্লিতে ভারত-আফ্রিকা ফোরামে** (অক্টোবর, ২০১৫) যোগ দেন আফ্রিকার ৪১-টি দেশের সরকার বা রাষ্ট্রপ্রধান ও প্রতিনিধি। দু'পক্ষের বহু যুগের পুরনো সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ করা এবং এক 'গতিশীল ও পরিবর্তনকামী' কর্মসূচি সূচনার এ ছিল এক চমৎকার সুযোগ। এর ফলে ভারত ও আফ্রিকা আগামী দিনে পরস্পরের আরও কাছাকাছি আসবে। 'দিল্লি ঘোষণা ২০১৫' উন্নয়নে সহযোগিতাতে আফ্রিকা-ভারত অংশীদারিত্বকে মুখ্য স্থান দিয়েছে। পরবর্তী ৫ বছরে আফ্রিকায় উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য ১ হাজার কোটি ডলার ঋণ দেবে ভারত। দেওয়া হবে পাঁচ হাজার বৃত্তি এবং ৬০ কোটি ডলার অনুদান। এ সবের দরুন আফ্রিকায় ভারতের মানমর্যাদা বাড়বে অবশ্যই। ভারতের প্রতি সৌহার্দ্যমূলক মনোভাব ব্যাপক বৃদ্ধি পাবে। আফ্রিকায় চিনের ক্রমবর্ধিত দাপট মোকাবিলা করার সুবিধা হবে।

● **বহুপাক্ষিক মঞ্চ :** রাষ্ট্রসংঘ, জি-২০, আসিয়ান, ব্রিকস, ন্যামের মত বহুপাক্ষিক মঞ্চে ভারতের জবরদস্ত ভূমিকা দেশের আন্তর্জাতিক মর্যাদা বাড়াতে সাহায্য করেছে। আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ, রাষ্ট্রসংঘ ও অন্যান্য তদ্রূপ প্রতিষ্ঠানের কাঠামো সংস্কার, জলবায়ু পরিবর্তন, সাইবার নিরাপত্তা, বিশ্ব বাণিজ্য চুক্তি ইত্যাদি ইস্যুতে ভারতের নিরন্তর প্রচেষ্টা আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং আন্তর্জাতিক কর্মসূচির রূপদানে যথেষ্ট প্রভাব ফেলেছে। সাংহাই কোঅপারেশন অর্গানাইজেশনে (এসসিও) ভারতকে পূর্ণ সদস্য করার হয়েছে। এর আগে ভারত ছিল নিছক পর্যবেক্ষক দেশ। এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল অর্থনৈতিক সহযোগিতা বা অ্যাপেক-এ ভারতের সদস্য পদে সমর্থনের বহর থেকে স্পষ্ট স্বীকৃতি মেলে যে, এই এলাকায় আমাদের দেশের এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। আন্তর্জাতিক পরমাণু রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, যেমন—ক্ষেপণাস্ত্র প্রযুক্তি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা (এসটিসিআর), পরমাণু সরবরাহক গোষ্ঠী (এনএসজি), অস্ট্রেলিয়া গোষ্ঠী এবং ওয়াশেনার বন্দোবস্তের (Wassenar Arrangement) সদস্যপদে ভারতের আবেদনে সমর্থন এখন আগের চেয়ে ঢের বেশি সোচ্চার। রাষ্ট্রসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে ভারতের স্থায়ী সদস্যপদের পক্ষে সমর্থন বেড়েছে। আন্তর্জাতিক সন্ত্রাস সংক্রান্ত পূর্ণাঙ্গ বিধি দ্রুত গ্রহণের জন্য রাষ্ট্রসংঘে প্রস্তাব পেশ করেছে ভারত। এই প্রস্তাবের পক্ষে মিলেছে ব্যাপক সমর্থন। প্যারিস জলবায়ু সম্মেলনে চুক্তির খসড়া চূড়ান্ত করতে ভারতের ভূমিকা বিশ্বের প্রশংসা কুড়িয়েছে। জলবায়ু ন্যায়ের (climate justice) তত্ত্ব সমর্থনের সময় প্রযুক্তি হস্তান্তর ও উন্নত দুনিয়ার দায়দায়িত্ব নিয়ে ভারতের প্রস্তাব চূড়ান্ত নথিতে ঠাঁই পেয়েছে। রাশিয়ার উফা শহরে গত বছরের জুলাইয়ে ব্রিকস-এর সপ্তম শীর্ষ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী মোদীর পেশ করা 'দশ কদম' বা দশ দফা কর্মসূচির মধ্যে আছে বাণিজ্য মেলা, ক্রীড়া, চলচিত্রোৎসব, কৃষি, অডিট ইত্যাদি বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে আঞ্চলিক সহযোগিতার একগোছা প্রস্তাব। এই সম্মেলনে ১০ হাজার কোটি ডলার মূলধনের এক নতুন উন্নয়ন ব্যাংক স্থাপনের জন্য ভারতের প্রস্তাব মেনে নেওয়া হয়।

● **যোগাযোগ :** আঞ্চলিক ও দ্বিপাক্ষিক স্তরে সমন্বয় বিকাশে যোগাযোগ বাড়ানোর জন্য কূটনৈতিক উদ্যোগের মধ্যে অন্যতম চট্টগ্রাম ও মংলা বন্দর ব্যবহার করতে বাংলাদেশের সঙ্গে চুক্তি, কলকাতা-ঢাকা-আগরতলা বাস চলাচল শুরু, ভারত-ভুটান-বাংলাদেশ-নেপাল মোটরযান চুক্তি। ভারত ও আসিয়ানের মধ্যে সড়ক ও ডিজিটাল যোগাযোগ প্রসারের প্রকল্প বাবদ আমাদের দেশ ১০০ কোটি ডলার ঋণ দেবার আশ্বাস দিয়েছে। ইরানে ছাবাহর বন্দর গড়ে তুলতে তেহরানের সঙ্গে চুক্তি করেছে ভারত। জলপথ-রেলপথ-সড়কের মাধ্যমে ভারত, ইরান ও মধ্য এশিয়াকে সংযুক্ত করতে আন্তর্জাতিক উত্তর-দক্ষিণ করিডোর তৈরির কাজে দ্রুত হাত দিতে ভারত চেষ্টা চালাচ্ছে। ভারত-মায়ানমার-থাইল্যান্ড হাইওয়ে বা মহাসড়ক নির্মাণ প্রকল্প নিয়ে ভারত সমান তৎপর। এই হাইওয়ে তৈরি হয়ে গেলে দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির ঢের উপকার হবে। এককথায়, গত ২২ মাসে গরজ নিয়ে সক্রিয় ও বাস্তবমুখী কূটনীতি অনুসরণ জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ একগুচ্ছ প্রকল্প বিকাশের পক্ষে যথেষ্ট কাজে লেগেছে। আন্তর্জাতিক ঘটনাবলি ও আলাপ-আলোচনার ক্রমবিকাশে সদর্থক অবদানে এক সক্ষম গুরুত্বপূর্ণ দেশ হিসেবে স্বীকৃতি মেলার সুবাদে বিশ্বের আঙিনায় বেড়েছে ভারতের মর্যাদা ও খ্যাতি।❑

(**লেখক পরিচিতি :** লেখক বিশিষ্ট কূটনীতিবিদ। আর্মেনিয়া ও জর্জিয়ায় ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত। ইমেল : achal_malhotra@hotmail.com)

WBCS-2014: অ্যাকাডেমিকের আবার ঐতিহাসিক সাফল্য

একটি মাত্র সেন্টার থেকে ১২০ জনেরও বেশি সফল

Academic Association helped me immensely to overcome my ignorance about the interview process. After achieving my goal, I would extend my heartfelt gratitude to all the people, who helped me in my journey, specially to the Academic Association.

– **Abhishek Basu**, Executive (**Rank-4**)-2014

The mock interview sessions at Academic Association helped me immensely in scoring good marks at the Interview. Tenacity, dedication and determination are as important as hard work is.

– **Sofia Abbas**, Executive-2014

অ্যাকাডেমিকের স্যারদের পরামর্শ আমাকে সাফল্যের সঠিক রাস্তাটি খুঁজে নিতে সাহায্য করে। যার ফলশ্রুতিতে আমি প্রথমবার পরীক্ষা দিয়েই এক্সিকিউটিভে সফল হই।

– **অমিত বিশ্বাস,** Executive-2014

এস.আই. হিসাবে পুলিশে ট্রেনিংরত অবস্থায় যখন পরীক্ষার জন্য রাতজেগে প্রস্তুতি নিতাম এবং আসুরিক পরিশ্রমে শরীর ভেঙে পড়লেও মনোবল হারায়নি। অ্যাকাডেমিকে ছাত্র- শিক্ষকের রসায়ন ও বন্ধুত্বপূর্ণ আলোচনার মাধ্যমে পড়াশুনার ধরণটা এক কথায় অনন্য। – **সুমন কান্তি ঘোষ,** DSP-2014

ডব্লুবিসিএস অফিসার হওয়া ছিল আমার ছোটোবেলার স্বপ্ন। অ্যাকাডেমিকের স্যারদের পরামর্শে আমি বিশেষভাবে উপকৃত হয়েছি, ইন্টারভিউয়ের সময় আত্মবিশ্বাস বাড়াতে পেরেছি, ভুল-ত্রুটি সংশোধন করতে পেরেছি। – **অমর্ত্য কুমার শী,** AITO-2014

গ্র্যাজুয়েশনের রেজাল্ট প্রকাশিত হওয়ার আগেই ডব্লুবিসিএস সম্পর্কে সম্পূর্ণ অস্বচ্ছ ধারণা নিয়ে অ্যাকাডেমিকে ভর্তি হই। এই মূল্যবান গাইডটুকু না পেলে আজ হয়তো আমিও ব্যর্থতার জন্য ভাগ্যকেই দোষারোপ করতাম। আমার সাফল্যে আমার মা-বাবা এবং অ্যাকাডেমিকের অবদান অবিস্মরণীয়। – **নার্গিস সুলতানা,** RO-2014

I owe my success to Academic Association to a great extent. Academic Association provided me the right and strong foundation for the WBCS preparation and the personal guidance and motivation provided by Mr. Samim Sarkar helped me a lot to convert my dream of becoming a WBCS (Exe) officer into reality.

– **Mithun Majumder**, Executive-2014

My success in WBCS (Exe), 2013 & WBCS (CTO), 2014 are attributed to proper support, guidance, coaching & grooming rendered by my parents & Academic Association.

– **Amartya Debnath**, CTO (**Rank-4**)-2014, Executive (**1st attempt**)-2013

অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনে ইন্টারভিউয়ের জন্য অনেক সাহায্য পেয়েছি। নিজের ওপর বিশ্বাস, হাল না ছাড়ার মানসিকতা ও অ্যাকাডেমিকের সাহায্য আমাকে আমার লক্ষ্যে পৌঁছে দিয়েছে।

– **মৌমিতা সেন,** DSP-2014(**Rank-7**), RO-2013, CI-2012

একটি মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত সামিম স্যারের আর্টিকেল পড়ে খুবই উপকৃত হই। ডব্লুবিসিএস পরীক্ষার স্ট্র্যাটিজিক দিকগুলির ব্যাপারে অবহিত হই স্যারের লেখা পড়ে। সামিম স্যারের সাজেশন পাই যা ইন্টারভিউ বোর্ডে আমাকে অনেক স্মার্ট, স্বচ্ছ ও সাবলীল করে তোলে। – **সামিম বিশ্বাস,** DSP-2014, RO-2013

It needs a logical and smart studies to crack Civil Services. One must be consistent and learn things smartly. My heartiest thanks to Academic Association for my success. – **Sajid Mahmad**, CTO-2014

Obviously the journey is tiring and tedious, but I can say that if one seriously prepare for WBCS exam, one can definitely crack it in its first attempt itself. I shower my utter gratitude to the entire team of Academic Association for their sincere endeavour which helped me to clear my WBCS with utmost ease. – **Md. Imran**, CDPO-2014

WBCS 2015 : ইন্টারভিউ

আপনার সাফল্য সুনিশ্চিত করতে এখানে যা পাবেন — **IAS 2015, WBCS-2014, 2013, 2012, 2011** ইন্টারভিউতে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে এমন **১৫০০ + প্রশ্ন**। ● কমপ্লিট স্টাডি কিট। ● অভিজ্ঞ শিক্ষক এবং WBCS টপারদের সামনে প্রচুর মক ইন্টারভিউ। ● আই.এ.এস-টপারদের ইন্টারভিউয়ের 'সাকসেস ফান্ডা'। ● ইন্টারভিউ সম্পর্কে ডব্লুবিসিএস টপারদের অভিজ্ঞ মতামত। ● **CTO/ACTO, BDO/Jt BDO** এবং **DSP** কে প্রথম চয়েস দেওয়ার স্বপক্ষে যুক্তি। ● ইংরাজিতে কথা বলার দূর্বলতার দূরীকরণের উপায়। এবং আরোও অনেক কিছু ..... **ইন্টারভিউ ক্লাসে ভর্তি চলছে।**

WBCS কাউকে খালি হাতে ফেরায় না

ডব্লুবিসিএস -২০১৬-এর প্রিলি প্রশ্নপত্র দেখে অনেকেই হয়তো মনে করছে প্রশাসনিক পদ তাদের জন্য নয়। প্রথমেই বলি, পরিবর্তিত প্যাটার্নের প্রশ্নপত্রের সাথে নিজেকে অভিযোজিত করতে হবে। প্রিলি হোক বা মেন এগোতে হবে সুপরিকল্পিত ভাবে। আনডিফাইন সিলেবাসকে সংক্ষিপ্ত করতে জানতে হবে। কি পড়তে হবে জানার আগে জানতে হবে কি পড়তে হবে না। ঠিক এই কারণেই একজন সুদক্ষ গাইডের প্রয়োজন, যারা পারবে সঠিক রাস্তার সন্ধান দিতে। ডব্লুবিসিএস প্রস্তুতির অন্য একটি ভালো দিক হল — ডব্লুবিসিএস সিলেবাসটি রপ্ত করতে পারলে অন্যান্য চাকরিগুলিতে (সি.জি.এল, ক্লার্ক, এস.আই. (পুলিশ) ইত্যাদি অতি সহজেই পাওয়া যায়।

WBCS 2017 ব্যাচে ভর্তি চলছে। আসন সংখ্যা সীমিত ।

Academic Association

The Self Culture Institute, 53/6 College Street (College Square), Kolkata - 700073

✆ 9674478644

✆ 9038786000

Website : www.academicassociation.in■Centre: ✹Uluberia-9051392240✹Barasat-9800946498 ✹Birati-9674447451✹Berharampur-9474582569✹Darjeeling-9832041123✹Midnapur-9474736230

মিশন ইন্দ্রধনুষ : এক স্বপ্ন শপথ

*ভারতে নবজাতক ও গর্ভবতী মায়েদের টিকাকরণ কর্মসূচি চালু আছে সেই ১৯৭৮ সাল থেকেই। পরবর্তীতে ১৯৮৫ সালে দেশের সমস্ত শিশুকে টিকাকরণ কর্মসূচির আওতায় আনার জন্য সূচনা হয় 'সার্বিক টিকাকরণ কর্মসূচি' (ইউআইপি)-র। অথচ দীর্ঘপথ পেরিয়ে ২০১৪ সালে এসে দেখা গেল যে, দেশে মাত্র ৬৫ শতাংশ শিশুকে পূর্ণ টিকাকরণের আওতায় আনা সম্ভব হয়। তাই, বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার ২০১৪ সালের ২৫ ডিসেম্বর দিনটিতে সূচনা করে, দেশের সমস্ত শিশুকে (অন্ততঃ ৯০ শতাংশ) আগামী ৫ বছরের মধ্যে পূর্ণ টিকাকরণের আওতায় আনার এক অভিনব উদ্যোগের—'মিশন ইন্দ্রধনুষ'। প্রথম দফায় দেশের ২০১-টি জেলাকে চিহ্নিত করা হয় একাজের জন্য। পরবর্তীতে আরও দু'টি পর্যায়ে চলে এই মিশনের কর্মকাণ্ড। বর্তমান নিবন্ধে এই মিশনের প্রয়োজনীয়তা, সাফল্য এবং আগামী দিনের কতর্ব্য বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। আলাদাভাবে খতিয়ান দেওয়া হয়েছে এরাজ্যে মিশনের হালহকিকতের। লিখেছেন—***ড. অজয় কুমার চক্রবর্তী***

টিকাকরণ কর্মসূচি প্রতিটি দেশের স্বাস্থ্য কর্মসূচির এক প্রধান অঙ্গ। ভারতবর্ষে ১৯৭৮ সাল থেকে চালু এই কর্মসূচির নাম ছিল এক্সপ্যান্ডেড প্রোগ্রাম অফ ইমিউনাইজেশান বা সংক্ষেপে ইপিআই। মূলত শহরকেন্দ্রিক পরিষেবা, গর্ভবতী মহিলাদের টিটেনাস টক্সয়েড এবং শিশুদের টিবি, ডিপথেরিয়া, হুপিংকাশি, টিটেনাস ও পোলিও রোগ প্রতিরোধের জন্য যথাক্রমে বিসিজি, ডিপিটি (ডিপথেরিয়া, পারটুসিস বা হুপিং কাশি ও টিটেনাসের সম্মিলিত টিকা) ও ওপিভি (ওরাল পোলিও ভ্যাকসিন) দেওয়া হত। পরবর্তীকালে, ১৯৮৫ সালে সমস্ত শিশুকে এই টিকাকরণ কর্মসূচির আওতায় আনার লক্ষ্যে ইউনিভারসাল ইমিউনাইজেশন প্রোগ্রাম বা ইউআইপি চালু করা হয় সঙ্গে যোগ করা হয়; হামের টিকা মিসিলস্। প্রতিটি গ্রামে সমস্ত শিশুকে এই পরিষেবা দেবার লক্ষ্যে প্রতি ৫০০০ জনসংখ্যায় একটি করে সাব-হেল্‌থ সেন্টার তৈরি হয় এবং বহুমুখী স্বাস্থ্যকর্মী নিয়োগ করা হয়। লক্ষ্য ছিল প্রতিটি শিশুকে এক বছর পূর্ণ হবার আগে একমাত্রা বিসিজি, তিনমাত্রা ওপিভি ও ডিপিটি এবং একমাত্রা মিসিলস টিকার সাথে এক লক্ষ ইউনিট ভিটামিন-এ তেল খাওয়ানো। এইভাবে সমস্ত শিশুকে পূর্ণ টিকাকরণ করলে, অর্থাৎ এক বছর বয়স পূর্ণ হবার আগেই তাকে এই প্রত্যেকটি টিকা সঠিক মাত্রায় দিলে সে যেমন এই রোগগুলি থেকে সুরক্ষিত থাকবে, তেমনই আস্তে আস্তে মানুষের মধ্যে থেকে এই রোগগুলির সংক্রমণ কমিয়ে এনে রোগগুলি নির্মূলীকরণের দিকে এগিয়ে যাওয়া যাবে।

টিকাকরণের মাধ্যমে গুটিবসন্ত বা স্মল পক্স নির্মূল (১৯৭৬ সাল) সংক্রামক রোগের বিরুদ্ধে মানুষের যুদ্ধ জয়ের এক গর্বের ইতিহাস। এই সাফল্যকে স্মরণে রেখেই পরবর্তীকালে ১৯৯৫ সালে পোলিও মুক্ত ভারতের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। মনে রাখতে হবে যে রোগগুলি শুধুমাত্র মানুষের মধ্যেই সংক্রামিত হয়, অন্য কোনও প্রাণীর দেহে বিস্তার লাভ করতে পারে না, সেই রোগগুলিকেই সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করা সম্ভব। পোলিও, হাম এই ধরনের রোগ শুধু মানুষের শরীরেই বাসা বাঁধে—তাই এগুলিকে পৃথিবী থেকে চিরতরে নির্মূল করা সম্ভব। পোলিও রোগ তিনরকম ভাইরাস—টাইপ-১, ২, ৩ থেকে হয়। এই তিন প্রকার ভাইরাসের বিরুদ্ধে মুখে খাওয়ানোর টিকা, ট্রাইভ্যালেন্ট ওরাল পোলিও ভ্যাকসিন, প্রধানত টিকাকরণ কর্মসূচির জন্য ব্যবহৃত হত। অন্যান্য বাইভ্যালেন্ট (যাতে টাইপ-১ ও ৩ আছে, টাইপ-টু নেই) বা মনোভ্যালেন্ট-যে কোনও এক প্রকার, সাধারণত টাইপ-১-ও পাওয়া যায়। এই খাবার টিকায় জীবন্ত ভাইরাস থাকে, যারা শিশুর অন্ত্রে ১-২ মাস বংশবৃদ্ধি করে এবং মলের সাথে নির্গত হয়। কিন্তু এই ভাইরাসের কাউকে আক্রমণ করার ক্ষমতা থাকে না এইভাবে ভ্যাকসিন প্রস্তুত করা হয়। অন্ত্রে দীর্ঘ দিন বংশ বিস্তার করার ফলে, পরিবেশে ওই ভ্যাকসিন ভাইরাস ছড়িয়ে পড়ে এবং জলবাহিত রোগের মত অন্য শিশুর শরীরে প্রবেশ করে। তাতে সেই সব শিশুর শরীরেও প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে ওঠে। মনে রাখতে হবে, এই ভাইরাস পরিবেশে মাত্র দু'দিনের মত বেঁচে থাকতে পারে, এর মধ্যে কোনও শিশুর অন্ত্রে আশ্রয় না পেলে এই ভাইরাস মারা যায়। 'পালস পোলিও' কর্মসূচি নেওয়া হয় ১৯৯৫ সালে। উদ্দেশ্য ছিল, সব শিশুকে যদি একই সময়ে এই ভ্যাকসিন খাওয়ানো হয়, তবে পরিবেশের যে আক্রমণকারী ভাইরাস, তারা যেহেতু কোনও শিশুর অন্ত্রে বাসা বাঁধতে পারবে না, তারা স্বল্প সময়ের মধ্যেই অবলুপ্ত হয়ে যাবে। তাই ১৯৯৫ সাল থেকে নিরন্তর বছরে তিন থেকে পাঁচ বার পর্যন্ত সমস্ত দেশজুড়ে একই সঙ্গে সমস্ত পাঁচ বছরের নিচে শিশুকে এই পালস পোলিও কর্মসূচির মাধ্যমে টিকাকরণ করা হয়। কিন্তু পাশাপাশি এর সঙ্গে যদি নিয়মিত টিকাকরণে জোর না

দেওয়া হয়, তবে বেশকিছু অরক্ষিত শিশু থেকে যায়, তাতে এই নির্মূল কর্মসূচি ব্যাহত হয়। যে এলাকায় এই নিয়মিত টিকাকরণের ঘাটতি থাকে, সেখানে এই রোগের ভাইরাস এইসব অরক্ষিত শিশুদের মাধ্যমে নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখে।

পৃথিবীতে শেষ টাইপ-২ ভাইরাস পাওয়া যায় ১৯৯৯ সালে, ভারতবর্ষের আলিগড়ে। পৃথিবীর সমস্ত দেশের বিভিন্ন পরিবেশ থেকে নমুনা পরীক্ষা করে, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ২০১৫ সালের সেপ্টেম্বরে এই ঐতিহাসিক যুদ্ধ জয়ের কথা ঘোষণা করে। এতদিনের বিশ্বব্যাপী পোলিওর বিরুদ্ধে যুদ্ধ জয়ের প্রথম মাইল স্টোন হিসাবে পোলিও টাইপ-২ উচ্ছেদ সম্পূর্ণ বলে ঘোষণা করা হয়। আর তাই ২০১৬ সালের এপ্রিল থেকে সারা পৃথিবীতে মুখে খাওয়ানোর ট্রাইভ্যালেন্ট ভ্যাকসিন বন্ধ করে বাইভ্যালেন্ট ভ্যাকসিন ব্যবহার শুরু করা হয়, যাতে শুধু টাইপ-১ আর টাইপ-৩ আছে। পোলিওর বিরুদ্ধে শেষ যুদ্ধের প্রস্তুতির এটা একটা প্রধান কর্মসূচি। এরই সঙ্গে পৃথিবীর সমস্ত দেশে মৃত ভাইরাস দিয়ে প্রস্তুত ইনঅ্যাক্টিভেটেড পোলিও ভ্যাকসিন বা সংক্ষেপে আইপিভি চালু করার কর্মসূচি নেওয়া হয়। এই আইপিভি ইঞ্জেকশানের মাধ্যমে দেওয়া হয়, এতে তিনপ্রকার ভাইরাসই থাকে। যেহেতু মৃত ভাইরাস, তাই এই ভাইরাস বংশবৃদ্ধি করতে পারে না। এতে শুধু শিশুর দেহে রোগ প্রতিরোধ তৈরি হয়, কিন্তু পরিবেশে অন্য শিশুর শরীরে এই ভাইরাস পৌঁছতে পারে না।

ওরাল পোলিও ভ্যাকসিনের ভাইরাস শিশুর অন্ত্রে দীর্ঘদিন ধরে বংশ বিস্তার করে, বিশেষ করে যে শিশুর শরীরে রোগ প্রতিষেধক ব্যবস্থা দুর্বল, তাদের শরীরে, বা যেখানে সামগ্রিকভাবে শিশুদের মধ্যে পূর্ণ টিকাকরণ না হওয়ার জন্য বহু শিশু অরক্ষিত থাকে, তাদের শরীরে। দীর্ঘদিন ধরে বংশ বিস্তারের ফলে এই সব ভাইরাস কোনও কোনও ক্ষেত্রে জিনগত পরিবর্তনের মাধ্যমে রোগক্রান্ত করার ক্ষমতা অর্জন করে, আর তার থেকে প্রতিরোধহীন সুস্থ শিশুর পোলিও সংক্রমণ হলে তার পঙ্গুত্বের সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে। টাইপ-২ ভাইরাস এইভাবে

বর্ধমানের মঙ্গলকোট ব্লকের দুরমুট গ্রামে মিশন ইন্দ্রধনুষ আই সি

সবচেয়ে দ্রুত সংক্রমণ করতে পারে। আর তাই ভ্যাকসিনজনিত যত পোলিও আক্রমণ দেখা যায়, তার প্রায় ৯৭ শতাংশই এই টাইপ-২ দিয়ে হয়। তাই বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পরামর্শে সমস্ত পৃথিবী থেকে এই মুখে খাওয়ার টাইপ-২ ভাইরাস বন্ধ করে শুধু বাইভ্যালেন্ট ভ্যাকসিনে 'সুইচ্' করা হয় বিগত এপ্রিল, ২০১৬ সালে।

এই 'সুইচ' কর্মসূচির মাধ্যমে টাইপ-২ ওরাল ভ্যাকসিন বন্ধ হবার ফলে আগামী দিনে আর কোনও শিশু ওরাল টাইপ-২ পাবে না, ফলে তাদের মধ্যে টাইপ-২ ভাইরাসের প্রতিরোধ গড়ে উঠবে না। ফলে যে এলাকায় পূর্ণ টিকাকরণ কম হয়, সেখানে দীর্ঘদিন এই আগে ভ্যাসকিন খাওয়ানো শিশুদের শরীর থেকে নির্গত জিনগত পরিবর্তন হওয়া টাইপ-২ ভাইরাস নতুন শিশুদের মধ্যে পোলিও আক্রমণ ঘটাতে পারে। প্রতিরোধ করার রাস্তা দু'টি; প্রথম প্রতিটি কম টিকাকরণের এলাকা খুঁজে বার করে, যেখানে পূর্ণ টিকাকরণের জোরদার অভিযান চালিয়ে অন্তত ৯০ শতাংশ শিশুকে পূর্ণ প্রতিষেধক প্রদান করা আর ইঞ্জেকশনের মাধ্যমে ইনঅ্যাক্টিভেটেড পোলিও ভ্যাকসিন (আইপিভি) প্রদান করা, যাতে শিশুর শরীরে টাইপ-২ প্রতিষেধকও গড়ে ওঠে। আর এই ৯০ শতাংশ টিকাকরণ করতে হবে 'সুইচের' মাধ্যমে টাইপ-২ তুলে নেবার আগে, তবেই সুফল মিলবে। আগামী দিনেও এই সমস্ত এলাকায় অন্তত ৯০ শতাংশ শিশুকে পূর্ণ প্রতিষেধকের আওতায় আনতে হবে। এই উদ্দেশ্য নিয়ে ভারত সরকার ২০১৪ সালের ২৫ ডিসেম্বর ভারতবর্ষের ২০১-টি কম টিকাকৃত জেলা চিহ্নিত করে সেখানকার সব শিশুকে (অন্তত ৯০ শতাংশ) পূর্ণ টিকাকরণের লক্ষে 'মিশন ইন্দ্রধনুষ' কর্মসূচি হাতে নেয়। ভারত সরকারের এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং মর্যাদার কর্মসূচি, যা সারা বিশ্বে ভারতবর্ষের সম্মান বৃদ্ধি করেছে। প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন, আগামী ২০২০ সালের মধ্যে ভারতবর্ষের সমস্ত জেলায় অন্তত ৯০ শতাংশ পূর্ণ টিকাকরণের লক্ষ্য নিয়ে এই 'মিশন ইন্দ্রধনুষ' কর্মসূচি। এটা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপারও বটে, কারণ ১৯৮৫ সাল থেকে সার্বিক টিকাকরণ কর্মসূচি শুরু করে এ পর্যন্ত দেশের মাত্র ৬৫ শতাংশ শিশুকে পূর্ণ টিকাকরণের আওতায় আনা গিয়েছে। তাই আগামী মাত্র ৫ বছরে আরও ২৫ শতাংশ পূর্ণ টিকাকরণের স্বপ্ন সফল করতে হলে আমাদের প্রত্যেককেই প্রচুর পরিশ্রমের শপথ নিতে হবে।

'মিশন ইন্দ্রধনুষ'-এর স্বপ্ন সফল করার জন্য প্রাথমিকভাবে ভারতবর্ষের ২০১-টি

জেলাকে সনাক্ত করা হয়েছিল। যেসব জেলায় অসম্পূর্ণ ঠিকা নেওয়া শিশুর সংখ্যা খুব বেশি। পশ্চিমবঙ্গের ছয়টি জেলা যথাক্রমে—উত্তর দিনাজপুর, মুর্শিদাবাদ, বর্ধমান, বীরভূম, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা এই প্রথম পর্বের কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত হয়। এর পরে দ্বিতীয় পর্বে আবার ছয়টি জেলা—মালদা, কলকাতা, হাওড়া, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর এবং পুনরায় উত্তর দিনাজপুর এই কর্মসূচির জন্য নির্দিষ্ট হয়। এরপর তৃতীয় পর্বে আবার উত্তর দিনাজপুর-সহ, কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি, মুর্শিদাবাদ, বর্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া, পূর্ব মেদিনীপুর, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগণা—মোট এগারোটি জেলা নির্বাচিত হয়। প্রতিটি পর্বে চার মাস ধরে, প্রত্যেক মাসের ৭ তারিখ থেকে ১৪ তারিখ পর্যন্ত এই টিকাকরণ কর্মসূচি পালিত হয়। প্রথম পর্ব ছিল ২০১৫ সালের ৭ এপ্রিল থেকে ১৪ এপ্রিল এবং মে, জুন ও জুলাই মাসের ৭ থেকে ১৪ তারিখ পর্যন্ত। পরবর্তীকালে অক্টোবর, নভেম্বর, ডিসেম্বর, ২০১৫ ও জানুয়ারি, ২০১৬ সালে দ্বিতীয় পর্যায় এবং এপ্রিল, মে, জুন, জুলাই, ২০১৬ তৃতীয় পর্যায় মিশন ইন্দ্রধনুষ কর্মসূচি গৃহিত হয়।

এই কর্মসূচির প্রাথমিক লক্ষ্য ২ বছরের নিচের শিশু, যারা কোনও দিন টিকা নেয়নি (লেফ্‌ট আউট) অথবা যারা কোনও কারণে টিকাকরণ সম্পূর্ণ করেনি (ড্রপ আউট); তাদেরকে চিহ্নিত করে তাদের পূর্ণমাত্রায় টিকাকরণ করা। পূর্ণমাত্রায় টিকাকরণের জন্য যেহেতু অন্তত চারবার এক মাসের ব্যবধানে টিকা নিতে হয়, তাই এই প্রতিটি পর্যায়ে চার মাস টিকাকরণ করা হয়। আর এই সময় যেসমস্ত গর্ভবতী মা টিটেনাস টিকার পুরো মাত্রা (২-টি ডোজ) পূর্ণ করেনি, তাদেরকেও চিহ্নিত করে এই কর্মসূচির মাধ্যমে টিকা দেওয়া হচ্ছে দ্বিতীয় লক্ষ্য। এইভাবে দুর্বল টিকাকরণের জায়গাগুলি চিহ্নিত করার পর 'মিশন ইন্দ্রধনুষ'-এর পরবর্তী পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট এলাকাগুলিতে নিয়মিত টিকাকরণের কেন্দ্র চালু করা হচ্ছে তৃতীয় লক্ষ্য। যাতে ওই এলাকার মা ও শিশুরা নিয়মিত টিকাকরণের সুযোগ পায়। সারা ভারতবর্ষ জুড়ে যে সাতটি টিকা চালু আছে, সেই টিকাগুলি যথাক্রমে টিটেনাস টক্সয়েড (টিটি), বিসিজি (যক্ষ্মার টিকা), হেপাটাইটিস-বি (জন্ডিসের টিকা), ডিপথেরিয়া, হুপিংকাশি ও টিটেনাশের বিরুদ্ধে ডিপিটি টিকা, পোলিওর টিকা (এপিভি) আর হামের বিরুদ্ধে মিসিলস্ টিকা এবং সাথে ভিটামিন-এ একমাত্রা। সমস্ত শিশুকে এই সাতটি টিকা দিয়ে তাদের জীবনে রামধনুর সুরক্ষা আনার এই স্বপ্ন শপথের নামই 'মিশন ইন্দ্রধনুষ'। এছাড়াও যে রাজ্যে আরও যেসব টিকা চালু আছে, যেমন পশ্চিমবঙ্গে পেন্টাভ্যালেন্ট, যাতে ডিপিটি, হেপাটাইটিস-বি ও সাথে হিমোফিলাস এইচ ইনফ্লুয়েঞ্জা-বি (এইচআইবি) শিশুদের মারাত্মক নিউমোনিয়া ও মেনিনজাইটিস সংক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য টিকা এবং জাপানি এনকেফালাইটিসের বিরুদ্ধে জেই ভ্যাকসিন, মোট এই নয় প্রকার টিকা দেওয়া হয়। রাজ্যে চালু সব টিকাই পূর্ণমাত্রায় দেবার লক্ষ্যে মিশন ইন্দ্রধনুষ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয় এখানে।

প্রাথমিক পর্যায়ে পশ্চিমবঙ্গে ৬-টি জেলায় চার মাসে মোট ৩,০১,৮০৭-টি শিশুকে ও ৭৮,৬৩৬ জন গর্ভবতী মাকে এই কর্মসূচির আওতায় আনা হয়। এর জন্য মোট ২৪,৪৩৭-টি টিকাকরণ সেশান

সারণি-১
পশ্চিমবঙ্গ মিশন ইন্দ্রধনুষ : ১২-২৩ মাস বয়সের শিশুদের পূর্ণ টীকাকরণের মাত্রা

ক্রমিক সংখ্যা	জেলা ও স্বাস্থ্য জেলা	এন.এফ.এইচ.এস.-৪ (শতাংশ হিসেবে)	এম.সি.টি.এস., মে ২০১৬ পর্যন্ত (শতাংশ হিসেবে)
১.	ঝাড়গ্রাম*		৯৮.৬
২.	বাঁকুড়া	৯৬.২	৯৬.৯
৩.	জলপাইগুড়ি	৮১.৭	৯৬.৮
৪.	পশ্চিম মেদিনীপুর	৯২.২	৯৬.৭
৫.	আলিপুরদুয়ার*		৯৫.৪
৬.	আসানসোল*		৯৫.২
৭.	বিষ্ণুপুর*		৯৪.৭
৮.	কুচবিহার	৭৬.৬	৯৪.৫
৯.	বর্ধমান	৮২.৩	৯৩.৪
১০.	রামপুরহাট*		৯৩.২
১১.	দক্ষিণ ২৪ পরগণা	৯৪.৮	৯২.৬
১২.	মুর্শিদাবাদ	৭৮.৯	৯২.৫
১৩.	নন্দীগ্রাম*		৯২.৫
১৪.	পূর্ব মেদিনীপুর	৯২.৬	৯১.৬
১৫.	বীরভূম	৯১.৪	৯১.৩
১৬.	উত্তর দিনাজপুর	৬৬.০	৯১.১
১৭.	ডায়মন্ড হারবার*		৮৯.৬
১৮.	বসিরহাট*		৮৫.৬
১৯.	উত্তর ২৪ পরগণা	৮৮.৭	৮৩.৩
২০.	হাওড়া	৭৩.৮	৭৯.৬
২১.	মালদা	৬৯.৫	৭৪.৬
২২.	কলকাতা	৬৬.৭	
২৩.	দার্জিলিং	৮৪.২	৯৩.২
২৪.	দক্ষিণ দিনাজপুর	৮৩.২	৯২.৩
২৫.	হুগলী	৮৮.৪	৯০.২
২৬.	নদীয়া	৯৩.২	৮৯.০
২৭.	পুরুলিয়া	৮৭.৪	৮৬.৭
	মোট রাজ্য	**৮৪.৪**	**৯০.২**

অনুষ্ঠিত করা হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে ৪,৪৯৪-টি সেশানের মাধ্যমে ৫২,৫৬৬-টি শিশুকে ও ৭৪৫৩ জন গর্ভবতী মাকে টিকা দেওয়া হয়। তৃতীয় পর্যায়ে মে, ২০১৬ পর্যন্ত দু'বারে মোট ৬১৭৬-টি সেশানের মাধ্যমে ৫৮,০৮৩-টি শিশু ও ১১,১৭৯ জন গর্ভবতী মাকে টিকা দেওয়া হয়। এ পর্যন্ত, প্রথম পর্যায়ে ৬৭২১৬-টি শিশু, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়ে ১০,৭০৭টি ও ১৩২৬৫-টি শিশুকে পূর্ণ টিকাকরণ করা হয় (১ বছরের মধ্যে সবগুলি টিকার সবগুলি মাত্রা), এছাড়াও ২ বছর বয়সের জন্য সব টিকা পুরো মাত্রায় নিয়ে যারা ২ বছরের নিচে সম্পূর্ণ টিকা নিয়েছে তাদের সংখ্যা প্রথম পর্যায়ে ২৪,৬৯৭, দ্বিতীয় পর্যায়ে ৭৪৩৬ ও তৃতীয় পর্যায়ে ৯৮৫৫ জন। সব মিলিয়ে মোট ৯১,১৮৮ জন শিশু পূর্বমাত্রায় ও ৪১,৯৮৮ জন সম্পূর্ণ টিকা পেয়েছে। সব মিলিয়ে ১,৩৩,১৭৬-টি শিশু আর ৫২,২১৫ জন গর্ভবতী মা এই কর্মসূচির মাধ্যমে উপযুক্ত সুরক্ষা পেয়েছে।

গ্রামীণ এলাকার মায়েরা ও শিশুরা ঠিকমত পরিষেবা পাচ্ছে কিনা দেখার জন্য সারা ভারতবর্ষ জুড়ে ইন্টারনেটের মাধ্যমে নজরদারির ব্যবস্থা আছে। প্রতিটি মা ও শিশুকে 'মাদার অ্যান্ড চাইল্ড ট্রাকিং সিস্টেম' (এম.সি.টি.এস)-এর মাধ্যমে নথিভুক্ত করা হয় এবং তাদের প্রতিটি পরিষেবা পরবর্তীকালে নথিভুক্ত করা হয়। এইভাবে আমরা প্রতিটি মা ও শিশুকে নাম ধরে সনাক্ত করতে পারি এবং কোন এলাকায় কতজন মা বা শিশু এই পরিষেবা অসম্পূর্ণ গ্রহণ করেছে তারও নজরদারি করতে পারি। এই ব্যবস্থার মাধ্যমে আমরা প্রতিটি এলাকার পূর্ণ টিকাকরণের পরিসংখ্যান অনেক নির্ভুল ভাবে মাপতে পারি। এছাড়া, তিন/চার বছর অন্তর ভারত সরকার পরিচালিত 'ডিস্ট্রিক লেভেল হাউসহোল্ড সার্ভে' বা ডি.এল.এইচ.এস এবং 'ন্যাশানাল ফ্যামিলি হেলথ সার্ভে' বা এন.এফ.এইচ.এস.—যা সারা ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্য ও জেলা ভিত্তিক তথ্য সংগ্রহ করে, সেই সমীক্ষা থেকেও গ্রহণযোগ্য

পরিসংখ্যান পাওয়া যায়। ডি.এল.এইচ.এস.-৩, ২০০৭-০৮ সালের যে তথ্য প্রকাশ করে, তাতে পশ্চিমবঙ্গের পূর্ণ টিকাকরণের মাত্রা ছিল ৭৫.৮ শতাংশ, এবং ডি.এল.এইচ.এস.-৪ (২০১২-১৩)-তে এটা ৩.৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে হয় ৭৯.৫ শতাংশ। ২০১৫-১৬ সালের সংগৃহীত তথ্য নিয়ে এন.এফ.এইচ.এস-৪ প্রকাশিত হয় কিছুদিন আগে। দেখা যাচ্ছে ২০১৫-১৬ সালে আরও পাঁচ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে পশ্চিমবঙ্গের পূর্ণ টিকাকরণের মাত্রা ৮৪.৫ শতাংশ হয়েছে। মিশন ইন্দ্রধনুষের তৃতীয় পর্যায়ের মাঝামাঝি এসে আমরা যদি এম.সি.টি.এস.-এর মাধ্যমে গ্রামীণ শিশুদের পরিসংখ্যান দেখি (৯০.২ শতাংশ)—তাহলে বুঝতে পারি 'মিশন ইন্দ্রধনুষের' মাহাত্ম্য আর পশ্চিমবঙ্গে চিহ্নিতকৃত প্রতিটি জেলায় তার সার্থক রূপায়ন। সারণী-১-এ প্রতিটি জেলাভিত্তিক এন.এফ.এইচ.এস.-৪ ও বর্তমানে সংগৃহীত (৩১.৫.২০১৬) এম.সি.টি.এস. তথ্যের তুলনামূলক পরিসংখ্যান দেখান হ'ল—এর ফলে বোঝা যাবে 'মিশন ইন্দ্রধনুষ' কর্মসূচির মাধ্যমে বিভিন্ন জেলায় পূর্ণ-টিকাকরণের মাত্রা কতটা বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে ৭-টি স্বাস্থ্য জেলা ও আলিপুরদুয়ার নতুন জেলা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। তাই এম.সি.টি.এস তথ্যে এই জেলাগুলির পরিসংখ্যান আলাদা করে দেখানো আছে—এন.এফ.এইচ.এস.-৪ এর তথ্যের ফল তুলনা করতে গেলে, পুরোন অবিভক্ত জেলার পরিসংখ্যানই এই নতুন জেলাগুলির ক্ষেত্রে গ্রহণ করতে হবে।

'মিশন ইন্দ্রধনুষ'-এর সাফল্য প্রশ্নাতীত। পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত গ্রামে স্বাস্থ্যকর্মী, অঙ্গন ওয়ারি কর্মী, আশা কর্মী ও অগণিত স্বেচ্ছাসেবী কর্মীরা সকলের কাছে স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দেবার যে নিরন্তর প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন, 'মিশন ইন্দ্রধনুষ'-এর হাত ধরে তা সম্পূর্ণ সার্থকতার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। এই সব তৃণমূল স্তরের কর্মীদের কঠোর পরিশ্রমের জন্যই আজ ভারতবর্ষ পোলিও মুক্ত, আগামী দিনে আরও অনেক রোগের মুক্তি আসবে তাঁদেরই হাত ধরে। সামনে অনেক কাজ। সবাই মিলে এগিয়ে এলে কোনও যুদ্ধ জয়ই অসম্ভব নয় দেখিয়ে দিয়েছে 'মিশন ইন্দ্রধনুষ'। ❑

(**লেখক পরিচিতি** : লেখক পশ্চিমবঙ্গের স্বাস্থ্য দপ্তরের ডেপুটি সেক্রেটারি এবং এরাজ্যে 'মিশন ইন্দ্রধনুষ'-এর নোডাল অফিসার। ইমেল : ddhsfwwb@gmail.com)

স্বচ্ছ ভারত মিশন (গ্রামীণ) : পশ্চিমবঙ্গের প্রেক্ষাপট ও মিশন নির্মল বাংলা

ভারতে গ্রামীণ স্বাস্থ্যবিধান কর্মসূচিতে সবশেষ পরিবর্তনটি ঘটানো হয়েছে ২০১৪ সালের ২ অক্টোবর। ওই দিন বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার সংশ্লিষ্ট পূর্বতন প্রকল্পটিতে কিছু রদবদল ঘটিয়ে 'স্বচ্ছ ভারত মিশন' নামে নতুনভাবে এটিকে চালু করে। স্বচ্ছ ভারত মিশন প্রকল্পটির প্রথম দিন থেকেই প্রায় প্রতিটি রাজ্য একে একটি চ্যালেঞ্জ হিসাবে দেখেছে। উন্মুক্ত স্থানে শৌচকর্ম বিষয়টির সঙ্গে জড়িত লজ্জা ও সম্মানহানির বিষয়টি তো বটেই, জনস্বাস্থ্য ও অর্থনীতির উপর এর প্রত্যক্ষ কুপ্রভাবের বিষয়টির কথা ভেবেই প্রায় প্রতিটি রাজ্য প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা পূরণে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। আমাদের রাজ্য পশ্চিমবঙ্গেও কাজ চলছে জোরকদমে। এরাজ্যে স্বচ্ছ ভারত মিশন (গ্রামীণ)-এর হালহকিকৎ নিয়ে বর্তমান নিবন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন—**সোনালি দত্ত রায়**

পথ চলা শুরু বেশ কিছুদিন আগে। জনস্বাস্থ্য ও জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে স্বাস্থ্যবিধানের গুরুত্ব উপলব্ধি করে নীতিপ্রণেতারা ১৯৮১-১৯৯০ দশককে চিহ্নিত করেছিলেন নিরাপদ পানীয় জল ও স্বাস্থ্যবিধানের দশক হিসাবে। তারও আগে NREP ও RLEGP প্রকল্পগুলির আওতায় প্রতিষ্ঠানগুলিতে (স্কুল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র ইত্যাদি) পাকা শৌচাগার বানানো শুরু হয়। ১৯৮৬ সালে 'কেন্দ্রীয় গ্রামীণ স্বাস্থ্যবিধান কর্মসূচি' (CRSP-Central Rurual Sanitation Programme) প্রচলনের মাধ্যমে গ্রামীণ স্বাস্থ্যবিধান কর্মসূচিকে সরকারের ন্যূনতম কর্মসূচির (Minimum needs Programme) আওতায় আনা হয়। কিন্তু এই উদ্যোগের অগ্রগতি খুব সন্তোষজনক হয়নি। কাঙ্ক্ষিত শতকরা পঁচিশ ভাগ লক্ষ্যমাত্রার জায়গায় ১৯৯০ সালের মার্চ মাস নাগাদ দেখা গেছিল যে, ভারতবর্ষের কেবলমাত্র শতকরা দশটি গ্রামীণ পরিবার শৌচাগারের সুবিধা লাভ করেছে। পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে এই হার ছিল শতকরা বারো ভাগের সামান্য বেশি।

১৯৯০ সালের গোড়াতেই নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন ও ইউনিসেফের মিলিত উদ্যোগে এই রাজ্যের অবিভক্ত মেদিনীপুর জেলায় স্বাস্থ্যবিধানের একটি নিবিড় কর্মসূচি গৃহীত হয়। এই প্রচেষ্টার মূল ভিত্তি ছিল প্রচার ও জনসংযোগের মাধ্যমে স্বাস্থ্যবিধানের বিবিধ দিকগুলির প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করে তোলার মাধ্যমে স্বাস্থ্যবিধান উপকরণের চাহিদা সৃষ্টি করা এবং চালু সরকারি প্রকল্পের সঙ্গে সমষ্টির চাহিদার সমন্বয় ঘটানো। নিয়মিত পর্যালোচনা, বিভিন্ন স্তরে মূল্যায়ন ও পর্যালোচনা এবং সর্বোপরি ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের সক্রিয় অংশগ্রহণের ফলে এই প্রচেষ্টায় প্রকৃত অর্থেই একটি গণ উদ্যোগ সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছিল। এই উদ্যোগের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে রাজ্যের অন্যত্রও পঞ্চায়েত ব্যবস্থার সঙ্গে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা বা রুরাল স্যানিটারি মার্ট (RSM)-এর পরিকাঠামোকে ব্যবহার করে স্বাস্থ্যবিধান কর্মসূচিকে রূপায়ণ করা শুরু হয়।

মেদিনীপুরের অভিজ্ঞতা থেকে দিক্‌নির্দেশ গ্রহণ করে কেন্দ্রীয় সরকার তাদের চালু স্বাস্থ্যবিধান কর্মসূচিতে কিছু রদবদল ঘটিয়ে ১৯৯৯ সালে চালু করে 'সার্বিক স্বাস্থ্যবিধান অভিযান' (Total Sanitation Campaign)। প্রচার প্রসারের মাধ্যমে জনচেতনা গড়ে তুলে কর্মসূচিতে অনুদান নির্ভরতার বদলে চাহিদা-নির্ভর প্রকল্পে রূপান্তরিত করার লক্ষ্যে শুরু হয় নতুন যাত্রা। দারিদ্র্যসীমার নিচের উপভোক্তাকে উৎসাহবর্ধক অর্থ প্রদানের শুরুও হয় এই সময় থেকেই। সার্বিক স্বাস্থ্যবিধান অভিযান কর্মসূচির আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল। 'নির্মল গ্রাম পুরস্কার'। গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় প্রতিটি পরিবারে শৌচাগার নির্মাণ ও তার ব্যবহার, প্রতিষ্ঠানগুলিতে শৌচাগারের ব্যবস্থা এবং গ্রামের সার্বিক পরিচ্ছন্ন ও নির্মল পরিবেশ তৈরি করার উল্লেখযোগ্য সাফল্যের জন্য গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিকে 'নির্মল গ্রাম' পুরস্কারে ভূষিত করা হয়। একইভাবে পুরস্কৃত করা হত নির্মল পঞ্চায়েত সমিতি ও নির্মল জেলাগুলি। এই বিশেষ সম্মান প্রদান প্রকল্পে অগ্রগতির ক্ষেত্রে বিশেষ সহায়ক হবে এটাই আশা করা হয়েছিল। ২০০৩ থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে মোট ১০৭৭-টি গ্রাম-পঞ্চায়েত ও ৩৭-টি পঞ্চায়েত সমিতি 'নির্মল' সম্মান অর্জন করেছিল। এই উৎসাহবর্ধক পুরস্কার প্রথমদিকে যথেষ্ট জনপ্রিয়তা পেলেও পঞ্চায়েতগুলির পক্ষে মোটেই তাদের 'নির্মল' অবস্থানকে ধরে রাখা সম্ভব হয়নি।

২০১২ সালে আবার কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যবিধান প্রকল্পে কিছু পরিবর্তন আনা হল। এক একটি এলাকাকে সম্পৃক্তকরণ করার মাধ্যমে

সেই এলাকায় নিবিড় জনসংযোগ সৃষ্টি করে শৌচাগার ব্যবহারের পাশাপাশি স্বাস্থ্যবিধানের সকল দিক সম্পর্কে এলাকাবাসীকে ধারাবাহিকভাবে সচেতন করার জন্য সামাজিক (Community) নেতৃত্ব ও নজরদারি প্রতিষ্ঠা করাই হল পরিবর্তিত কর্মসূচির লক্ষ্য। এই নতুন কর্মসূচির নাম 'নির্মল ভারত অভিযান'। এর আরেকটি বিশেষত্ব হল 'মহাত্মা গান্ধী জাতীয় কর্মনিশ্চয়তা' (MGNREGA) প্রকল্পের সাথে এর সমন্বিত প্রয়োগের উদ্যোগ। দেশের কোনও কোনও জায়গা এবং এই রাজ্যের কিছু জেলাতেও এই সমন্বয়ের কিছু ভালো নিদর্শন দেখা গেলেও বেশিরভাগ জায়গাতেই এই পরীক্ষার প্রয়োগ স্থায়ী সাফল্য আনতে ব্যর্থ হয়েছে।

স্বচ্ছ ভারত মিশন

গ্রামীণ স্বাস্থ্যবিধান কর্মসূচিতে সর্বশেষ পরিবর্তনটি এসেছে ২০১৪ সালের ২ অক্টোবর। এই দিনে বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার পূর্বতন প্রকল্পটিতে বেশ কিছু রদবদল ঘটিয়ে 'স্বচ্ছ ভারত মিশন' নামে নতুনভাবে এটিকে চালু করেছে। মহাত্মা গান্ধীর ১৫০তম জন্ম শতবার্ষিকীর সঙ্গে মিলিয়ে এই নতুন প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা পূরণের জন্য ২ অক্টোবর ২০১৯ তারিখটি ধার্য হয়েছে। এই নতুন প্রকল্পে করণীয় বিষয়গুলি হল—

- প্রতিটি পরিবারে শৌচাগারের সুবিধা ও তার ব্যবহার নিশ্চিত করা।
- সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে শৌচাগারের সুবিধা।
- গৃহহীন বা ভূমিহীন পরিবারের জন্য এবং হাট-বাজার, বাসস্ট্যান্ড, হাসপাতাল ইত্যাদি জনসমাগমের স্থানে যথেষ্ট সংখ্যক সর্বসাধারণের শৌচাগার তৈরি।
- গ্রামের বা শহরের কঠিন ও তরল বর্জ্যের স্বাস্থ্যসম্মত নিষ্কাশনের জন্য পারিবারিক, গোষ্ঠীগত ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা।
- জনসাধারণের মধ্যে সঠিক সময়ে সঠিকভাবে হাত ধোয়ার অভ্যাস প্রবর্তন।
- গ্রাম বা শহর এলাকার সর্বাঙ্গীণ পরিচ্ছন্নতা বৃদ্ধি।
- মানুষের ব্যবহার পরিবর্তনের উপযোগী প্রচার-প্রসারের ব্যবস্থা।

সারণি-ক
মিশন নির্মল বাংলা কর্মসূচিতে কেন্দ্র-রাজ্য অংশীদারিত্ব

ক্রমিক সংখ্যা	উপাদান	খরচের শতাংশ	অংশীদারিত্ব		
			কেন্দ্র শতাংশ	রাজ্য শতাংশ	উপভোক্তা শতাংশ
১.	প্রচার প্রসার, প্রাক সূচনার খরচ ও দক্ষতা বৃদ্ধি	মোট প্রকল্প বরাদ্দের ৮ শতাংশ পর্যন্ত (যার মধ্যে রাজ্য খরচ করতে পারে ৫ শতাংশ)	৬০	৪০	০
২.	পারিবারিক শৌচাগার	নির্ধারিত খরচ ১২০০০.০০ টাকা	৬০	৪০	
৩.	সর্বসাধারণের জন্য শৌচাগার	নির্ধারিত খরচ ২,০০,০০০.০০ টাকা	৬০	৩০	১০
৪.	প্রশাসনিক কাজের জন্য খরচ	মোট প্রকল্প বরাদ্দের ২ শতাংশ পর্যন্ত	৬০	৪০	০
৫.	কঠিন ও তরল বর্জ্য পদার্থের নিরাপদ নিষ্কাশনের ব্যবস্থাপনা	গ্রাম পঞ্চায়েতপিছু সর্বোচ্চ ২০ লক্ষ টাকা	৬০	৪০	০

- পরিবেশগতভাবে নিরাপদ ও দীর্ঘস্থায়ী ও স্থানীয় স্তরে উপযোগী প্রযুক্তি ব্যবহারের দিকে জোর দেওয়া।

উপরের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছতে হলে যে বিষয়টিতে সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করতে হবে তা হল মানুষ এবং বৃহৎ প্রেক্ষিতে সমাজের চিন্তাধারা ও আচরণের মধ্যে স্বাস্থ্যবিধানের সপক্ষে সদর্থক পরিবর্তন আনা। পরিসংখ্যান বলছে যে বিগত কয়েকটি সরকারি প্রকল্পের সাহায্যে পশ্চিমবঙ্গে কমবেশি ৮০ লক্ষেরও বেশি পারিবারিক শৌচাগার স্থাপিত হয়েছে। যদিও বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সেই শৌচাগারগুলিতে অর্থ বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল বেশ কম, তবু একথাও অস্বীকার করার উপায় নেই যে, নিয়মিত ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণের অভাবও উক্ত শৌচাগারগুলির একটা বৃহৎ অংশের অকেজো হয়ে যাওয়ার একটা বড় কারণ। আসলে আগের সরকারি স্বাস্থ্যবিধান প্রকল্পগুলিতে শৌচাগার নির্মাণের ওপর যতটা গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল, অভ্যাস পরিবর্তনের মাধ্যমে সেগুলি ব্যবহার করার দিকে ততটা জোর দেওয়া হয়নি। এই বিষয়টিকে মাথায় রেখে সাম্প্রতিক 'স্বচ্ছ ভারত মিশন' প্রকল্পে নিবিড় ব্যক্তি যোগাযোগ (IPC) ও সামুদায়িক সচেতনতার উপর সবচেয়ে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এই প্রকল্পের আরেকটি উল্লেখযোগ্য দিক হল এর রূপায়ণের ক্ষেত্রে নমনীয়তা। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্প নির্দেশিকায় রাজ্য সরকারগুলিকে স্ব স্ব অবস্থান ও প্রেক্ষিতের উপর দাঁড়িয়ে উপযোগী ও ফলপ্রসূ রূপায়ণ নীতি প্রণয়নের স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। এই স্বাধীনতা ব্যবহারের ক্ষেত্রগুলি হতে পারে সহযোগী সংস্থা (Support organisation) বা মোটিভেটর চিহ্নিতকরণের কাজ, অথবা উৎসাহভাতা প্রদানের পদ্ধতিতে। সবশেষে যে বিষয়টির উল্লেখ করা যেতে পারে তাহল, এই প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা শৌচাগার তৈরি বা ১০০ শতাংশ পরিবারে শৌচাগার স্থাপন করা নয় বরং যে বিষয়টি এক্ষেত্রে সমধিক গুরুত্ব পেয়েছে তা হল, খোলা স্থানে শৌচ মুক্ত এলাকা (ODF—Open Defecation Free) তৈরি করা। একটি গ্রাম বা গ্রাম সংসদ এলাকাকে ODF ঘোষণার মধ্যে দিয়ে এই প্রক্রিয়া শুরু হবে এবং ক্রমশঃ ব্লক বা জেলাকে ODF ঘোষণা করতে হবে। রাজ্যের সব কটি জেলা ODF ঘোষিত হলে রাজ্য ODF বা নির্মল-এর শিরোপা পাবে।

এবার আসা যাক প্রকল্পের করণীয় দিক ও প্রকল্পমূল্যের আলোচনায়। যদিও পূর্ববর্তী সরকারি স্বাস্থ্যবিধান প্রকল্পগুলিতে শৌচাগারপিছু বরাদ্দের পরিমাণ ছিল খুবই কম, স্বচ্ছ ভারত মিশন প্রকল্পের গ্রামীণ ক্ষেত্রটিতে (যা ভারতের সকল গ্রামীণ

এলাকার জন্য প্রযোজ্য) নতুন শৌচাগারপিছু বরাদ্দ আগের তুলনায় অনেকটাই বেড়ে হয়েছে প্রতি এককপিছু ১২০০০ টাকা সর্বসাধারণের ব্যবহার্য সামুদায়িক শৌচাগারের ক্ষেত্রে প্রতি এককপিছু প্রকল্পমূল্যের পরিমাণ ২ লক্ষ টাকা। গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রকল্প তৈরির ক্ষেত্রে প্রকল্পপিছু সর্বাধিক ২০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত পাওয়া যেতে পারে। প্রাতিষ্ঠানিক শৌচাগার তৈরির বিষয়টিতে অপরিসীম গুরুত্ব আরোপ করা হলেও এর নির্মাণের দায়িত্ব বর্তমানে সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলির উপর ন্যস্ত হয়েছে। স্কুল শৌচাগার-এর ক্ষেত্রে এই দায়িত্ব কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক ও রাজ্যস্তরে বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগ এবং অঙ্গনওয়াড়ি শৌচাগারের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় নারী ও শিশু উন্নয়ন মন্ত্রক এবং রাজ্য সরকারের নারী, শিশু ও সামাজিক উন্নয়ন বিভাগ বর্তমানে প্রতিষ্ঠানগুলিতে শৌচাগার তৈরি ও তার সঠিক ব্যবহারের বিষয়টি দেখভাল করছে।

শৌচাগার নির্মাণ ও অন্যান্য ক্ষেত্রগুলিতে প্রকল্প ব্যয়ের উপর অনধিক ৫ শতাংশ অর্থ প্রকল্পের সুষ্ঠু রূপায়ণের জন্য নানাবিধ প্রচার-প্রসারের কাজে রাজ্যস্তরে ব্যয়করা যেতে পারে। এর মধ্যে রয়েছে এই প্রকল্প রূপায়ণে অংশগ্রহণকারী আধিকারিক, পঞ্চায়েত প্রতিনিধি, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, মেটিভেটর, প্রযুক্তিদক্ষ শ্রমিক ইত্যাদির প্রশিক্ষণের বিষয়টিও। এছাড়া প্রকল্প ব্যয়ের অনধিক ২ শতাংশ প্রকল্পের বিবিধ রূপায়ণ স্তরের প্রাতিষ্ঠানিক ও অন্যান্য খরচে ব্যবহার হতে পারে।

উপরের হারে একটি রাজ্যে প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা পূরণের জন্য মোট যে প্রয়োজনীয় অর্থ লাগবে তার শতকরা ৬০ ভাগ কেন্দ্রীয় সরকারের বরাদ্দ হিসাবে পাওয়া যাবে। শতকরা ৪০ ভাগ অর্থ হবে সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারগুলির দেয় (স্বচ্ছ ভারত মিশন প্রকল্পের শুরুতে এই হিসাব ছিল ৭৫ : ২৫)। সারণি-'ক'-তে এই প্রকল্পের বিবিধ উপাদানের প্রকল্পমূল্য ও কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের দেয় পরিমাণ বিবৃত হয়েছে।

সারণি-খ
মিশন নির্মল বাংলা

ক্রমিক নং	জেলার নাম	২০১২ সালের বেসলাইন সার্ভে অনুযায়ী পরিবারের সংখ্যা	শৌচাগার নেই এমন পরিবারের সংখ্যা	৩০.৫.১৬ অবধি শৌচাগার নির্মাণের পরিসংখ্যান	এখনও শৌচাগার নেই এমন পরিবারের সংখ্যা
১.	আলিপুরদুয়ার	৩২১৪৩৩	১৩৯০৯৮	৩২৪৭৮	১০৬৬২০
২.	বাঁকুড়া	৭০৯৪৩১	৪৭৬৪৭৫	৮৩৫৭১	৩৯২৯০৪
৩.	বর্ধমান	১১৯৪৬৮১	৪৩১৬৯০	৩০৬৬১০	১২৫০৮০
৪.	বীরভূম	৭১৭২০২	৪৯৪০০৪	২০৪৩৮১	২৮৯৬২৩
৫.	কোচবিহার	৬৭২১৯৯	৩১৫৬৭০	১৫১৬৪৫	১৬৪০২৫
৬.	দক্ষিণ দিনাজপুর	৩২৮৬১০	২০১৭১২	৯৫১৭১	১০৬৫৪১
৭.	দার্জিলিং	১৪৪৪৯৪	৮৩৭৫১	১৩৮২৯	৬৯৯২২
৮.	হুগলী	৯৩৩২৫১	২৭৮২৭১	২৬২৮১৫	১৫৪৫৬
৯.	হাওড়া	৬৫৩৬০৯	২০৬৪৭৬	৫৭২৮৫	১৪৯১৯১
১০.	জলপাইগুড়ি	৩৭৮১৯৯	১৯৫৫৬৯	৯৭৯৩৬	৯৭৬৩৩
১১.	মালদা	৭৭৩৯২৯	৫০৮৬৬০	১৩৩৬৮২	৩৭৪৯৭৮
১২.	পূর্ব মেদিনীপুর	৯৬৮৭৯৭	২১৯৭৪৭	১৯২৬০৩	২৭১৪৪
১৩.	পশ্চিম মেদিনীপুর	১১৪৬৬২২	৫৬১৮০৫	১০৩৮৫৮	৪৫৭৯৪৭
১৪.	মুর্শিদাবাদ	১৩২০৭৬২	৭৩৬৬১৩	১৫৭৩৯১	৫৭৯২২২
১৫.	নদীয়া	১০১০৫২৩	৩০৯৮৮৬	৩১৪৬৪৫	–৪৭৯৫
১৬.	উত্তর ২৪ পরগণা	৯৮৭৫২৬	১৮১৪৪৯	১৮৩৫৬৪	–২১১৫
১৭.	পুরুলিয়া	৫৪৫৫৪০	৩৮১৬৪৬	৯৫০৭২	২৮৬৫৭৪
১৮.	শিলিগুড়ি	১৪৫১৯৯	৭৪১৫৯	৩১৩৭৪	৪২৭৮৫
১৯.	দক্ষিণ ২৪ পরগণা	১৫৬৫৭২৭	৫৮০৪৬৩	২৮৪১৮৬	২৯৬২৭৭
২০.	উত্তর দিনাজপুর	৬৫০০৭৯	৪০০৬৮৬	১১৯৪২২	২৮১২৬৪
	মোট	**১৫১৬৭৮১৩**	**৬৭৭৮৩০**	**২৯২১৫১৮**	**৩৮৫৬৩১২**

নতুন প্রকল্পে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে প্রকল্প রূপায়ণে যথাযথ নজরদারির বিষয়টিকে। প্রতিটি রূপায়ণ স্তরে এজন্য উপযুক্ত নিয়মিত ব্যবস্থা গড়ে তোলার পাশাপাশি ভালো দৃষ্টান্তমূলক কাজকে পরস্পরের মধ্যে আদান-প্রদান করার পদ্ধতি এবং নিয়মিত শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয়মূলক ভ্রমণ (অন্তঃ ও আন্তঃরাজ্য হতে পারে) ইত্যাদির উপর জোর দেওয়া হয়েছে। এছাড়া বাইরের স্বশাসিত নামী অসরকারি পেশাদার সংস্থাকে দিয়ে প্রকল্প রূপায়ণের নিয়মিত মূল্যায়ন করিয়ে সেই অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সংশোধন করার উদ্যোগ নিতে হবে। সমুদায় পরিচালিত সামাজিক নিরীক্ষা (Social Audit) এই ব্যাপারে বিশেষ ফলপ্রসূ হতে পারে। সর্বোপরি অনুমোদিত সংস্থা দ্বারা প্রতি বছরের বিধিবদ্ধ অডিটের ব্যবস্থা তো থাকছেই।

এবার দেখে নেওয়া যাক ঠিক কোন অবস্থানের উপরে দাঁড়িয়ে এই নতুন প্রকল্পের কাজ শুরু করার প্রস্তাব করা হল। আগেই বলা হয়েছে যে, পূর্ববর্তী সরকারি প্রকল্পগুলিতে রাজ্যে কমবেশি ৮০ লক্ষ পারিবারিক শৌচাগার তৈরি করা হয়েছিল। রাজ্যগুলির স্বাস্থ্যবিধান কর্মসূচির সাফল্যের সাম্প্রতিক অবস্থা পর্যালোচনা করতে কেন্দ্রীয় সরকারের পানীয় জল ও স্বাস্থ্যবিধান মন্ত্রক ২০১২ সালে দেশব্যাপী এক সমীক্ষার কাজে হাত দেয়। এই সমীক্ষার উদ্দেশ্য ছিল এখনও পর্যন্ত শৌচাগার ব্যবহার না করা পরিবারগুলির সংখ্যা নির্ধারণ। এছাড়াও পূর্বের প্রকল্পে অনুদান বা উৎসাহভাতা পাওয়া যে পরিবারের

শৌচাগারগুলি অব্যবহারে বর্তমানে অকেজো অবস্থায় পড়ে আছে সেই সংখ্যার একটা হিসাব নেওয়াও হয়। এই সমীক্ষায় উঠে আসা তথ্য অনুযায়ী ভারতবর্ষের মোট ১৮.১৩ কোটি পরিবারের মধ্যে ১১.১০ কোটি সংখ্যক পরিবার সমীক্ষার সময়ে শৌচাগার ব্যবহার করছিলেন না। পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে এই সংখ্যা ছিল মোট ১ কোটি ৫১ লক্ষ পরিবারের মধ্যে ৬৭ লক্ষ ৭৭ হাজার। বিহার, উত্তরপ্রদেশ, ওড়িশা, রাজস্থান, কর্ণাটক, মহারাষ্ট্র, তামিলনাড়ু এবং পশ্চিমবঙ্গে শৌচাগারহীন পরিবারের সংখ্যা ছিল তুলনামূলকভাবে বেশি। স্বচ্ছ ভারত মিশন প্রকল্পে দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী সকল পরিবার ছাড়াও দারিদ্র্যসীমার ওপরের কিছু চিহ্নিত পরিবারকে উৎসাহভাতা প্রদানের আওতাভুক্ত করা হয়েছে। এগুলি হল— তপশিলি জাতি ও আদিবাসী শ্রেণীভুক্ত পরিবার, ভূমিহীন কৃষক পরিবার, প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র কৃষক পরিবার, শারীরিক অক্ষমতাযুক্ত সদস্য আছে এমন পরিবার এবং মহিলা প্রধান পরিবার। সমীক্ষালব্ধ পরিবারভিত্তিক তথ্য রাজ্যগুলিকে কেন্দ্রীয় স্বচ্ছ ভারত মিশনের (www.mdms.gov.in) নির্দিষ্ট ওয়েব পোর্টালে ইতিমধ্যেই নথিবদ্ধ করতে হয়েছে। ২০১৪ সালের ২ অক্টোবর থেকে প্রকল্পের যে কোনও অগ্রগতির রাজ্য, জেলা, ব্লক, গ্রাম, পঞ্চায়েত ভিত্তিক খতিয়ান যে কোনও সময়ে এই কেন্দ্রীয় ওয়েব পোর্টালের মাধ্যমে যে কোনও স্থান থেকে উপলব্ধ করা যায়।

স্বচ্ছ ভারত মিশন প্রকল্পটির প্রথম দিন থেকেই প্রায় প্রতিটি রাজ্য একে একটি চ্যালেঞ্জ হিসাবে দেখেছে। বংশানুক্রমিক পরম্পরাগত উন্মুক্ত স্থানে শৌচকর্ম বিষয়টির সঙ্গে জড়িত লজ্জা ও সম্মানহানির বিষয়টি তো বটেই, জনস্বাস্থ্য ও অর্থনীতির উপর এর প্রত্যক্ষ কুপ্রভাবের বিষয়টির কথা ভেবেই প্রায় প্রতিটি রাজ্য প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা পূরণে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। এর জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্যস্তরে তৈরি হয়েছে মিশন, যার একমাত্র উদ্দেশ্য হল নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে বাকি থাকা কাজকে শেষ করা।

গঙ্গা তীরবর্তী এলাকার জন্য বিশেষ কর্মসূচি

স্বচ্ছ ভারত মিশন প্রকল্পের শুরু থেকেই সম্পূর্ণ লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে দেশের গঙ্গা (অন্যান্য উল্লেখযোগ্য নদীগুলির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য) তীরবর্তী এলাকাগুলিতে এর রূপায়ণের বিষয়টিতে অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। দেশের পাঁচটি রাজ্যের মোট ৫২-টি জেলার তীরবর্তী ২৫১-টি ব্লকের অন্তর্গত মোট ১৬৫১-টি গ্রাম পঞ্চায়েতে 'নমামি গঙ্গে' নামে এই বিশেষ কর্মসূচি গৃহীত হয়েছে। স্বচ্ছ ভারত মিশনের বৃহত্তর প্রেক্ষিতের সবটুকুই এই বিশেষ কর্মসূচিতে তো রয়েছেই, উপরন্তু গঙ্গায় দূষণ প্রতিরোধ, তীরবর্তী এলাকার সৌন্দর্যায়ন, গঙ্গার ধারে ধারে আদর্শ গ্রাম ও শহর পরিকল্পনার মাধ্যমে স্থানীয় পর্যটন ব্যবস্থার সার্বিক উন্নতির বিষয়গুলিও 'নমামি গঙ্গে' কর্মসূচির আওতায় পড়ে। সফলভাবে এই কর্মসূচির রূপায়ণের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের গঙ্গা উন্নয়ন মন্ত্রক, পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রক, পানীয় জল ও স্বাস্থ্যবিধান মন্ত্রক, পর্যটন মন্ত্রক এবং সংশ্লিষ্ট আরও কয়েকটি মন্ত্রকের সার্বিক সমন্বয় সাধন এবং আর্থিক সাহায্য পাওয়ার লক্ষ্যে ইতিমধ্যে জোরকদমে কাজ শুরু হয়েছে। পারিবারিক শৌচাগারের ১০০ শতাংশ

লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করে গ্রাম পঞ্চায়েত ওডিএফ (ODF) ঘোষণা করার ক্ষেত্রে এই কর্মসূচির গৃহীত সময়সীমা চলতি বছরের ১৫ আগস্ট পর্যন্ত ধার্য হয়েছে। অন্যান্য ক্ষেত্রে লক্ষ্যমাত্রা স্বচ্ছ ভারত মিশনের অনুরূপ।

মিশন নির্মল বাংলা

আমাদের রাজ্য পশ্চিমবঙ্গেও বিশেষ গুরুত্ব দিয়েই এই কাজগুলি শুরু করা হয়েছে। রাজ্যে এই প্রকল্পটির নামকরণ হয়েছে মিশন নির্মল বাংলা। এই কর্মসূচি পরিবেশগত পরিচ্ছন্নতা, ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধি ও উন্মুক্ত স্থানে শৌচের বদভ্যাস থেকে সমাজের মুক্তির মাধ্যমে মানুষের জীবনযাত্রার গুণগত মানে সদর্থক পরিবর্তন আনতে দায়বদ্ধ। আশা করা যায় যে এর ফলে রাজ্যে জল ও মলবাহিত অসুস্থতার প্রকোপ কমবে, কমবে উক্ত কারণগুলিতে স্কুল ও শ্রমদিবস নষ্ট হওয়ার প্রবণতা। গ্রাম ও শহরগুলিতে পরিচ্ছন্নতা বাড়লে সামগ্রিকভাবে পরিবেশেও তার সদর্থক প্রভাব পড়বে।

মিশন মোডে রাজ্যে এই কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য রাজ্য সরকারের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগের অধীনে একটি স্বাস্থ্যবিধান মিশন গঠিত হয়েছে। আগে তৈরি হওয়া বিভাগের অধীনস্থ স্বাস্থ্যবিধান (Sanitation) শাখা ও কমিউনিকেশন অ্যান্ড ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট ইউনিট (CCDU)-কে ইতিমধ্যে এই মিশনের পরিকাঠামোর সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। এছাড়াও রাজ্য সরকার ও সহযোগী সংস্থা ইউনিসেফের সহায়তায় অতিরিক্ত অস্থায়ী পদসৃষ্টিরও উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। জেলা পরিষদগুলির অধীনস্থ জেলা স্বাস্থ্যবিধান শাখাগুলিকে জেলার মিশন ম্যানেজমেন্ট ইউনিটে রূপান্তরিত করে সেগুলিকে সুসংহত করারও পরিকল্পনা রয়েছে। পূর্বের স্বাস্থ্যবিধান কর্মসূচির আওতায় ব্লক ও গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে কোনও নির্দিষ্ট কর্মীসহায়তা না থাকলেও স্বচ্ছ ভারত মিশন প্রকল্পে ব্লক ও গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির রূপায়ণে নির্দিষ্ট দায়িত্ব থাকার কথা স্বীকার করে নিয়ে এই স্তরগুলিতে যথাযথ কর্মী বা সহায়ক নিয়োগের ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করা শুরু হয়েছে।

উৎসাহভাতা প্রদানের ক্ষেত্রেও পশ্চিমবঙ্গ কিছু উদ্ভাবনী চিন্তার পথপ্রদর্শক। কেন্দ্রীয় সরকারি নির্দেশিকার নমনীয়তার আশ্রয় নিয়ে বরাদ্দ ১২০০০ টাকা শৌচাগারপ্রতি উৎসাহ ভাতার মধ্যে ১০০০০ টাকা শৌচাগার নির্মাণের কাজে ব্যয়িত হবে এই সিদ্ধান্ত রাজ্যস্তরে নেওয়া হচ্ছে। এই অর্থের সঙ্গে উপভোক্তারর নিজস্ব অবদান (অতিরিক্ত অর্থ বা তার ব্যক্তিগত শ্রমদান আকারে) যুক্ত হতে পারে। সরকারি উৎসাহভাতার অবশিষ্ট ২০০০ টাকা সমগ্র এলাকাটি (গ্রাম, সংসদ বা গ্রাম পঞ্চায়েত এক্ষেত্রে একক হতে পারে) খোলাস্থানে শৌচের অভ্যাস ত্যাগ করার পর ওই এলাকায় জলের সংস্থান অথবা অন্যান্য স্বাস্থ্যবিধান সম্পর্কিত কাজে সামুদায়িক উৎসাহভাতা হিসাবে ব্যবহার করা যাবে। এই পদ্ধতি অনুসৃত হওয়ার সময়ে দেখতে হবে যে এই সমষ্টি উৎসাহভাতার থেকে সৃষ্ট সুবিধার উপযোগিতা যেন এলাকার বেশিরভাগ পরিবার সমানভাবে লাভ করে এবং যে পরিবারগুলিতে শৌচাগার নির্মাণের জন্য উৎসাহভাতা পাওয়া গেছে, তারা এর সুযোগ থেকে বঞ্চিত না হয়।

সর্বসাধারণের শৌচাগার তৈরির ব্যাপারেও রাজ্য কিছু অভিনব চিন্তা করছে। প্রকল্প অনুমোদিত ২ লক্ষ টাকা প্রয়োজনের তুলনায় কম হওয়ায় রাজ্যে ৩.৫০ লক্ষ টাকায় একটি মডেল এস্টিমেট তৈরি করে অতিরিক্ত ব্যয়ে এই ধরনের শৌচাগার নির্মাণে উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে। অতিরিক্ত অর্থের জন্য রাজ্য সরকারের অধীনে অন্যান্য অনুমোদিত প্রকল্প থেকে ছাড়াও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা বা কর্পোরেট হাউসের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধা ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে। বিভিন্ন বিকল্প কারিগরী যেমন, বায়ো-টয়লেট, প্রি-ফ্যাব্রিকেটেড স্ট্রাকচার বা মড্যুলার টয়লেট ব্যবহারের প্রবণতাও লক্ষ্য করা যাচ্ছে। সর্বসাধারণের শৌচাগার ব্যবহারের ক্ষেত্রে যে বিষয়টিতে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে তাহল এর রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচ্ছন্নতা রক্ষা। হাট-বাজার ইত্যাদি ক্ষেত্রে বাজার কমিটি এই কাজে এগিয়ে আসতে পারে। কোথাও বা স্ব সহায়ক দল নিতে পারে এই দায়িত্ব। ব্যবহারকারীর কাছ থেকে নির্দিষ্ট হারে অর্থসংগ্রহ করে এই মডেলগুলিকে চালু ও স্বনির্ভর করা যেতে পারে। শৌচাগারের দেওয়ালে কর্পোরেট সংস্থার বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে হতে পারে অর্থাগম, যার থেকে নিযুক্ত কর্মীদের খরচ চালানো সম্ভব হয়। প্রথম দিন থেকে শৌচাগারে পর্যাপ্ত জলের ব্যবস্থা অবশ্যই রাখতে হবে।

বর্জ্য ব্যবস্থাপনার বিষয়টি এখনও এই রাজ্যে সমগ্র দেশের মতই পরীক্ষা-নিরীক্ষার স্তরে রয়েছে। এই ব্যবস্থাপনা দুইভাবে হওয়া

সম্ভব। একটি পরিবারভিত্তিক ও অন্যটি সামুদায়িক। পরিবারভিত্তিক কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বাড়িতে সার গর্ত তৈরি করে করা যেতে পারে। পচনশীল বর্জ্য থেকে এভাবে সার তৈরি করে তা পরিবারের প্রয়োজনে ব্যবহৃত হতে পারে বা তা থেকে অর্থাগম হতে পারে। অপচনশীল বর্জ্য সাময়িক সংরক্ষণ করে তা বাজারে বিক্রয় করা যেতে পারে। তরল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পরিবারস্তরে হতে পারে নলকূপের চাতাল বাঁধানো, পাকা নালী এবং সোকপিট বা শোষক গর্ত তৈরির দ্বারা। এধরনের কাজে গ্রামাঞ্চলে ১০০ দিনের কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পের অর্থকে এই রাজ্যে অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে ব্যবহার করা হয়েছে। সামুদায়িক কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা মূলত করা হচ্ছে বাড়ি থেকে বর্জ্য সংগ্রহ করে তা বাছাই করে পচনশীল জৈব থেকে কেঁচো সার তৈরির ইউনিট স্থাপন করে। যদিও নদীয়া, হাওড়া, পূর্ব মেদিনীপুর ও বর্ধমান জেলায় কিছু কিছু সামুদায়িক প্রকল্প চালু হয়েছে, এ বিষয়ে উন্নত প্রযুক্তি ও প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে আমাদের সুনির্দিষ্ট কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। ইতিমধ্যেই বিশ্বব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় চলা 'গ্রাম পঞ্চায়েত সশক্তিকরণ প্রকল্প' (ISGPP)-এর আওতায় থাকা ২০০-টি গ্রাম পঞ্চায়েত উপরিউক্ত সামুদায়িক প্রকল্প চালু করার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ মিশন নির্মল বাংলা থেকে বরাদ্দ করা হয়েছে। এই যৌথ উদ্যোগে প্রচার প্রসার ও প্রশিক্ষণের বিষয়টিতে ISGPP প্রকল্পের আর্থিক সহায়তা যুক্ত করে ভাল ফল পাওয়া যাচ্ছে। আগামী দিনে রাজ্যের লক্ষ্য প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় এরকম ইউনিট তৈরি করে এলাকার সার্বিক পরিচ্ছন্নতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রকল্পগুলির সঙ্গে যুক্ত মানুষদের আর্থিক স্বনির্ভরতার বিষয়টিকে নিশ্চিত করা। এই কাজে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ও স্ব সহায়ক দলগুলিকে ব্যবহার করার ব্যাপারটিকেও গুরুত্ব দিয়ে ভাবা হচ্ছে।

গ্রামীণ স্বাস্থ্যবিধান প্রকল্পের সাফল্যের বিষয়টি অনেকাংশে উপযুক্ত প্রচার-প্রসার কৌশলের উপর নির্ভর করে। রাজ্যস্তরে এই কর্মকাণ্ডের জন্য প্রয়োজনীয় প্রচার-প্রসার কৌশলের যে পদ্ধতি অনুসৃত হবে তার নীতি নির্ধারণ করে SHACS (Sanitation, Hygiene Advocacy Communication Strategy) আগেই গৃহীত হয়েছে। জেলাগুলিতেও তাদের প্রয়োজনভিত্তিক প্রচার কৌশল ঠিক করা হয়েছে। এই প্রচার কৌশল ত্রিমুখী হতে হবে—ব্যক্তি যোগাযোগের মাধ্যমে (IPC), সমষ্টিভিত্তিক এবং গণমাধ্যমকে ব্যবহার করে। বাড়ি বাড়ি বা গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ভিত্তিক প্রচারের জন্য IPC অবলম্বন করা ছাড়াও মাইকের মাধ্যমে প্রচার, হোর্ডিং, দেওয়াল লিখন, পথনাটিকা, লোকসংস্কৃতির ব্যবহার, গণমাধ্যমে প্রচার ইত্যাদিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। যে এলাকাগুলি প্রকল্পে অগ্রগতির বিচারে বেশি পিছিয়ে রয়েছে সেখানে সম্প্রদায়কে দায়িত্ব নিতে এগিয়ে আসার জন্য triggering কৌশলে প্রশিক্ষিত করার উদ্যোগ নেওয়া শুরু হয়েছে। এই কাজে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরের খ্যাতিসম্পন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাদের বিশ্বব্যাংক ও ইউনিসেফ-এর সহায়তায় কাজে লাগানো শুরু হয়েছে। এই সহযোগীদের সহায়তায় বিবিধ প্রচার-প্রসার সামগ্রী তৈরি করে তার প্রিন্ট, অডিওভিস্যুয়াল ও বৈদ্যুতিন মাধ্যমে ব্যবহার করা চলছে এবং উল্লেখযোগ্য সাফল্য পাওয়া গেছে। বৃহত্তর স্তরে ইন্টারনেট ব্যবহারে অভ্যস্ত মানুষের কাছে পৌঁছনো এবং রাজ্যেই অগ্রগতি সকলের কাছে পৌঁছে দিতে ডিজিটাল মিডিয়ার ব্যবহারে সম্প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। মিশন নির্মল বাংলার নির্দিষ্ট ওয়েবসাইটটিকে (www.missionnirmalbangla.in) আরও আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য কাজ শুরু হয়েছে। মিশনের Facebook পেজ-এ রাজ্য ও জেলাস্তরে প্রকল্প রূপায়ণের খুঁটিনাটি তুলে ধরা হচ্ছে। বিভিন্ন Social media, যেমন—Whatsapp, twitter, linked in ইত্যাদির ব্যাপক ব্যবহার করেও প্রকল্পের জনপ্রিয়তা ও এর ব্যাপারে সচেতনতা বৃদ্ধির চেষ্টা চলছে।

প্রকল্পের বিভিন্ন খুঁটিনাটি বিষয়ে এবং রূপায়ণের প্রতিটি স্তরে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এ রাজ্যে বহুদিন আগে থেকেই রাজ্য পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন সংস্থা, কল্যাণীর স্বাস্থ্যবিধান শাখার তত্ত্বধানে স্বাস্থ্যবিধান কর্মসূচির বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছিল। এই শাখাটি বর্তমানে মিশনের অধীনে বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা রচনা করে কেন্দ্রীয় ও জেলাস্তরে বিবিধ প্রশিক্ষণের কাজটি সাফল্যের সঙ্গে চালিয়ে যাচ্ছে Community triggering-এ প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য বাইরের অভিজ্ঞ সংস্থার সাহায্য নেওয়া হচ্ছে। যে বিষয়গুলিতে প্রশিক্ষণের উপর জোর দেওয়া হচ্ছে সেগুলি হল—triggering, কারিগরি প্রযুক্তি, প্রচার-প্রসার, Social Media-র ব্যবহার ইত্যাদি।

রাজ্যের এই যে কর্মকাণ্ড চলছে তার ভিত্তিতে পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান অবস্থায় বিষয়ে একটু চোখ বোলানো যাক (সারণি-'খ')। একথা আজ বলার অবকাশ রাখে না যে, রাজ্য সরকারের রূপায়িত প্রকল্পগুলির মধ্যে মিশন নির্মল বাংলা গুরুত্বের বিচারে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সরকারি প্রকল্পগুলির মধ্যে একটি।

এই কর্মসূচির গুরুত্ব অবধান করে ৩০ এপ্রিল তারিখটিকে ইতিমধ্যেই নির্মল বাংলা দিবস হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। স্বচ্ছ ভারত মিশন চালু হওয়ার পর থেকে গ্রামীণ স্বাস্থ্যবিধান প্রকল্পে দেশের মধ্যে প্রকল্পের অগ্রগতির বিচারে এগিয়ে থাকা রাজ্যগুলির মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ অন্যতম। এই বিচারে ২০১৪-১৫ আর্থিক বর্ষে পশ্চিমবঙ্গ সর্বাধিক সাফল্যের মুখ দেখেছে। ২০১৫-১৬ সালেও রাজস্থানের পরেই পশ্চিমবঙ্গ উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি করে দেখিয়েছে। রাজ্যের জেলাগুলিতেও মিশন নির্মল বাংলার কাজ জোরকদমে চলছে। নদীয়া জেলা ইতিমধ্যে রাজ্যের প্রথম নির্মল জেলা হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছে। উল্লেখযোগ্য কাজ করে সাফল্য পেয়েছে হুগলী, উত্তর ২৪ পরগণা, পূর্ব মেদিনীপুর, বর্ধমান জেলাগুলিও। কিছু কিছু জেলার অভিনব উদ্যোগ জাতীয় স্তরে প্রশংসিত হয়েছে। যেমন,

নদীয়া জেলা—নির্মল ঘোষিত হওয়ার পর থেকে এই সাফল্যকে ধরে রাখতে এই জেলা সর্বশক্তি নিয়োগ করে। সুনির্দিষ্ট প্রচার কৌশলের দ্বারা রূপায়িত এই জেলার ওডিএফপ্লাস (ODF+) উদ্যোগ নিঃসন্দেহ অভিনব ও উদাহরণ রচনার দাবি রাখে।

মালদা—ইউনিসেফ-এর সহায়তায় CATS প্রক্রিয়ায় Community triggering কৌশলে এই জেলা অভিনবত্বের পরিচয় দিয়েছে। উৎসাহভাতা প্রদানের বিষয়ে এই জেলা কিছু নিজস্ব চিন্তা-ভাবনা নিয়েছে। ODF এলাকা সৃষ্টির পরে সমষ্টিগতভাবে উৎসাহভাতা ব্যবহারের জন্য এই জেলা উদ্যোগী হয়েছে। প্রতিটি এলাকা ওডিএফ ঘোষিত হওয়ার পরে এই সাফল্যের উদ্‌যাপন ও জনগণের মধ্যে এই উদ্যোগকে ছড়িয়ে দিতে সাড়ম্বর 'নির্মল উৎসব' পালনে মালদা জেলা রাজ্যে পথপ্রদর্শক।

কোচবিহার—এখানেও সমষ্টির উদ্যোগ উল্লেখের দাবি রাখে। Triggering পদ্ধতি এই জেলাও প্রয়োগ করেছে সফলতার সঙ্গে।

উত্তর ২৪ পরগণা—নির্মল ঘোষিত হওয়ার খুব কাছাকাছি দাঁড়িয়ে এই জেলা অভিনব প্রচার-প্রসার কৌশলনীতি অবলম্বনের দ্বারা জনগণকে এই উদ্যোগের সঙ্গে সর্বতোভাবে যুক্ত করার জন্য বিবিধ পন্থা নিয়েছে। সম্প্রতি এই জেলায় আয়োজিত Handwashing day বিপুলসংখ্যক মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণকে প্রত্যক্ষ করেছে।

দক্ষিণ ২৪ পরগণা—বিশাল লক্ষ্যমাত্রা থাকা সত্ত্বেও এই জেলা 'আমার শৌচাগার' নামে বিশেষ পরিকল্পনা তৈরি করে এই প্রকল্পের কাজে খুব উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি লাভ করেছে। সাম্প্রতিক গঙ্গাসাগর মেলা আয়োজনের সময় পরিবেশবান্ধব বিবিধ পদক্ষেপ ও সর্বধর্ম সমন্বয়ে সবুজ ও পরিচ্ছন্ন গঙ্গাসাগর মেলার সফল আয়োজন সকলের প্রশংসা কুড়িয়েছে।

হুগলী—১০০ দিনের কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পের সঙ্গে প্রয়োজনীয় মেলবন্ধন ঘটিয়ে হুগলী জেলাও নির্মল ঘোষিত হওয়ার মুখোমুখি।

মুর্শিদাবাদ—জেলার 'নীল শৌচাগার' একটি বিশেষ মাত্রা যোগ করেছে এই প্রকল্পে। জনগণের অবদান অর্থ (Beneficiary contribution)-কে এই জেলায় প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি করা হয়েছে এবং উন্নত মানের শৌচাগার প্রাপ্তির বিনিময়ে এই অতিরিক্ত অর্থ অকুণ্ঠভাবে তারা দিতে সম্মত হয়েছে।

পূর্ব মেদিনীপুর—অতীতে গ্রামীণ স্বাস্থ্যবিধান কর্মসূচিতে উল্লেখযোগ্য সাফল্য পাওয়া এই জেলাটিও নির্মল ঘোষিত হওয়ার খুব কাছাকাছি দাঁড়িয়ে। পূর্বের কিছু বিচ্যুতি কাটিয়ে উঠে নিবিড় প্রচার কৌশল অবলম্বনের দ্বারা এই জেলা অবশিষ্ট লক্ষ্যপূরণে সফল হওয়ার চেষ্টায় রত। নরেন্দ্রপুরের রামকৃষ্ণ মিশন লোক শিক্ষা পরিষদ একাজে তাদের সহায়ক।

এই রাজ্যের প্রতিটি রূপায়ণস্তর গভীরভাবে প্রত্যয়ী যে পশ্চিমবঙ্গে মিশন নির্মল বাংলার হাত ধরে এক নতুন দিশায় উত্তরণ ঘটানো সম্ভব হবে। ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যে এই কর্মকাণ্ডে সবিশেষ উপকৃত হবে তা বলার জন্য সমাজবিজ্ঞানী হওয়ার প্রয়োজন নেই। এটাও সত্য যে, এই কাজে সফল হওয়ার জন্য প্রাথমিক প্রয়োজনীয়তা যার সর্বাধিক, সেই রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক সদিচ্ছা এক্ষেত্রে পুরোমাত্রায় বর্তমান, তবুও এই সাফল্যের শেষ মাইলফলক অর্জন করার পর দীর্ঘস্থায়ীভাবে একে ধরে রাখতে হলে ODF Sustainability-র দিকটিকে উপেক্ষা করলে চলবে না। অভ্যাস পরিবর্তনের যে উদ্যোগ, তাতে যুক্ত হতে হবে শিশু থেকে বৃদ্ধ সকলকেই। সর্বোপরি এই প্রকল্পে নির্মিত শৌচাগার-এর কারিগরি দিকগুলি সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত ও প্রশিক্ষিত হতে হবে। এই বিজ্ঞানসম্মত স্বল্পমূল্যের সুবিধাগুলিতে যে বিশেষ প্রযুক্তি ব্যবহাত হয়, যেমন—কূপের গভীরতা, কূপের মধ্যে দূরত্ব, কূপের রিং-এর ফোকর, প্যানের ঢাল, ওয়াটার সীল বা জলবন্ধনীর উপস্থিতি ইত্যাদি বিষয়ে নির্মাণকর্মী ও উপভোক্তা উভয়েরই যথাযথ ধারণা থাকা প্রয়োজন। এই বিষয়গুলি মাথায় রেখে পরিকল্পনা গৃহীত হলে মিশন নির্মল বাংলার হাত ধরে পশ্চিমবঙ্গ একদিন নিঃসন্দেহে ভারতবর্ষে একটি দৃষ্টান্ত স্থাপনে সক্ষম হবে একথা বলাই যায়।❑

(**লেখক পরিচিতি :** *লেখক রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের ডেপুটি সেক্রেটারি তথা 'মিশন নির্মল বাংলা'-র দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক।* ইমেল : sonaldattaroy@gmail.com)

যোগ : রোগ প্রতিরোধ এবং সুস্বাস্থ্য ও জীবনশৈলীর গুণমান বাড়াতে এক কার্যকর পন্থা

বর্তমানে যোগ অত্যন্ত জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। দেশ-বিদেশে অসংখ্য প্রতিষ্ঠান এবং প্রশিক্ষক যোগ প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় হঠ্ যোগ-এর অনুসরণে ব্যায়াম বা আসন, প্রাণায়াম, ধ্যান ইত্যাদির। বেশির ভাগ মানুষও যোগ বলতে বোঝেন এগুলির অনুশীলন। কিন্তু এটি যোগের এক ক্ষুদ্র দিক মাত্র। 'যোগ'-এর ব্যাপ্তি, তাৎপর্য, সম্ভাবনা এই ব্রহ্মাণ্ডের মতোই অসীম। 'যোগ'-এর সঠিক অনুশীলন আমাদের আধ্যাত্মিকতার সেই স্তরে পৌঁছে দিতে সক্ষম, যার চূড়ান্ত পরিণতি মোক্ষপ্রাপ্তি। 'যোগ'-এর আর একটি ব্যবহারিক দিক হল আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিকল্প পদ্ধতি হিসাবে এর ব্যবহার। বিশেষ করে আধুনিক জীবনশৈলীর প্রেক্ষিতে অর্জিত মানসিক চাপ-অবসাদ-উদ্বেগ-উত্তেজনার মতো সমস্যা ও তার পরিপ্রেক্ষিতে ক্রমশ বিবিধ জটিল দৈহিক সমস্যা তথা রোগব্যাধির নিরাময়ে যোগ অত্যন্ত কার্যকর পদ্ধতি হিসাবে ইতোমধ্যেই প্রমাণিত ও বিশ্বজুড়ে সমাদৃত। বর্তমান নিবন্ধে এই ব্যবহারিক উপকারিতা-সহ 'যোগ'-এর উৎপত্তি, প্রকরণ, আধ্যাত্মিক দিক এবং বর্তমান সময়পর্বের প্রেক্ষিতে যোগের প্রাসঙ্গিকতা; সর্বোপরি সর্বাত্মক জীবনচর্যায় যোগের অসামান্য অনুকূল প্রভাব নিয়ে বর্তমান নিবন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন—**ড. এইচ. আর. নাগেন্দ্র**

'যোগ' শব্দটি এসেছে সংস্কৃত ভাষা থেকে, সংস্কৃত 'যুজ' ধাতু থেকে এর উৎপত্তি। যার অর্থ 'ঐক্যবদ্ধ করা' বা 'সংযুক্ত করা' এবং 'নিয়ন্ত্রণ করা' এবং কারও মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করা। প্রায় তিন হাজারেরও বেশি প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী 'যোগ' বর্তমানে স্বাস্থ্যের (সুরক্ষার) প্রতি এক সামগ্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে পশ্চিমী দুনিয়ায় স্বীকৃতি পাচ্ছে। National Institute of Health 'যোগ'-কে পরিপূরক এবং বিকল্প চিকিৎসা পদ্ধতি হিসাবে শ্রেণিবদ্ধ করেছে। নিয়মিত যোগ অনুশীলনের মাধ্যমে (শারীরিক) সক্ষমতা বৃদ্ধি পায়, বাড়ে সহিষ্ণুতা এবং আত্মনিয়ন্ত্রণ, ফলস্বরূপ, সদর্থক পরিবর্তন আসে জীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি তথা স্বয়ং-সচেতনার পরিপ্রেক্ষিতে। (আত্ম) শক্তির এই (বিকশিত) উপলব্ধি পরিপূর্ণ শান্তি ও সুখময় জীবন যাপনে উদ্বুদ্ধ করে। যোগভ্যাস ব্যক্তি বিশেষকে এমন এক শারীরিক (ক্ষমতার) স্তরে উন্নীত করে যে মানসিক চাপ প্রতিহত করার মতো আত্মশক্তির তার মধ্যেই উন্মেষ ঘটে। এভাবেই শরীর ও মনের সংযোগ সাধনের দ্বারা উভয়ের মধ্যে ভারসাম্য গড়ে তোলার স্থিতিতে পৌঁছানো সম্ভব।

পশ্চিমী দুনিয়ায় যোগ অনুশীলনের ক্ষেত্রে মূলত হঠ্ যোগ পদ্ধতির অনুসরণ করা হয়। অর্থাৎ, শারীরিক ভঙ্গিমা তথা আসন, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণ অভ্যাস এবং ধ্যান বা একাগ্রতার অনুশীলন। বিভিন্ন ধরনের শারীরিক ভঙ্গিমায় ব্যায়াম বা আসনের অনুশীলনের দ্বারা হঠ্ যোগ মূলত শরীরকে সুস্থ সবল করে তোলে। হঠ্ যোগের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি জোর দেয় শ্বাস গ্রহণের সময়কে দীর্ঘায়িত করা তথা অনায়াসে শ্বাসগ্রহণ ও ত্যাগ করার প্রক্রিয়া অনুশীলনের উপর। বিবিধ শারীরিক ভঙ্গিমায় আসন অনুশীলনকালীন শরীরের শক্তি প্রণালীগুলির (energy channels) অবরোধ মুক্তি ঘটে; ফলত শরীরের শক্তি ব্যবস্থায় (energy system) আরও ভারসাম্য আসে, যোগ কেবলমাত্র stress বা মানসিক চাপ কমানোর পদ্ধতি নয়,এর ব্যাপ্তি আরও বিশাল। কিন্তু মানসিক চাপ, যা শরীর-স্বাস্থ্যের উপর বিভিন্নভাবে প্রতিকূল প্রভাব ফেলে, তা প্রতিহত করতে যোগ শুধু কার্যকরীই নয়; অদ্যাবধি আবিষ্কৃত পদ্ধতিগুলির মধ্যে নিঃসন্দেহে সামগ্রিকভাবে সুফলদায়ী পন্থা। মানসিক চাপকে সাধারণভাবে আমরা (মনের) এমন একটা অবস্থা হিসাবে দেখতে অভ্যস্ত, যা বিবিধ 'মানসিক চাপজনিত' বা 'Stress-related' হিসাবে চিহ্নিত রোগব্যাধির ক্ষেত্রে অনুঘটকের কাজ করে। যেমন—প্রচণ্ড মাথাব্যথা (migraine), পেটের ক্ষত সৃষ্টি (Ulcers) এবং অন্ত্রের অস্বস্তিকরভাব (irritable bowel syndrome)। কিন্তু এর ফল আরও মারাত্মক হতে পারে। মানসিক চাপ হৃদরোগ, মধুমেহ (diabetes) এবং 'osteoponosis'-এর মতো প্রাণঘাতী অস্থিরোগের কারণ হয়ে উঠতে পারে।

যোগ দর্শন এবং অনুশীলন প্রথম ব্যাখ্যা করেন পতঞ্জলি, 'যোগ সূত্র' নামক ধ্রুপদী পাঠ্যে। এটি যোগ সম্পর্কিত সর্বাধিক প্রামাণ্য পাঠ্য হিসাবে ব্যাপকভাবে সমাদৃত। বর্তমানে বহু মানুষ যোগকে কেবলমাত্র 'আসন' বা যোগের শারীরিক অনুশীলন হিসাবেই চিহ্নিত

করে থাকেন। কিন্তু, আসন শুধু ব্যক্তিবিশেষের শারীরিক সুস্থতা বাড়ানোর বিবিধ উপায়ের অন্যতম। পতঞ্জলি সচেতনা এবং আত্মিক বিকাশের আট দফা পন্থার রূপরেখা প্রস্তুত করেন। একে বলা হয় 'অষ্টাঙ্গ যোগ'। এর আক্ষরিক অর্থ আটটি অঙ্গ। এই আটটি অঙ্গ একত্রিত হয়ে একটি অর্থবহ এবং উদ্দেশ্যসাধক জীবনযাপনের জন্য নৈতিক মূলতত্ত্ব প্রস্তুত করেছে; নৈতিক আচার-আচরণ এবং আত্ম-অনুশাসন-এর ব্যবস্থাপত্র হিসাবে যার নিদান দেওয়া হয়ে আসছে। পতঞ্জলির অষ্টাঙ্গ-এর উপর ভিত্তি করে যোগ-এর বিভিন্ন শাখার বিকাশ ঘটেছে। বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধ ও চিকিৎসার জন্য যোগের এইসব শাখার প্রত্যেকের নিজস্ব পন্থাপদ্ধতি রয়েছে।

বর্তমানে যোগ অত্যন্ত জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। অসংখ্য প্রতিষ্ঠান যোগশিক্ষা/ প্রশিক্ষণ দেওয়া শুরু করেছে। যোগ থেরাপির বৈজ্ঞানিক মডেলের বিকাশ ঘটিয়ে যোগের মানক-নির্ধারণের (standardising)-এর প্রতি খুব বেশি মনোযোগ দেওয়া হচ্ছে না। যোগ থেরাপির মডেল কী হবে? সুতরাং, এই থেরাপির বৈজ্ঞানিক নেচার বা চরিত্রটি প্রতিষ্ঠা করা জরুরি। যোগের বিভিন্ন তাত্ত্বিক এবং ব্যবহারিক দিকে পর্যাপ্ত গবেষণার মাধ্যমে তা নির্ধারণ করতে হবে।

আমাদের শরীর (body) শুধুমাত্র দৃশ্যমান দৈহিক আকার নিয়ে গঠিত নয়। আরও চারটি অদৃশ্য অতিসূক্ষ্ম এবং নৈমিত্তিক স্তরের সমাহার।

আমাদের প্রত্যেকের পাঁচটি দেহ (bodies) বা কোষ (KOSHAS) আছে।

1) অন্যময় কোষ - পৌষ্টিক দেহ - দৃশ্যমান দেহ

2) প্রাণময় কোষ - শক্তিদেহ - বায়োপ্লাজমিক স্তর

3) মনোময় কোষ - মানসিক দেহ - অ্যাস্ট্রাল স্তর

4) বিজ্ঞানময় কোষ - বৌদ্ধিক দেহ - ওয়াইজডম স্তর

5) আনন্দময় কোষ - আনন্দ দেহ - ব্লিস স্তর

পবনমুক্তাসন

কোষ (Kosha)-এর মধ্যে সঞ্চিত থাকে আমাদের কর্ম (KARMAS) এবং সংস্কার (SAMSKARAS), অর্থাৎ স্মৃতি ও অভিজ্ঞতা। তারা প্রাচীর তৈরি করে ব্যক্তি আত্মা (individual soul) এবং সর্বজনীন স্বয়ং (Universal self)-এর মধ্যে। অতএব বিমুক্তি (Liberation)—মোক্ষ (Moksha)-এর অর্থ, আত্মাকে কোষ-এর সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্ত করা। আমরা যদি কোন কিছুর সঙ্গে একাত্ম হয়ে উঠতে চাই, তবে যার সঙ্গে আমরা যুক্ত হতে ইচ্ছুক, তার সেই একই গুণাবলীর বিকাশ ঘটাতে হবে নিজের মধ্যে। যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা কোষ থেকে নিজেকে বিমুক্ত করছি, আমরা ব্যক্তিগত অহম্-এর ডোরে বাধা পড়ে থাকছি এবং নিজেকে ক্ষুদ্র 'আমি' হিসাবে চিহ্নিত করে চলেছি। অসীম-এর মধ্যে একজন হয়ে উঠতে পারছি না। অন্যদিকে, তা সত্ত্বেও পাঁচটি কোষ-এর প্রত্যেকটিই এই ধরাধামে আমাদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য অপরিহার্য। এগুলি ছাড়া আমরা এখানে জীবনধারণ করতে পারতাম না। এই 'কোষ' এর গণ্ডি অতিক্রম করা এবং তার থেকে পৃথক হওয়া প্রাথমিক ভাবে চিত্তের বা মনোজগতের পরিশুদ্ধির এবং বিকাশের এক বিস্তৃততর প্রক্রিয়া। যখন কণামাত্র অশুদ্ধি অবশিষ্ট থাকবে না, থাকবে না কোনও প্রচ্ছায়া (shadows), সেই মুহূর্তে আমাদের জীবনের অন্তিম লগ্নে 'Astral body' বিলীন হয়ে যাবে; আমাদের আত্মার স্ফুলিঙ্গ অসীম-এর সঙ্গে মিশে যাবে।

অন্যময় কোষ (ANNAMAYA KOSHA) হল পার্থিব শরীর। আমরা যে খাদ্যগ্রহণ করি তার দ্বারা, তথা আমাদের পারিপার্শ্বিক পরিবেশ এবং সমাজ দ্বারা এই শরীর প্রভাবিত হয়। মানুষজনের মধ্যে পারস্পরিক ইতিবাচক এবং কল্যাণকর ভাব বিনিময় তথা স্বাস্থ্যকর, স্বাত্ত্বিক খাদ্যাভ্যাস আমাদের দৈহিক এবং মানসিক বিকাশের জন্য অত্যন্ত জরুরি। তাই যোগ প্রশিক্ষণের সময় এই দিকগুলির উপর জোর দেওয়া হয়। মদ, মাংস, মাদকের মতো দ্রব্যাদি সেবন আমাদের জীবনী শক্তিকে দুর্বল করে, নেতিবাচক অনুকম্পনে ভরে ওঠে শরীর। স্বাস্থ্যকর, দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি এবং নিরামিষ আহার আমাদের শরীরকে সবচেয়ে অনুকূল পন্থায় পুষ্টি যোগায়।

প্রাণময় কোষ PRĀNAMAYA KOSHA) হল মহাজাগতিক শক্তির (cosmic energy) অতিসূক্ষ্ম আবরণ, যাকে বলা হয় প্রাণ। যা পার্থিব শরীরের মধ্যে প্রবেশ করে তাকে ঘিরে থাকে। এটি আমাদের মধ্যে এক জ্যোতির্বলয় (AURA) গঠন করে; যে প্রভা নিঃসরিত হয় আমাদের থেকে। প্রাণ (PRĀNA) হল এমন এক

অতিসুক্ষ্ম পুষ্টি (Nourishment) জীবনে যা খাদ্য ও পানীয়ের মতোই অতি জরুরি। প্রতিবার শ্বাস নেওয়ার সময় আমরা কেবল অক্সিজেনই গ্রহণ করি না, অঙ্গীভূত করি 'প্রাণ'-ও। আমাদের 'প্রাণ'-এর গুণমান কেবল বাহ্যিক প্রভাবক দ্বারাই নয়, আমাদের নিজস্ব চিন্তাভাবনা এবং আবেগ দ্বারাও চূড়ান্ত ভাবে প্রভাবিত হয় এবং অন্যান্য 'কোষ'-এর উপর প্রভাব ফেলে।

মনোময় কোষ (MANOMAYA KOSHA) হল মানসিক শক্তি আবরণ, যা প্রাণময় কোষ-এর থেকেও ব্যাপকতর ও শক্তিশালী। কালক্ষেপ না করেই মন এবং চিন্তা যেকোনও জায়গায় পৌঁছে যেতে পারে। একারণেই 'চিন্তা'কে নিয়ন্ত্রণ করা অত্যন্ত কঠিন কাজ। চিন্তা হল মনের অনিয়ন্ত্রিত বেগের দ্রুত গতিশীল প্রকরণ, যা ভাবাবেগকে তোলপাড় করে এমন স্তরে পৌঁছে দেয় যার চূড়ান্ত পরিণতি মানসিক চাপ (stress)। একে বলা হয় আধি (Adhi) যা অন্যময় কোষ-এ পৌঁছে প্রাণময় কোষ-এর ভারসাম্যে বিঘ্ন ঘটানোর মাধ্যমে ব্যাধি (রোগ)-তে পরিণত হয়। শুধুমাত্র মনের উপর নিয়ন্ত্রণ কায়েম করার মাধ্যমে আমরা এই ঘটন ঘটার হতে থেকে পরিত্রাণ পেতে তথা, মানসিক চাপ ও রোগব্যাধি বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারি। নিজের মনের উপর প্রভূত্ব করার সেরা উপায় হল ভালো/শুভ চিন্তার লালন। সেজন্য মনকে সুস্থির বা প্রশান্ত রাখা শিখতে হবে, নিঃশচুপ এবং শান্তিময় হতে হবে। যম (YAMA) এবং নিয়ম (NIYAMA)-এর সূত্রগুলি অনুসরণের দ্বারা ধীশক্তি, দান, প্রার্থনা এবং মন্ত্রজপ আমাদের কর্মকে বিশুদ্ধ করে।

বিজ্ঞানময় কোষ (VIGYANA-MAYA KOSHA) হল বৌদ্ধিক শরীর। একে আবার ইতিবাচক বা নেতিবাচক অভিমুখ দেওয়া যেতে পারে। নির্ভর করে যে সমাজে আমরা বসবাস করছি তার উপর। একই সাথে, আমাদের পারিপার্শ্বিক পরিবেশের থেকে আমরা কী সংবেদজ ধারণা/বিশ্বাস অঙ্গীভূত করছি তার উপর। জীবৎকালে অর্জিত অভিজ্ঞতা, লালন-পালন ও শিক্ষা-দীক্ষা ইত্যাদির দ্বারা গঠিত তথা এসবেরই সমাহার হল বৌদ্ধিক শরীর। বুদ্ধিবৃত্তি যে আমাদের সবসময় সেরা পরামর্শদাতা হিসাবে কাজ করে তেমনটি নয়। কখনও কখনও তা সত্যকে অস্বীকার করে চোখকান বুজে থাকে; যা আমরা আকাঙ্খা করি সেই সেই দিশায় হেঁটে স্বার্থান্বেষীর মতো বিবেচনায় ব্রতী হয়। বুদ্ধিবৃত্তি বা মেধা এক অত্যন্ত কার্যকর হাতিয়ার হতে পারে, আবার তা হয়ে দাঁড়াতে পারে চূড়ান্ত প্রতিবন্ধকতা। একারণেই আমাদের সর্বদা বুদ্ধি (BUDDHI) বা কার্যকারণ এবং বিবেক (VIVEKA) বা সঠিক বিচার দুই ব্যবহার করতে হবে।

আনন্দময় কোষ (ANANDAMAYA KOSHA) হল পরমানন্দ শরীর (Body of Bliss)। এ হল সেই নৈমিত্তিক স্তর যেখান থেকে অন্য চার প্রকার কোষ চূড়ান্ত সংস্কার এবং বাসনা নির্গত করে। এর পরিশুদ্ধি কঠিন নয়। তার কারণ, আমাদের নিজেদের মধ্যেই রয়েছে এক শক্তিশালী উজ্জীবক এবং এক চূড়ান্ত ক্ষমতা—উচ্চাকাঙ্খা (Aspiration)। উচ্চাকাঙ্খা নিজের আশা-আকাঙ্খার পূর্ণতা প্রাপ্তির জন্য তথা সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য।

পরমানন্দের বিবিধ স্তর বর্তমান, যাকে বেষ্টন করে থাকে শাশ্বত অসীম শ্রেষ্ঠতম আনন্দ। এর মধ্যে প্রথম স্তরটি বিভিন্ন অবস্থার উপর নির্ভরশীল। যেমন—আমাদের আশা-আকাঙ্খার পরিপূর্ণতা প্রাপ্তি তথা অন্যান্য অনুকূল পরিস্থিতি। বিপরীতে, পরমানন্দের বাকি স্তরসমূহ শর্তসাপেক্ষ নয় এবং বাহ্যিক পরিস্থিতির উপর আদৌ নির্ভর করে না। স্থায়ী সন্তোষ এবং মহানন্দ (MAHĀĀ NANDA) বা অনন্ত পরমানন্দের (infinite Bliss) প্রকাশ আমাদের মধ্যে ঘটে তখনই, যখন আমরা নিজের সঙ্গে মিলিত হই। বাকি সব আনন্দ সসীম এবং অনিত্য। কেবলমাত্র জ্ঞান (JNĀNA) বা প্রজ্ঞার মাধ্যমেই আমরা নিজেদেরকে আনন্দময় কোষ থেকে বিমুক্ত করতে সক্ষম। ভক্তি (BHAKTI) বা ঈশ্বরের প্রতি সম্পূর্ণ সমর্পণ আমাদের লক্ষ্যের কাছে পৌঁছে দেয়। কিন্তু চূড়ান্ত ধাপে উত্তরণ সম্ভব কেবল মাত্র সত্য জ্ঞান (Knowledge of the truth)-এর মাধ্যমে। তারপরই অন্তিম পরিণামে আমরা মোক্ষ (MOKSHA) লাভ করতে সক্ষম।

দেহ-মনের চিকিৎসার এক অন্যতম প্রকরণ হিসাবে যোগকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। ব্যক্তি বিশেষের দৈহিক, মানসিক এবং আধ্যাত্মিক ভাগগুলির মধ্যে সমন্বয় সাধনের দ্বারা যোগ শরীরকে সুস্থ সবল করে তোলে; বিশেষভাবে কার্যকর মানসিক চাপ জনিত ব্যাধিকে প্রতিহত করতে। অতীত নজির থেকে দেখা গেছে হৃদরোগ, কর্কটরোগ, হাট অ্যাটাক ইত্যাদি রোগব্যাধি তথা আরও বহু ক্রনিক শারীরিক অসুবিধা/রোগবালাই-এর অন্যতম প্রধান কারণ মানসিক চাপ বা stress। কাজেই, মানসিক চাপের মোকাবিলা এবং নেতিবাচক আবেগ প্রবণতা হ্রাস করার উপর জোর দিতে হবে। এভাবে ইতিবাচক পরিস্থিতি সৃষ্টি করে রোগ-বালাইয়ের উপর রাশ টানা সম্ভব। মানসিক চাপকে প্রতিহত, প্রতিরোধ করার এক সার্বিক পদ্ধতি হিসাবে 'যোগ'কে চিহ্নিত করা হয়। ব্যক্তি বিশেষের মধ্যে ধারাবাহিক শারীরবৃত্তীয় পরিবর্তন সাধনের মাধ্যমে যোগ মানসিক চাপ হ্রাস করে। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে 'যোগ' নিয়ে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে অধ্যয়ন উল্লেখযোগ্য হারে বেড়ে চলেছে। যোগ থেরাপির প্রভাব এবং উপকার সম্পর্কের আরও বেশি করে জানার জন্য বহু ধরনের 'ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল'-এর রূপরেখা তৈরি করা হয়েছে।

এটা সত্যি যে, যোগ প্রক্রিয়া অনুশীলন দ্বারা রোগব্যাধির চিকিৎসায় সুফল পাওয়া যায়। কিন্তু কীভাবে যোগ রোগব্যাধির উপর কাজ করে? কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর নির্ভর করে যোগ থেরাপি কাজ করে? যোগ থেরাপির মডেল কী? এইসব প্রশ্নের সঠিক উত্তর না পাওয়া গেলে যুক্তিসম্মত এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে যোগ থেরাপি অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

যোগ থেরাপির অনুসৃত মডেল-এ সর্বাগ্রে যে সত্যটি জড়িত, তা হল এই থেরাপির ক্ষেত্রে মানব শরীরের বৈজ্ঞানিক তথা সামগ্রিক পরিপ্রেক্ষিতকে বিবেচনায় রাখা হয়। মানব দেহের কার্যাবলীর ক্ষেত্রে 'প্রাণ'-এর ভূমিকা সম্পর্কে সামগ্রিক জ্ঞান অর্জন জরুরি। 'যোগ'-এর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা অনুযায়ী 'আধি' (Adhi)-র কারণে ব্যাধির সৃষ্টি। অন্যান্য কারণ হল 'প্রাণ'-এর বিকৃতিও অপর্যাপ্ততা।

'যোগ'-এর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা রোগব্যাধিকে দু'টি বৃহৎ শ্রেণিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

(i) পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির কারণে সৃষ্ট রোগব্যাধি; এবং (ii) প্রারব্ধ কর্ম (Adhisa Vyadhi)-এর কারণে সৃষ্ট রোগব্যাধি। যদিও উভয় ক্ষেত্রেই 'প্রাণ'-এর প্রবাহ দমিত বা বাধাপ্রাপ্ত হয়; কারণ ভিন্ন হওয়ায় এই দুই ধরনের রোগব্যাধির নিরাময় পদ্ধতিও ভিন্ন। যোগ থেরাপির বিবিধ প্রকল্পে, জীবনশৈলী এবং জীবনযাত্রার পরিপ্রেক্ষিত 'প্রাণ'-এর পরিশোধন বা গুণগত মান বর্ধনে অত্যন্ত কার্যকরী ভূমিকা পালন করে।

যোগ বিজ্ঞান প্রমাণ করে দেখিয়েছে যে আমাদের জীবনের সমস্ত দিক 'প্রাণ'-এর ঐক্যতান দ্বারা প্রভাবিত। আধুনিক বিজ্ঞান 'প্রাণ'-কে চিহ্নিত করেছে জীবনী শক্তি (life force) হিসাবে; যা হল রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা রাখে এমন এক জৈব-বৈদ্যুতিক (bio-electricity) বা বিদ্যুৎচুম্বকীয় (electromagnetic) শক্তি। আসলে, এগুলি সবই হচ্ছে 'প্রাণ'-এর বিবিধ রূপ। কোনও ব্যক্তি যদি সামান্য পরিমাণে হলেও 'প্রাণ'-এর স্বরূপ উপলব্ধি করতে সক্ষম হন, তা হলেই তার সেই জ্ঞান-এর ব্যাপকতা অনুযায়ী রেইকি ইত্যাদি প্রাণ-এর গুণগত মান বৃদ্ধির বিবিধ পদ্ধতি আয়ত্ত করতে সক্ষম হবেন। কিন্তু যোগ-এর ক্ষেত্রে 'প্রাণ' সম্পর্কে এক সামগ্রিক জ্ঞান জরুরি। যোগ-এ বিশ্বাস করা হয় যে, প্রাণ-এর প্রবাহ যদি রুদ্ধ হয় তবে আমাদের পার্থিব শরীর অতিসূক্ষ্ম দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। জাগতিক পরিভাষায় একে চিহ্নিত করা হয় 'মৃত্যু' বলে।

সুস্থ সবল ও দীর্ঘায়ু জীবনের জন্য 'প্রাণ'-এর সংরক্ষণ এবং পরিবর্ধন জরুরি। যোগে জোরটা দেওয়া হয় মূলত শরীরকে সুস্থ সবল রাখার উপর। যোগ বিশেষজ্ঞরাও মনে করেন যে, যোগের অনুসারী জীবনযাত্রাকে অবহেলার মধ্যেই নিহিত আছে রোগব্যাধির কারণ। যদি যোগের অনুসারী রীতি অনুযায়ী সংযমী জীবনযাপন করা হয়, তা হলে পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির কারণে সৃষ্ট রোগব্যাধি থেকে পুরোপুরি পরিত্রাণ সম্ভব। কর্মফল স্বরূপ ঘটে, এমন রোগব্যাধির সমস্যারও যৌগিক পদ্ধতির মাধ্যমে সমাধান করা যায়। এভাবে যোগ সবার জন্য ব্যধিমুক্ত সুস্থ সবল জীবনের অঙ্গীকার করে।

বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করা যায় যে, নিজের মধ্যে সঞ্চিত 'প্রাণ'কে মানুষ কখনও কখনও ব্যবহার করে না। অথচ এর অভাবে সংঘটিত পীড়ন-যন্ত্রণা ভোগের সময় পরে পশ্চাতাপ করে। সংযম বা আত্ম-নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে 'প্রাণ'-এর সংরক্ষণ সম্ভব। এবং তা যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে জীবনকে আনন্দময় করে তোলা সম্ভব। কিন্তু হায়! মানুষ তার অজ্ঞানতার খেসারত দেয়।

যোগ অনুসারী জীবনশৈলী দৈনন্দিন বাহ্যিক এবং আত্মিক/অন্তর্মনোগত জীবন— এই দুয়ের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার উপায়। জীবনে যদি এই ভারসাম্য বজায় থাকে, তবে সক্ষমতা, দক্ষতা এবং সাফল্য নিজে থেকেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিকশিত হয়। সঠিক জীবনশৈলী হল প্রাণ-এর বাধাহীন প্রবাহের সহজাত পরিণতি। সুতরাং এটা বলা অত্যুক্তি হবে না যে, যোগ অনুসরণ হল নিরোগ জীবন যাপনের সুবর্ণ সূত্র। এর অনুপস্থিতিতে রোগব্যাধির প্রকোপ বৃদ্ধি অনিবার্য। আসন, প্রাণায়াম, বাঁধা, মুদ্রা এবং বিবিধ যৌগিক ক্রিয়া সহজেই প্রাণ-এর প্রবাহে প্রতিবন্ধকতা বা অবরোধ মুক্ত করে সুস্থসবল জীবনযাপন সম্ভবপর করে।

যোগ থেরাপির ক্ষেত্রে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয় জীবনের যৌগিক পরিপ্রেক্ষিতের উপর। আজকের দিনে গোটা বিশ্ব জুড়েই বৈজ্ঞানিকরা সর্বসম্মতভাবে একমত যে, মানুষের অধিকাংশ রোগব্যাধি প্রকৃতিগত ভাবে 'Psychosomatic', অর্থাৎ দেহ-মনের সঙ্গে সম্পর্কিত, মানসিক সমস্যাদি পল্লবিত হয়ে জীবন যাপনের সঠিক পরিপ্রেক্ষিতের সামনে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। যদি আমাদের বিশ্বাস, উদ্দেশ্য এবং জীবনের লক্ষ্য সঠিক হয়; যদি আমাদের জীবনের পরিপ্রেক্ষিত সঠিক এবং ভারসাম্যপূর্ণ নয়; তবে আমাদের জীবনী শক্তি উপযুক্তভাবে ব্যবহার হবে। এর পরিণতিতে মানসিক চাপ-অবসাদ-উত্তেজনার প্রশমন ঘটবে। মানসিক চাপ বা 'stress' জনিত সমস্যার কারণে 'প্রাণ'-এর অপচয় হয়। যোগ অনুসারী জীবনশৈলী অবলম্বন করে এই অপচয়ের নিবৃত্তি সম্ভব।

সর্বাত্মক জীবনচর্যা বিজ্ঞান হিসাবে এভাবেই যোগ জীবনের গুণগত মানের বিকাশে কার্যকরী ভূমিকা নেয়। তবে, শুধু তাই নয় বিবিধ রোগ নির্ণয়ের পর বিকল্প চিকিৎসা পদ্ধতি হিসাবেও যোগের ব্যবহার সুফলদায়ী। শল্য চিকিৎসা, রেডিয়েশন এবং কেমো থেরাপির পর রোগীর শরীরে বিবিধ পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার মাত্রা হ্রাস করতে যোগ অত্যন্ত কার্যকরী। বিবিধ আসন অভ্যাস, ধীর লয়ে শ্বাস ক্রিয়ার অনুশীলন, ধ্যান বা মনোসংযোগ অভ্যাস এবং প্রশিক্ষক নির্দিষ্ট কিছু সৃষ্টিমূলক কাজ এর মধ্যে অন্যতম।

যোগ সম্পর্কে জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে শুধু গুণগত মানেরই উন্নতি হচ্ছে না, সংখ্যাগত দিক থেকেও ভারতে তো বটেই, বাইরের দেশেও, বিশেষ করে আমেরিকায় এর প্রসার ঘটা পিঠের ব্যাথা, অনিদ্রা, কর্কটরোগ, হৃদরোগ এমনকী যক্ষার মতো রোগব্যাধিও প্রতিরোধ করার ক্ষেত্রে যোগ অনুশীলন কার্যকরী ভূমিকা নিচ্ছে। যোগ কীভাবে কাজ করে, এর ওপরও অধ্যয়ন, পঠন-পাঠন তথা গবেষণা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই নিবন্ধেই একাধিকবার উল্লেখ করা হয়েছে যে, জীবনের বিবিধ ক্ষেত্রে যোগের অসংখ্য উপকারী প্রভাব রয়েছে। সাধারণভাবে যোগ আমাদের শরীরের সক্ষমতা, নমনীয়তা এবং ভারসাম্য বৃদ্ধির সহায়ক। শরীরের অনাক্রম্যতা (Immunity) কার্যাবলী বাড়ায়। রক্তে শর্করা ও কোলেস্টেরল-এর মাত্রা কম করে। মনে শারীরিকভাবে সুস্থ সবল থাকার অনুভূতি আনে। তবে যোগের অন্যতম প্রকট প্রভাবের মধ্যে অবশ্যই রয়েছে মানসিক চাপ কমানো।❑

(**লেখক পরিচিতি** : লেখক আচার্য S-VYASA এবং সভাপতি VYASA। ইমেল : hrnagendra1943@gmail.com, hrn@vyasa.org)

বি । শে । ষ । বি । ভা । গ

সুস্থ ও মানসিক চাপমুক্ত জীবনযাপনে যোগচর্চার ভূমিকা

*প্রাচীন ভারতে মুনি-ঋষিদের হাত ধরেই এক সময় শুরু হয়েছিল যোগচর্চা। দৈহিক মুদ্রা বা আসন, শ্বাস-প্রশ্বাস, নিয়ন্ত্রণ ও ধ্যানের মাধ্যমে দেহের অন্তর্নিহিত শক্তিকে জাগ্রত করার সহস্রাব্দ প্রাচীন এই পদ্ধতি আবার নতুন করে আশার আলো দেখাচ্ছে একালের চিকিৎসক ও বিজ্ঞানী মহলকে। মানসিক চাপ, মানসিক উদ্বেগ থেকে শুরু করে মধুমেহ বা ডায়বেটিস, নিদ্রাহীনতা, কোলাইটিস, ব্রংকাইটিস-সহ বিভিন্ন সাইকোসোমাটিক অসুখ-বিসুখের চিকিৎসায় সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণিত হয়েছে যোগচর্চার কার্যকারিতা। শিল্পায়ণ, নগরায়ন, ফাস্টফুড, স্মার্টফোনের জালে আবদ্ধ আজকের অস্থির প্রজন্মকে মানসিক চাপ মুক্ত রাখতে যোগচর্চার কোনও বিকল্প নেই। লিখছেন—*****ডা. ঈশ্বর এন. আচার্য** *এবং* **ডা. রাজীব রাস্তোগী**

স্বাস্থ্যরক্ষা ও সুস্থ জীবনযাপনের রীতি গড়ে তোলার জন্য এদেশে বহু প্রাচীন কাল থেকেই গড়ে উঠেছে যোগচর্চার প্রথা। সনাতন এই বৈজ্ঞানিক প্রথার জন্ম এদেশে এবং বহু বছর ধরে তা দেশের সংস্কৃতির সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে গেছে। বহু সহস্রাব্দ আগে প্রাচীন মুনি, ঋষিরা যে যোগচর্চার সূচনা করেছিলেন তা এখন বিশ্বজুড়ে স্বীকৃত। স্বাস্থ্য সংক্রান্ত নতুন নতুন সমস্যার মোকাবিলায় যোগচর্চার উপকারিতা আজ একবাক্যে মেনে নিয়েছেন সকলে। যোগচর্চার পদ্ধতি সহজ সরল, এটি ব্যয়সাশ্রয়ী এবং জীবন যাপনে সুস্থতা বজায় রাখা বা মানসিক চাপ জনিত শারীরিক অসুস্থতা বা সাইকোসোমাটিক অসুখ বিসুখের চিকিৎসায় এটি অত্যন্ত কার্যকরীও বটে। এই কারণেই বিশ্ববাসী আজ যোগচর্চায় অত্যন্ত আগ্রহী হয়ে উঠেছে। দৈহিক মুদ্রা বা আসন, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রন (ব্রিদিং এক্সারসাইজ) এবং ধ্যান—একত্রে এই তিনটি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে একজন ব্যক্তির দেহের অন্তর্নিহিত শক্তিকে ধীরে ধীরে জাগ্রত করাই যোগচর্চার লক্ষ্য। সমাজের সব স্তরের মানুষ এখন যোগচর্চার সুফলগুলি সম্বন্ধে অবহিত। শরীরকে শুধু চাঙ্গা বা তরতাজা রাখাই নয়, বরং বিভিন্ন রোগ ব্যাধি প্রতিরোধ ও তার চিকিৎসাতেও যে যোগচর্চা অত্যন্ত কার্যকরী হয়ে উঠছে সে ব্যাপারেও সচেতনতা গড়ে উঠছে জনমানসে। মানসিক সমস্যা বা মানসিক চাপ থেকে সৃষ্ট অন্য যেকোনও ধরনের শারীরিক অসুস্থতা বা সাইকোসোমাটিক অসুখ-বিসুখ প্রতিরোধে এই ধরনের রুগির চিকিৎসায় যোগচর্চার উপযোগিতা উপলব্ধি করেছেন বিজ্ঞানী ও চিকিৎসক মহল। যোগচর্চার কার্যকারিতা বহু বছর ধরে প্রমানিত। এই পদ্ধতি যেমন সহজ-সরল, তেমনই ব্যয়সাশ্রয়ী। সুস্থ, স্বাভাবিক, মানসিক চাপমুক্ত জীবন যাপনে আট থেকে আশি সকলেই যোগচর্চার উপকারিতা পেতে পারেন।

যোগচর্চা আজ শুধু আর ভারতের গণ্ডির মধ্যেই আবদ্ধ নেই। বিশ্বের বহু দেশের তরুণ সম্প্রদায় যোগচর্চা শুরু করেছে। যোগচর্চার আসরে ধর্ম, বর্ণ, জাতপাত, অঞ্চল, যা দেশকালের কোনও ভেদাভেদ নেই। এখানে সবাই স্বাগত। রাষ্ট্রসংঘ ২১ জুন তারিখটিকে 'আন্তর্জাতিক যোগ দিবস' হিসাবে ঘোষণা করেছে। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) মতে শুধুমাত্র রোগব্যাধি বা জরার অনুপস্থিতি নয়, বরং সামগ্রিকভাবে শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক মঙ্গলকেই বলা যায় স্বাস্থ্য। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এর সঙ্গে আবার একটি চতুর্থ মাত্রাও যোগ করেছে—'আত্মিক মঙ্গল'। অর্থাৎ শারীরিক, মানসিক, আবেগজনিত, সামাজিক এবং আত্মিক কল্যাণের মাধ্যমেই সামগ্রিকভাবে একটা সুস্থ জীবন যাপন সম্ভব।

আর এখানেই শুরু হচ্ছে যোগচর্চার ভূমিকা। আমাদের শরীর, মন, আবেগ, তথা জীবনযাত্রার সামাজিক ও আধ্যাত্মিক দিকগুলিকে সামগ্রিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করে যোগচর্চা আমাদের ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটায়; নিয়মিত যোগভ্যাসে দক্ষতা ও আত্মবিশ্বাস বাড়ে। এছাড়া, নিয়মিত যোগচর্চার মাধ্যমে যুব সম্প্রদায় সুস্থ, স্বাভাবিক, মানসিক চাপমুক্ত এবং অর্থপূর্ণ জীবনযাপন করতে পারে। একজন ব্যক্তির কী করা উচিত আর কী করা উচিত নয় তারও শিক্ষা দেয় যোগ (পাঁচটি যম এবং পাঁচটি নিয়ম)। যোগচর্চার মধ্যে কোন জটিলতা নেই। দৈনন্দিন জীবনযাত্রার রুটিনের মধ্যেই যে যার প্রয়োজন অনুযায়ী যোগচর্চা করতে পারেন।

দ্রুত শিল্পায়ন তথা নগরায়নের ফলে আমাদের জীবনযাত্রায় জটিলতা অনেক বেড়েছে। বেড়েছে দূষণ। তার সঙ্গে যোগ হয়েছে মানসিক চাপ বা স্ট্রেস, মানসিক উদ্বেগ বা অ্যাংজাইটি ইত্যাদি ইত্যাদি। সকাল থেকে শুরু করে গভীর রাত পর্যন্ত যন্ত্রের মতো ছুটে চলেছি আমরা। খাদ্যাভাসও এখন আর স্বাস্থ্যকর নয়। খাবার পাত জুড়ে এখন শুধু সংরক্ষিত খাদ্য বা প্রিজার্ভড ফুড, ফাস্ট ফুড, জাংক ফুড আর ক্যালোরি যুক্ত খাবার দাবার। সেই সঙ্গে চলছে অবাধ ধূমপান, মদ্যপান, মাদক সেবন। পর্যাপ্ত বিশ্রামের

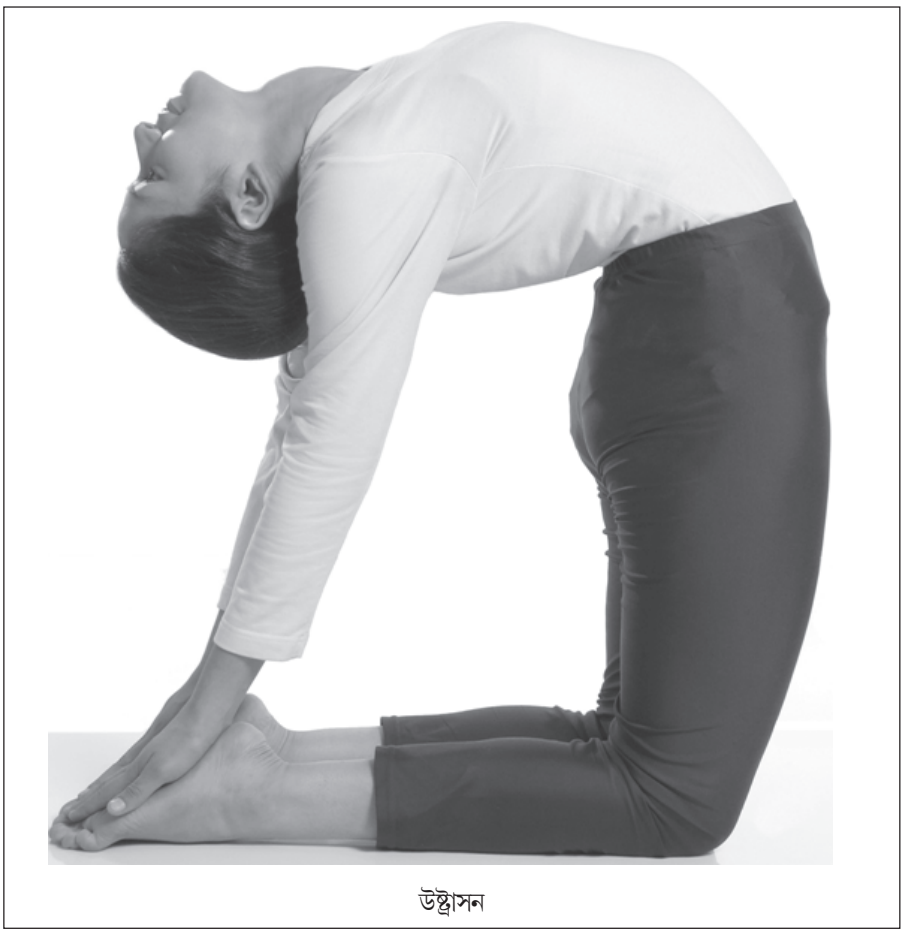

উষ্ট্রাসন

অভাব এবং শারীরিক কসরৎ বা ব্যায়াম না করার ফলে এখন সহজেই ধৈর্য হারাচ্ছে মানুষ। মধুমেহ বা ডায়াবেটিস, হাইপারটেনশন, বাত বা আরথ্রাইটিস, পিঠে ব্যাথার মতো সাইকোসোমাটিক অসুখ বিসুখও ছড়িয়ে পড়ছে ঘরে ঘরে। এই একই কারণে মানসিক অসুস্থতার ঘটনাও বাড়ছে দিন দিন। দেখ গেছে যে বিপুল সংখ্যক মানুষ আজ মানসিক অবসাদ বা ডিপ্রেশন, স্কিৎজোফ্রেনিয়া, এবং মদ ও মাদক সেবন জনিত অসুস্থতার শিকার। যোগ এমন এক চিকিৎসা পদ্ধতি যার মাধ্যমে শরীর ও মন উভয়েরই শুশ্রূষা হয়। আসন, প্রাণায়াম, ষট্‌কর্ম, সূর্য নমস্কার, এবং ধ্যান—এই পদ্ধতিগুলির মাধ্যমে শারীরিক ও মানসিক বিভিন্ন সমস্যার উপশম ঘটানো যায়। অ্যাংজাইটি, ডিপ্রেসন, নিউরোসিস, আচরণগত সমস্যা, অ্যানোরেক্সিয়ার মতো মানসিক অসুস্থতা তথা মাথাযন্ত্রণা, ব্রংকাইটিস, হাঁপানি, ডায়বেটিস, অটো ইমিউন ডিজঅর্ডারের মতো বিভিন্ন সাইকোসোমাটিক অসুখ বিসুখের চিকিৎসায় যোগচর্চা অত্যন্ত কার্যকরী হতে পারে।

আজকাল তরুণ-তরুণীদের কাছে সবচেয়ে বড় সমস্যা হল স্ট্রেস এবং অ্যাংজাইটি। স্ট্রেস শারীরিক হতে পারে অথবা হতে পারে মানসিক। স্ট্রেসের কারণ থাকতে পারে বাইরে অথবা মনের ভেতর। জীবনে কোন বড়সড় পরিবর্তন, কর্মস্থল বা বিদ্যালয়ের কোনও সমস্যা, সম্পর্কের জটিলতা, আর্থিক সমস্যা, অত্যধিক ব্যস্ততা, পরিবার ও সন্তানদের নিয়ে চিন্তা—এগুলোই মূলত স্ট্রেসের বাহ্যিক কারণ। আর স্ট্রেসের যে কারণগুলি বাইরে থেকে বোঝা যায় না, যেগুলি লুকিয়ে থাকে মনের গভীরে, সেগুলির মধ্যে রয়েছে ক্রমাগত দুশ্চিন্তা, নৈরাজ্যবাদ, নেচিবাতক চিন্তাভাবনা, অবাস্তব প্রত্যাশা/খুঁতখুঁতে স্বভাব, অনমনীয় মনোভাব, নমনীয়তার অভাব, কারো সামনে সম্পূর্ণ নতি স্বীকার বা তাকে একেবারে নস্যাৎ করে দেওয়ার মনোভাব ইত্যাদি। মানসিক স্ট্রেসের বহিঃপ্রকাশ হিসাবে প্রায়শই দেখা দেয় আবেগে ভারসাম্য বজায় রাখার অক্ষমতা, অস্থিরতা, আংজাইটি ইত্যাদি। এগুলিই আবার মাথাযন্ত্রণা, নিদ্রাহীনতা, মাংসপেশীর খিঁচুনি, ত্বকের ফুসকুড়ি, হজমের গণ্ডগোল, পেপটিক আলসার, কোলাইটিস, প্যালপিটেশন, উচ্চ রক্তচাপ, করোনারি থ্রম্বোসিস, ডিসমেনোরিয়ার মতো সাইকোসোমাটিক অসুখ-বিসুখের পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। আসন, প্রাণায়াম ও ধ্যানের নিয়মিত অভ্যাস এই ধরনের রোগ ব্যাধিগুলিকে অনেকখানি নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে। আসনের অনুশীলন শরীর ও মন শান্ত করে, নতুনভাবে চিন্তা ভাবনা করতে সাহায্য করে। নিয়মিত আসন অনুশীলন মনের বিক্ষিপ্তভাব কাটিয়ে একমুখী চিন্তাভাবনায় ফিরিয়ে দেয় মনকে। ফলে অনুশীলনকারীর দৃষ্টিভঙ্গির ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটে। এছাড়া ডিপ ব্রিদিং, যোগনিদ্রা এবং ধ্যানের অভ্যাস অনুশীলনকারীর মন থেকে নৈরাজ্য দূর করে এক অনির্বচনীয় প্রশান্তি ও আনন্দ এনে দেয়। সেইসঙ্গে ইতিবাচক চিন্তাভাবনাতেও উদ্বুদ্ধ করে অনুশীলনকারীকে।

আরও সুস্থ, চাপমুক্ত ও বিচার বিবেচনাপূর্ণ জীবনযাপনের জন্য আজকের তরুণ সম্প্রদায় কিছু সুঅভ্যাস গড়ে তুলতে পারে। এই অভ্যাসগুলি স্বাস্থ্যরক্ষার পাশাপাশি রোগ প্রতিরোধেও সাহায্য করবে। এগুলি সহজ সরল, ব্যয়সাশ্রয়ী এবং এগুলি মেনে চলাও যায় অনায়াসে এবং সবচেয়ে বড় কথা রোজকার রুটিনে প্রয়োজন মতো এগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া যায়। জীবন-যাত্রায় যত বেশি প্রকৃতির ছোঁয়া থাকবে মানুষ ও প্রকৃতির বন্ধন তত দৃঢ় হবে। মানুষের স্বাভাবিক অনুভূতিগুলির প্রকাশ আরও স্বতঃস্ফূর্ত হবে, মনে প্রশান্তি আসবে। মানুষ আরও ইতিবাচক চিন্তাভাবনা করায় মনের জোর বাড়ে। যে অভ্যেসগুলি শুরু থেকেই গড়ে তোলা প্রয়োজন তার মধ্যে কয়েকটি হল :

● **সুষম আহার :** আমাদের সবার আগে নজর দিতে হবে সুষম আহারের দিকে। প্রাকৃতিক খাবার দাবারের ওপরই যথাসম্ভব জোর দিতে হবে। খাদ্যতালিকায় যেন যথেষ্ট পরিমাণে মরশুমি ফলমূল, টাটকা সবুজ পত্রবহুল এবং অংকুরিত দানাশস্য থাকে।

বৃক্ষাসন

এই সমস্ত খাদ্য ক্ষারজাতীয় হওয়ার কারণে শরীরকে পরিশোধন করে স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটায় এবং শরীরের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে আরও মজবুত করে তোলে।

● **উপবাস :** স্বাস্থ্যরক্ষার এক অন্যতম অঙ্গ হল উপবাস। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দেহের পুরো পরিপাক ব্যবস্থা বিশ্রাম পায়। যে শক্তি খাদ্য পরিপাক করে সেই শক্তি তখন দেহ থেকে সমস্ত দূষিত পদার্থ নিষ্কাশনের কাজে নিয়োজিত হয়। শরীর ও মনের বিভিন্ন সমস্যা দূর করতে উপবাস খুব ভালো পদ্ধতি। সপ্তাহে একদিন খাদ্য তালিকায় ফলের রস বা ফল থাকাটা স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশেষ উপকারী।

● **নিয়মিত শরীরচর্চা :** নিয়মিত শরীরচর্চা বা যেকোনও ধরনের যোগচর্চা স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে অত্যন্ত জরুরি। এই অভ্যাস দেহে রক্ত চলাচল বাড়ায় এবং শরীরকে আরও নমনীয় রাখে। সেইসঙ্গে শরীরে বয়সের ছাপ আটকাতে এবং সুস্বাস্থ্য বজায় রাখতে এর জুড়ি নেই। যে যার শারীরিক সক্ষমতা এবং পছন্দ অনুযায়ী প্রাতঃভ্রমণ, দৌড়, জগিং, যোগাসন, সূর্য নমস্কার, প্রাণায়াম অথবা বাগান করার মতো শারীরিক কসরতের কাজ বেছে নিতে পারে। নিয়মিত শরীরচর্চায় শরীর সচল হয়, কাজের উদ্দীপনা বাড়ে, মনে নতুন আশার সঞ্চার হয়। এছাড়াও শরীরের ওপর এর উপকারিতা রয়েছে আরও অনেক। বিশিষ্ট ন্যাচুরোপ্যাথ ডা. হেনরি লিন্ডলার জানিয়েছেন যে—শরীরচর্চার ফলে কোষগুলিতে জমা হওয়া রোগসৃষ্টিকারী পদার্থগুলি (মরবিড অ্যাকিউমুলেশন) ধাক্কা খায়, ধমনী ও শিরায় রক্ত চলাচল বাড়ে, ফুসফুস তার পূর্ণক্ষমতা অনুযায়ী প্রসারিত হওয়ার ফলে শরীর আরও বেশি অক্সিজেন পায় এবং সবচেয়ে বড় কথা নিয়মিত শরীর চর্চা ত্বক, কিডনি, শ্বাসনালী ও জলের মাধ্যমে শরীরের বর্জ্য ও রোগ সৃষ্টিকারী পদার্থ বের করে দিতে সাহায্য করে।

● **বিশ্রাম :** নিয়মিত যোগচর্চা ছাড়াও স্বাস্থ্য-রক্ষার জন্য পর্যাপ্ত বিশ্রাম ও শান্তিতে ঘুম অত্যন্ত জরুরি। ঘুম ভালো হলে মন ফুরফুরে থাকে। কাজে উৎসাহ আসে। ঘুমে ব্যাঘাত ঘটলে দেখা দেয় স্ট্রেস, অ্যাংজাইটি। শরীর ভেঙে পড়ে। তাই যেকোন ভাবেই নিরুপদ্রবে ঘুমোনোর ব্যবস্থা করে নিতে হবে।

● **পর্যাপ্ত পরিমাণে জলপান :** বিভিন্ন শারীরিক গোলযোগের মোকাবিলা ও সুস্বাস্থ্য বজায় রাখতে পর্যাপ্ত পরিমাণে জল খেতেই হবে। জলের মধ্যে শরীরের দূষিত পদার্থগুলি সব মিশে শরীরের বাইরে বেরিয়ে যায়। আর এই ভাবেই দেহের পরিশোধন ঘটে।

জীবনযাত্রার প্রণালীতে নিয়মিত অভ্যাসের জন্য নিচে কিছু মূল্যবান পরামর্শ দেওয়া হল :

(১) রাতে তাড়াতাড়ি শুতে যান এবং সূর্যোদয়ের আগে (ব্রাহ্মমুহূর্তে) ঘুম থেকে উঠে পড়ুন। অন্তত সাত ঘন্টা নিরুপদ্রবে ঘুমোনোর চেষ্টা করুন।

(২) সাধারণ, সুষম আহার করুন।

(৩) অতিরিক্ত চিনি, নুন, ভারি খাবার, শুকনো লংকা, মশলাদার খাবার দাবার ও আচার খাওয়া কমান। কমান চা ও কফি। মদ জাতীয় যেকোন জিনিস থেকে দূরে থাকুন। ঘি ও তেলের ব্যবহার কমান। যোগ অনুশীলনকারীর পক্ষে নিরামিশ খাওয়াই বাঞ্ছনীয়।

(৪) খাওয়ার নির্দিষ্ট সময় বেঁধে নিন। যোগচর্চার আধঘণ্টা পর ফল বা অংকুরিত দানা শস্য অথবা দালিয়া দিয়ে প্রাতরাশ সেরে নিন। দুপুরের খাবার পাতে থাকুক গমের রুটি, সেদ্ধ সবজি, স্যালাড এবং ঘোল। রুটির চেয়ে সবজি ও স্যালাডের পরিমাণ যেন বেশি হয়।

(৫) খেতে খেতে জল খাবেন না, খাওয়ার আধঘণ্টা আগে এবং খাওয়ার আধঘণ্টা পরে জল খান।

(৬) দৈনিক সকালে অথবা সন্ধ্যায় প্রার্থনা বা ধ্যান করুন। এই অভ্যাস টেনশন ও স্ট্রেস দূর করে শরীর ও মনকে চাঙ্গা করবে।

(৭) যোগচর্চা ও ষট্‌কর্মের মাধ্যমে শরীরের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক পরিশোধন অত্যন্ত জরুরি।

(৮) প্রকৃতির ওপর ভরসা রাখুন। প্রকৃতিই আপনাকে শক্তি দেবে, বেঁচে থাকার রসদ যোগাবে।

(৯) অতিরিক্ত খাবেন না। খিদে না পেলে কখনোই খাবেন না। খিদে পেলে খান তবে কখনোই ভরপেট নয়। পেট পুরো ভরার আগে উঠে যান। সপ্তাহে একদিন শুধু মরশুমি ফল খেয়ে কাটান।

(১০) যতটা পারেন হাঁটুন। এতে শরীর ও মন দুই-ই চাঙ্গা হবে। ❑

(**লেখক পরিচিতি** : ডা. ঈশ্বর এন আচার্য, নয়াদিল্লিস্থিত সেন্ট্রাল কাউন্সিল ফর রিসার্চ ইন যোগা অ্যান্ড ন্যাচুরোপাথির অধিকর্তা। ইমেল : ccryn.goi@gmail.com

ডা. রাজীব রাস্তোগী ওই প্রতিষ্ঠানেরই ন্যাচুরোপ্যাথি বিভাগের সহ-অধিকর্তা। ইমেল : rrastogi.2009@gmail.com)

বি । শে । ষ । বি । ভা । গ

আধুনিক জীবনশৈলীর প্রেক্ষিতে যোগের গুরুত্ব

*আধুনিক মানুষের জীবনযাপন পদ্ধতি স্বাস্থ্যরক্ষার ক্ষেত্রে বিভিন্নভাবে বাধা হয়ে উঠছে। বর্তমান যুগে দুনিয়া জুড়েই অসংখ্য মানুষের নানাবিধ রোগব্যাধির মূল কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে তাদের জীবনশৈলী। উদ্বেগ-উত্তেজনা, বেঠিক খাদ্যাভ্যাস, শারীরিক পরিশ্রমে অনীহা ডেকে আনছে স্বাস্থ্য ও কর্মক্ষমতার অবনতি। মধুমেহ, হাঁপানি, হৃদরোগ, বিপাকীয় অসুস্থতা এবং কর্কটরোগে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা বাড়ছে দ্রুত হারে। এসব আধুনিক স্বাস্থ্য সমস্যার সমাধান সূত্র কী? অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, রোগ প্রতিরোধ, বিশেষ করে মানসিক চাপজনিত ব্যাধিগুলির মোকাবিলায় এবং সুস্বাস্থ্যের বিকাশে যোগ অনুশীলনের ভূমিকা অত্যন্ত ইতিবাচক। সাম্প্রতিক অতীতে ভারত সরকার যোগ-এর প্রসার ও বিকাশের লক্ষ্যে বিবিধ উদ্যোগ নিয়েছে। যার মধ্যে অন্যতম হল ২১ জুন তারিখটিকে আন্তর্জাতিক যোগ দিবস হিসাবে ঘোষণা করার জন্য রাষ্ট্রসংঘে তদ্বির করা। গত বছর রাষ্ট্রসংঘের তরফে এই স্বীকৃতি মেলার পর, দিনটি যে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার সঙ্গে গোটা বিশ্বজুড়ে সাড়ম্বরে পালিত হল, তা থেকেই যোগের স্বাস্থ্যসম্পর্কিত কল্যাণকর ভূমিকা নিয়ে ব্যাপক জনচেতনার বিষয়টি প্রমাণিত। আজকের দিনেও খ্যাতনামা যোগগুরু বা প্রশিক্ষকদের সঠিক অনুপ্রেরণায় অগণিত মানুষ যোগের অনুশীলন দ্বারা উপকৃত হচ্ছেন। বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে যোগ এখন জীবনযাপনের অঙ্গ হয়ে উঠেছে। আধুনিক জীবনশৈলির প্রেক্ষিতে যোগের এই গুরুত্ব বৃদ্ধির কার্যকারণ নিয়ে বর্তমান নিবন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন—***ঈশ্বর ভি. বাসবারেড্ডি***

যোগ এক ধরনের আত্মিক অনুশাসন যার ভিত্তিমূলে আছে এর অতিসূক্ষ্ম বিজ্ঞান। দেহ ও মন এবং মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে সামঞ্জস্য সাধনই এর অভীষ্ট। যোগাভ্যাসেই নিহিত রয়েছে সুস্থ জীবনযাপনের কলা ও বিজ্ঞান। সামগ্রিকভাবে যোগের অনুশীলন জীবনের সকল স্তরে সমন্বয় আনে; রোগ প্রতিরোধ, সুস্থতার বিকাশ ও জীবনশৈলীপ্রসূত একাধিক ব্যাধির নিয়ন্ত্রণেও যোগের ভূমিকা সুবিদিত। সুস্থ দেহ-মনের গঠনে যোগের কার্যকারিতা আজ বিশ্বের প্রায় সর্বত্র স্বীকৃতি পেয়েছে।

সজ্ঞানতার এক প্রাচীন কৃষ্টি, সচেতনতার বিজ্ঞান, সুসমঞ্জস্য মানসিক অবস্থা, কর্মক্ষেত্রে উৎকর্ষ—প্রতিটি অণুষঙ্গই যোগের সঙ্গে আমাদের সম্যক পরিচিতি ঘটায়। এই বিস্ময়কর দিকগুলি যাতে সর্বত্র প্রসারিত হয়, যোগের দ্বারা যাতে বিশ্বের সকল মানুষ উপকৃত হন, সেটাই এই মুহূর্তে খুব জরুরি। মানবজাতির এই অমূল্য দিব্য আশীর্বাদকে জীবনচর্যায় অঙ্গীভূত করলে প্রতিটি মানুষই তার সাধারণত্ব অতিক্রম করে অসাধারণত্বের স্তরে পৌঁছতে পারবেন।

যোগ আত্মোন্নতির লক্ষ্যে সর্বাত্মক প্রয়াস। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দেশের মানুষ শৃঙ্খলা মেনে উন্নততর জ্ঞানের সন্ধানে ব্রতী হয়েছে এবং নিজ সত্তা ও তার পারিপার্শ্বিকের ওপর নিয়ন্ত্রণ কায়েম করতে চেয়েছে। ভারতেও তাই ঘটেছে যোগ প্রক্রিয়ার মধ্যস্থতায়। প্রক্রিয়াটি স্বরূপের উন্মোচনে ব্যক্তিত্বের ওপর সার্বিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা ছাড়া আর কিছু নয়। ঋষি-যোগীদের এই সম্পর্কিত অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধি আজকের দিনেও প্রত্যক্ষভাবে প্রাসঙ্গিক। গভীর প্রশান্তি অর্জন করে যাবতীয় সংশয়কে দূরে সরিয়ে জীবনের প্রকৃত অভিমুখের অন্বেষণে ঋষি-যোগীদের নিরন্তর সাধনা নিষ্ফল হয়নি। তাঁরা প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছেন যে, যে কোনও মানুষ করুণা ও অনুকম্পায় আস্থাশীল হয়ে তার জীবনকে সুন্দর ও পরিপূর্ণ করতে সক্ষম। আর বিজ্ঞান ও কলার সাহায্যে উপলব্ধ এই জ্ঞানেরই আর এক নাম যোগ।

যোগের প্রাচীন ও আধুনিক কাল

সভ্যতার শৈশবেই যোগের অনুশীলন শুরু হয়। প্রায় সকলেই সহমত হন যে, যোগ, সিন্ধু উপত্যকা সভ্যতার এক 'শাশ্বত সাংস্কৃতিক অবদান' এবং এর অনুশীলনে মানবজাতির বাহ্যিক ও আত্মিক উন্নতি ঘটে। দর্শন, ঐতিহ্য, বংশানুক্রমতা ও গুরু-শিষ্য পরম্পরার বিভিন্নতাকে ভিত্তি করেই অতীতের অনুসারী যোগ শিক্ষায়তনগুলির উদ্ভব হয়। ঘরানাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, কর্মযোগ, ধ্যানযোগ, পতঞ্জলি-যোগ, কুণ্ডলিনী যোগ, হঠ-যোগ, মন্ত্র-যোগ, লয়যোগ, রাজযোগ, জৈন যোগ এবং বৌদ্ধ যোগ। প্রতিটি ঘরানাতেই রয়েছে নিজস্ব নীতি ও অনুশাসন, যা অনুসরণকারীকে যোগের চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছে দেয়। যোগের জন্মভূমি ভারতে রয়েছে সামাজিক প্রথা, রীতিনীতি ও আচার-অনুষ্ঠানের বৈচিত্র্য। তা সত্ত্বেও এই বিভিন্নতার মধ্যে প্রাকৃতিক ভারসাম্যের প্রতি অনুরাগ, অন্য ঘরানার চিন্তা-ভাবনার প্রতি সহিষ্ণুতা এবং প্রতিটি সৃষ্টির প্রতি সহানুভূতিশীল দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। যোগ সাধনায় রোগ নিরাময় হয়। যোগ ব্যষ্টি ও সমষ্টির সুস্বাস্থ্য সুনিশ্চিত করে তাই জীবনকে অর্থপূর্ণ করে তুলতে ধর্ম-বর্ণ-জাতি নির্বিশেষে সকলেরই যোগচর্চায় অংশ নেওয়া উচিত। সেই প্রাচীন যুগ থেকে শুরু করে আজকের দিনেও খ্যাতনামা

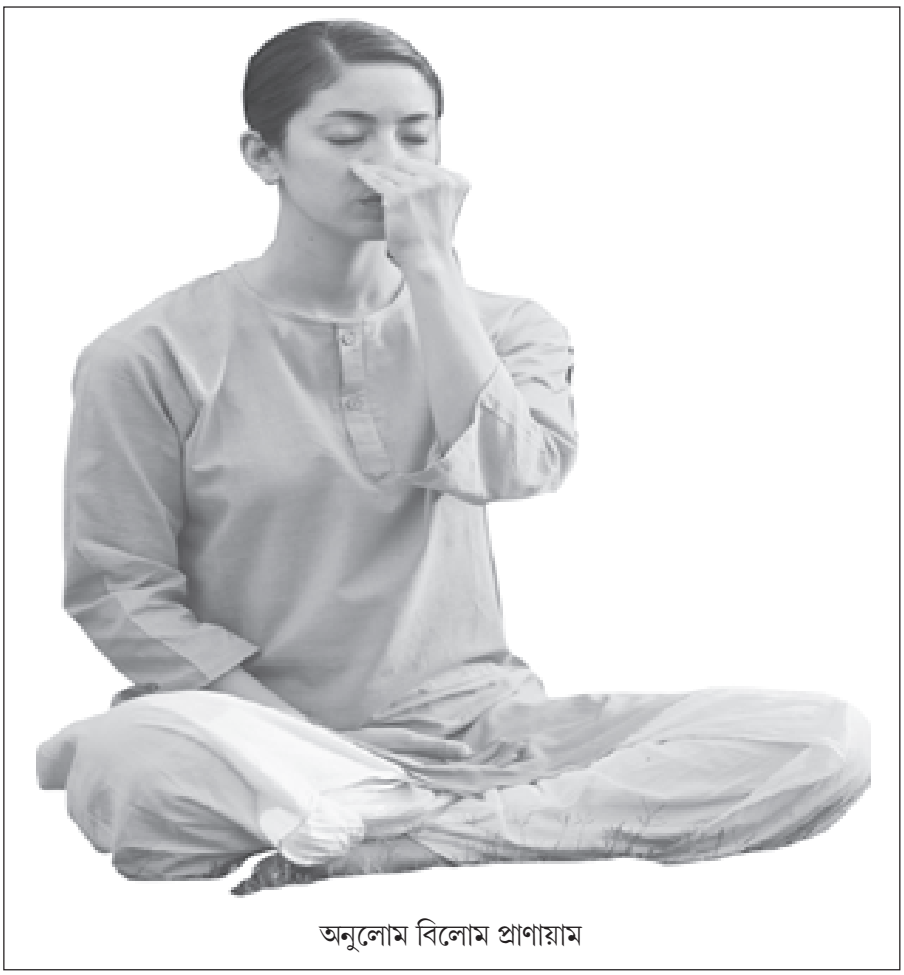

অনুলোম বিলোম প্রাণায়াম

যোগগুরু বা প্রশিক্ষকদের সঠিক অনুপ্রেরণায় অগণিত মানুষ যোগের অনুশীলন দ্বারা উপকৃত হয়েছেন বা হচ্ছেন। বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে যোগ এখন জীবনযাপনের অঙ্গ হয়ে উঠেছে। এখনকার যোগসাধনা-গুলির মধ্যে যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়ম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান (মনঃসংযোগ), সমাধি/সময়ম, বন্ধ ও মুদ্রা, শত-কর্ম, যুক্ত আহার, যুক্ত কর্ম, মন্ত্রজপ প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে।

আধুনিক জীবনশৈলী ও যোগের দ্বারা সুস্বাস্থ্য

আধুনিক মানুষের জীবনশৈলী তার স্বাস্থ্যরক্ষার ক্ষেত্রে একাধিক চ্যালেঞ্জ এনেছে। বিশ্বের সর্বত্রই আধুনিক জীবনশৈলী অসংখ্য মানুষের নানারকম রোগব্যাধির অন্যতম কারণ হয়ে উঠেছে। উদ্বেগ-উত্তেজনা, বেঠিক খাদ্যাভ্যাস, শারীরিক পরিশ্রম বিমুখ জীবনযাত্রা ডেকে আনছে স্বাস্থ্য ও কর্মক্ষমতার অবনতি এবং মানুষকে ডায়াবেটিস, হাঁপানি, হৃদরোগ, বিপাকীয় অসুস্থতা এবং ক্যান্সারে আক্রান্ত করছে। প্রশ্ন হল এসব আধুনিক স্বাস্থ্য সমস্যার সমাধানসূত্র কী যোগে নিহিত রয়েছে? যেহেতু এসব সমস্যার মূলে রয়েছে ভ্রান্ত জীবনশৈলী, তাই এগুলির প্রতিরোধে যোগের ভূমিকা খুব মূল্যবান। সেই সঙ্গে এটাও প্রমাণিত হয় যে, বিজ্ঞান ও আধ্যাত্মিকতাকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখা ঠিক নয়। জীবনশৈলী ও মানসিক চাপজনিত বিভিন্ন সমস্যার সমাধানসূত্র যোগে রয়েছে। রোগ প্রতিরোধ, বিশেষ করে মানসিক চাপজনিত ব্যাধিগুলির সুষ্ঠু পরিচালনা এবং সুস্বাস্থ্যের বিকাশে যোগের বৈজ্ঞানিক অবদান নিয়ে বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে গবেষণা-সমীক্ষা সম্পাদিত হয়। স্বাস্থ্যের ওপর যোগের কল্যাণকর প্রভাব কতটা সেটা জানার জন্য শারীরবৃত্ত সম্পর্কিত, জৈব রাসায়নিক, মানসিক ও ক্লিনিক্যাল ভেরিয়েবল বা ভেদগুলিকে নিয়ন্ত্রিত পরীক্ষা-নিরীক্ষার সাহায্যে খতিয়ে দেখা হয়। গবেষণার ফলাফল প্রমাণ করেছে যে অনুশীলনকারীর স্নায়ুতন্ত্র ও অন্তঃক্ষরা ব্যবস্থাকে চালিত করে তার স্বাস্থ্যের কোষঘটিত ও আণবিক দিকগুলির ওপর যোগ অনুকূল প্রভাব ফেলে থাকে। যোগের সাহায্যে যে ভারসাম্য অর্জিত হয় তা অনুশীলনকারীর প্যারাসিমপ্যাথেটিক ব্যবস্থা শক্তিশালী করে শারীরবৃত্তের ক্ষয় রোধ করে এবং বার্ধক্যগ্রস্ততাকে মন্থর করে দেয়। যোগচর্চায় দেহে যে আপেক্ষিক হাইপো মেটাবলিক অবস্থা সৃষ্টি হয় তা মানসিক চাপ সহ্য করার ক্ষমতাকে বহুলাংশে বর্ধিত করে। গবেষণা-সমীক্ষাগুলি আরও প্রমাণিত করেছে যে যোগের দ্বারা দৈহিক ও বোধশক্তির বিকাশ ঘটে, উন্নতি ঘটে দেহের তাপনিয়ন্ত্রণকারী ব্যবস্থায়, বৃদ্ধি পায় দেহের নমনীয়তা ও মানসিক চাপ সহনের ক্ষমতা। রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা মজবুত হয়ে ওঠার দরুন রোগ সংক্রমণের আশঙ্কাও হ্রাস পায়। হাইপারটেনশন, হৃদযন্ত্রের রক্ত সঞ্চালক ধমণী বা করোনারি আর্টারির ব্যাধি এবং ডায়াবেটিসের প্রচলিত চিকিৎসা পদ্ধতির আনুষঙ্গিক হিসাবে যোগের কার্যকারিতা প্রমাণিত হয়েছে। এসব রক্তব্যাধির চিকিৎসায় ওষুধ প্রয়োগের মাত্রা যোগের প্রভাবে হ্রাস পেয়ে থাকে এবং কার্ডিও ভাসকিউলার বা হৃদরোগের জটিলতা দূর করতেও যোগের ইতিবাচক ভূমিকা স্বীকৃতি পেয়েছে।

যোগের কল্যাণকর ভূমিকা ত্রিস্তরীয়। দৈহিক স্তরে যোগ স্বাস্থ্য ও সুস্থতার অন্যতম অবলম্বন; দ্বিতীয় স্তরে মনের একাগ্রতাকে সুনিশ্চিত করে, মানসিক চাপ থেকে রেহাই দেয় ও কর্মক্ষমতা বাড়ায়; এবং তৃতীয় আত্মিক স্তরে যোগের দ্বারা মানবিক গুণাবলীর বিকাশ ঘটে, জীবনে শান্তি ও স্বস্তি এনে দেয়।

যোগের সাধারণ দৈহিক ও শারীরবৃত্তীয় সুপ্রভাবের বিভিন্ন দিক এখানে তালিকাভুক্ত করা হল :

- ✶ বর্ধিত নমনীয়তা
- ✶ বর্ধিত পেশিশক্তি ও স্বাচ্ছন্দ্য
- ✶ উন্নত শ্বাসক্রিয়া, কর্মশক্তি ও জীবনীশক্তি
- ✶ মেটাবলিজম বা বিপাকক্রিয়ার ভারসাম্য
- ✶ দৈহিক ওজন হ্রাস
- ✶ হৃদযন্ত্রের সুস্থতা
- ✶ খেলাধূলায় উন্নততর মান

ভদ্রাসন

যোগের সাধারণ, মানসিক ও আত্মিক সুপ্রভাবের বিভিন্ন দিক এখানে তালিকাভুক্ত করা হল :

- ✶ উদ্বেগমুক্ত হালকা মনের স্বাচ্ছন্দ্য
- ✶ মনঃসংযোগ বা বর্তমান মুহূর্তের গভীরতর মূল্যায়নে সার্থকতা
- ✶ মন ও চিন্তা-ভাবনার ওপর প্রভূত নিয়ন্ত্রণ
- ✶ মানসিক স্বচ্ছতায় উন্নতি
- ✶ একাগ্রতা ও অভিনিবেশ ক্ষমতা বৃদ্ধি
- ✶ আত্ম-শৃঙ্খলায় উন্নতি
- ✶ কল্পনাশক্তি ও সৃজন ক্ষমতার (বিশেষ করে শিশুদের ক্ষেত্রে) সম্প্রসারণ
- ✶ মনমেজাজ ও মানসিক তৃপ্তির উন্নতি
- ✶ আত্ম-চেতনা বৃদ্ধি
- ✶ আত্ম-বিশ্বাস বৃদ্ধি
- ✶ আরও বেশি আশাবাদী হওয়া
- ✶ মানসিক দৃঢ়তা ও ইচ্ছাশক্তি বৃদ্ধি
- ✶ স্নায়ুমানসিক অসুস্থতার (স্কিটজোফ্রেনিয়া ও এডিএইচডি-সহ) বিভিন্ন উপসর্গ নিয়ন্ত্রণ
- ✶ উদ্বেগ-উত্তেজনা ও বিষণ্ণতার বিভিন্ন উপসর্গ হ্রাস
- ✶ আত্ম-জ্ঞানের অনুপ্রেরণা
- ✶ দেহের শক্তিকেন্দ্রগুলির উজ্জীবন
- ✶ প্রাত্যহিক জীবনে সদর্থক অভিজ্ঞতার আরও বেশি প্রতিফলন
- ✶ নিজের জীবনের অর্থ বা লক্ষ্য সম্পর্কে সঠিক সন্ধান পাওয়া
- ✶ অন্তর্লীন চেতনার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নিজের জীবনকে চালিত করা
- ✶ অন্যদের তথা সমগ্র বিশ্বের সঙ্গে আরও বেশি সংযুক্ত হবার ইচ্ছা।

উপসংহার

ভারতের জনসংখ্যায় এক বিপুল অংশ তরুণ বয়সী। সুস্থ জীবনশৈলী এবং ব্যক্তিত্বের বিকাশ সম্পর্কিত বিষয়গুলি নিয়ে এই তরুণদের সক্রিয় আগ্রহ বিশেষ প্রশংসার দাবি রাখে। মানসিক চাপমুক্ত জীবন ও কাজকর্মে উন্নতিসাধনের জন্য তাদেরই তো সবার আগে যোগকে জীবনযাত্রায় অঙ্গীভূত করা দরকার। যোগের প্রসার ও বিকাশের স্বার্থে সাম্প্রতিক অতীতে ভারত সরকার একাধিক পদক্ষেপ নিয়েছে। গত বছর অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের বিরাট সাফল্য আমাদের দায়িত্ব বাড়িয়েছে। দিনটির উদ্‌যাপন যোগের স্বাস্থ্যসম্পর্কিত কল্যাণকর ভূমিকা নিয়ে ব্যাপক জনচেতনা সৃষ্টি করেছে এবং বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় যোগ প্রশিক্ষকের চাহিদা বাড়িয়েছে। যোগ পেশাদারদের অভিজ্ঞানপত্র দানের বিষয়টি নিয়ে কেন্দ্রীয় আয়ুষ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে কোয়ালিটি কন্ট্রোল কর্তৃপক্ষের কাছে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে। এছাড়া দেশের বিভিন্ন স্থানে আয়ুষ সুসংবদ্ধ হাসপাতাল স্থাপন করার প্রস্তাবও এই মন্ত্রক বিবেচনা করে দেখছে। সেনাবাহিনী, আধা-সামরিক বাহিনী ও পুলিশবাহিনীর সদস্য ও কর্মীদের যোগ প্রশিক্ষণ দেবার এক কর্মপরিকল্পনাও আয়ুষ মন্ত্রক হাতে নিয়েছে। কেন্দ্রীয় কর্মী ও প্রশিক্ষণ বিভাগের উদ্যোগে ইতিমধ্যেই নয়াদিল্লিস্থিত গৃহকল্যাণ কেন্দ্রগুলিতে যোগ প্রশিক্ষণ শিবির শুরু হয়েছে। স্থাপিত হতে চলেছে যোগ ও প্রাকৃতিক চিকিৎসা পদ্ধতি বিষয়ক ছয়টি কেন্দ্রীয় গবেষণা প্রতিষ্ঠান। স্বাস্থ্য পরিষেবা ব্যবস্থায় প্রাচীন চিকিৎসা পদ্ধতিগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়টির ওপর 'WHO' বা বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার পক্ষ থেকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে রোগীর নিরাপত্তা ও চিকিৎসার কার্যকারিতা সম্পর্কে তাদের পক্ষ থেকে কিছু কৌশলগত নির্দেশিকাও উল্লেখিত হয়েছে। এখানে দৃঢ়তার সঙ্গে বলা যেতেই পারে যে যুগ যুগ ধরে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ যোগ পদ্ধতিকে শুধুমাত্র প্রমাণাভাবে উপেক্ষা করা উচিত হবে না। যোগের শক্তি ও সম্ভাবনাকে তার প্রাপ্য গুরুত্ব অবশ্যই দিতে হবে। যোগ ব্যবস্থার সর্বোচ্চ সদ্ব্যবহারের স্বার্থে প্রাথমিক কর্তব্য হিসাবে নীতি-পদক্ষেপ ও কৌশলগত মধ্যস্থতার আবশ্যকতা রয়েছে। প্রয়োজন রয়েছে সুষ্ঠু প্রশাসনিক ব্যবস্থা গঠন করে যোগের নিয়ন্ত্রণকারী ও বিকাশের বিভিন্ন দিকগুলির ওপর নজর রাখা এবং এই ক্ষেত্রটি যাতে পর্যাপ্ত সরকারি সহায়তা পায় তা সুনিশ্চিত করা। সব কিছুরই মূল উদ্দেশ্য হল যোগের কল্যাণকর ভূমিকাকে ব্যাপকভাবে প্রচার করা। একমাত্র শান্তিপ্রিয় ব্যক্তিরাই পারেন পারিবারিক শান্তি বজায় রাখতে। এভাবেই বলা যেতে পারে যে যোগ এমন একটি পন্থা যা ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, জাতি এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে গোটা বিশ্বকে সামঞ্জস্য ও সমন্বয়ের পথে এগিয়ে নিয়ে যাবার ক্ষমতা রাখে।❑

[**লেখক পরিচিতি :** লেখক কেন্দ্রীয় আয়ুষ মন্ত্রকের আওতাধীন মোরারজী দেশাই জাতীয় যোগ প্রতিষ্ঠানের অধিকর্তা। ইমেল : ibasavaraddi@yahoo.co.in]

যোগ প্রশিক্ষণ : মূল্যায়ন ও শংসিতকরণ পদ্ধতির নানান দিক

শরীর ও মনকে সুস্থ রাখতে যোগচর্চার উপকারিতা আজ বিশ্বজুড়ে স্বীকৃত। যোগচর্চার এই উপযোগিতাকে স্বীকৃতি দিয়েছে খোদ রাষ্ট্রসংঘও। কিন্তু ভারতের এই সনাতন ঐতিহ্যের প্রতি বিশ্ববাসীর আস্থা অটুট রাখতে গেলে যোগচর্চায় ইচ্ছুক শিক্ষার্থীদের যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রয়োজন। যোগশিক্ষার মানের সঙ্গে যাতে কোনওভাবেই আপস না করা হয়, তা নিশ্চিত করাও একান্তভাবে জরুরি। আর এজন্য দরকার যোগচর্চাকারী পেশাদার ও যোগশিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলির মূল্যায়ন ও শংসিতকরণের উদ্যোগ। যোগের মতো অভিজ্ঞতাধর্মী এক শিক্ষার ক্ষেত্রে কতটা কার্যকর হবে এই উদ্যোগ? লিখেছেন— **রবি পি. সিং** *এবং* **মণীশ পাণ্ডে**

যোগচর্চা নিয়ে বিস্তর আলোচনা রয়েছে ভারতের প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ ও বিভিন্ন পুরাণে। প্রাচীন মুনি, ঋষিদের হাত ধরেই এই যোগচর্চার সূচনা এবং কয়েক শতাব্দী ধরে এর বিবর্তন। মানুষের শরীর ও মনের উপর যোগচর্চার সুফল আজ বিশ্বজুড়ে স্বীকৃত। তবে মানবসভ্যতাকে উন্নততর জীবনচর্যায় দিশা দেখাতে যোগ কীভাবে ভূমিকা পালন করতে পারে সে সম্বন্ধে খুব কম মানুষেরই স্পষ্ট ধারণা রয়েছে।

সংস্কৃত 'যুজ' থেকে 'যোগ' শব্দটির উৎপত্তি যার অর্থ 'মিলন ঘটানো' বা 'সমন্বয় সাধন'। ভারতীয় সংস্কৃতির গভীরে নিহিত এক আধ্যাত্মিক এবং কঠিন তপস্যার পদ্ধতি হিসাবেই সাধারণভাবে যোগের পরিচিতি। শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণ, সাধারণ ধ্যান এবং বিশেষ ধরনের দৈহিক ভঙ্গিমা-সহ কিছু যোগ প্রণালী আজ স্বাস্থ্যরক্ষা ও মানসিক চাপ হালকা করার জন্য বিশ্বজুড়েই অনুশীলন করা হয়। স্বনামধন্য পতঞ্জলি মুনি[১] যোগের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেছিলেন— 'যোগাহ্ চিত্ত বৃত্তি নিরোধাই'। এর অর্থ হল 'যোগ মনের চাঞ্চল্য রোধ করে'। চিত্ত অর্থাৎ মন। 'বৃত্তি'-র অর্থ মনের প্রবৃত্তি এবং 'নিরোধ' শব্দটির অর্থ বন্ধ করা।

যোগচর্চার উৎপত্তি ঠিক কবে থেকে হয়েছিল তা নিয়ে অনেক অনুমান রয়েছে। তবে এটুকু বলা যায় যে, যোগচর্চার প্রথা এই ধরনের অনুমানের থেকেও অনেক পুরোনো। মহাভারতের[২] মতো মহাকাব্য এবং তার অন্তর্গত ভগবৎ গীতায়[৩] বিস্তারিতভাবে যোগচর্চার ব্যাখ্যা করা হয়েছে। গীতায় তিন রকম যোগের কথা বলা হয়েছে। যথা— কর্মযোগ, ভক্তিযোগ এবং জ্ঞানযোগ। এমনকী ১৯০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে ১১০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের মধ্যে রচিত বিভিন্ন বেদেও জীবনচর্যার এই শৈলীর উল্লেখ রয়েছে। পতঞ্জলির যোগসূত্রে যে ধ্রুপদী যোগশাস্ত্রের ব্যাখ্যা রয়েছে সেখানে যোগচর্চার আটটি মার্গের[৪] সন্ধান দেওয়া হয়েছে। যথা— যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান এবং সমাধি।

এই যোগসূত্রগুলি যোগচর্চার শ্রেষ্ঠ নিয়মগুলি (রাজ) এক সূত্রে গেঁথে একটি অষ্টাঙ্গিক ব্যবস্থা হিসাবে তুলে ধরেছে। যোগচর্চার সামগ্রিক দর্শনের ভিত্তি কপিলমুনির সাংখ্য দর্শনের ওপর প্রতিষ্ঠিত। মনের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে পতঞ্জলির দ্বিতীয় সূত্রে বলা হয়েছে মনের বিক্ষিপ্তভাব দূর করা ও চিত্ত চাঞ্চল্য রোধের কথা। প্রথম দিককার যোগসূত্রে মনের দিকটি বেশি গুরুত্ব পেলেও, পরবর্তীকালে যোগচর্চার ক্ষেত্রে যেমন হঠযোগে জোর দেওয়া হয়েছিল জটিল সব আসন ও দৈহিক ভঙ্গিমার ওপর।

বর্তমানে আবার বিভিন্ন ধরনের শারীরিক ও মানসিক চর্চার মাধ্যমে 'কুণ্ডলিনী' শক্তিকে জাগ্রত করার জন্যও যোগের চর্চা চলছে। শরীরচর্চার কথা বলতে গেলে শরীরকে চাঙ্গা রাখতে যোগে বিভিন্ন ধরনের দৈহিক ভঙ্গিমা বা আসনের বিধান রয়েছে। আর মনকে ধীর স্থির প্রশান্ত রাখার জন্য রয়েছে প্রাণায়াম, ধ্যান ইত্যাদি।

যোগচর্চার উপকারিতা আজ বিশ্বজুড়ে স্বীকৃত। উন্নততর জীবনযাত্রার সন্ধান পেতে যোগচর্চার দিকে আজ ঝুঁকছেন বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মানুষ। ভারতের এই সনাতন ঐতিহ্যের প্রতি তাদের আস্থা অটুট রাখতে গেলে এটা দেখা জরুরি যে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের যোগচর্চায় ইচ্ছুক শিক্ষার্থীদের সঠিকভাবে পথ দেখানো হচ্ছে কিনা বা তাদের প্রশিক্ষণ যথাযথ হচ্ছে কিনা। এজন্য যোগচর্চায় দক্ষ এবং বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তিদের নিয়েই প্রশিক্ষক দল গড়তে হবে। এই ধরনের ব্যক্তিদের মাধ্যমে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা গেলে যারা যোগশিক্ষায় ইচ্ছুক তারা প্রাচীন ভারতের এই প্রথার পূর্ণ উপযোগিতা উপলব্ধি করতে পারবেন। এই ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলার জন্য বিভিন্ন ধরনের উদ্যোগ প্রয়োজন। প্রথমত, এজন্য এমন এক ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা প্রয়োজন যেখানে যোগচর্চাকারীদের দক্ষতার মূল্যায়ন করে তাদের শংসিতকরণের রীতি থাকবে। মূল্যায়নের সময় 'কোন যোগচর্চা

করা প্রয়োজন' এবং 'কীভাবে দক্ষতা প্রকাশ করা দরকার, তা অবশ্যই যাচাই করতে যাবে। আন্তর্জাতিক মহলে স্বীকৃত কোনও মানদণ্ডের সাহায্যেই দক্ষতার এই মূল্যায়ন সম্ভবপর হবে। জ্ঞান, দক্ষতা এবং অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে একজন পেশাদার যোগচর্চাকারীকে তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করা যেতে পারে। যথা—উপদেষ্টা (ইনস্ট্রাকটর), প্রশিক্ষক (টিচার) এবং মাস্টার বা আচার্য। মূল্যায়ন ব্যবস্থার কাঠামো এমন হবে যাতে একজন পেশাদার যোগচর্চাকারী উপদেষ্টা বা ইনস্ট্রাকটর থেকে আচার্যের স্তরে উন্নীত হতে পারেন। এই মূল্যায়নের সময় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির শারীরিক কসরৎ প্রদর্শনের চেয়ে তাঁর অভিজ্ঞতার ওপর বেশি জোর দেওয়া হবে।

অন্যান্য উদ্যোগের মধ্যে রয়েছে যোগ শিক্ষা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলিকে স্বীকৃতিদানের জন্য উপযুক্ত কাঠামো গড়ে তোলা যাতে এই ধরনের প্রতিষ্ঠানগুলি যোগচর্চার ক্ষেত্রে ডিগ্রি, ডিপ্লোমা বা দক্ষতার বিভিন্ন শংসাপত্র প্রদান করতে পারে। যোগ অনুশীলনের মৌলিক পাঠদানের ক্ষেত্রে সব প্রতিষ্ঠানের মান যে সমান এমনটা নয়। জীবনকে সুস্থ, সুন্দর করে তোলার ক্ষেত্রে যোগচর্চার ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তার দিকে লক্ষ্য রেখে যেভাবে ব্যাঙের ছাতার মতো বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান গজিয়ে উঠছে সেগুলিকে রোখা দরকার। তা না হলে প্রাচীন ভারতের এই ঐতিহ্যের ওপর বিরাট আঘাত আসবে। এই কারণেই উপযুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলিকে স্বীকৃতি দিলে যোগচর্চার মানের সঙ্গে আপস করছে এমন প্রতিষ্ঠানগুলির বাড়বাড়ন্ত রোধ করা যাবে।

যোগচর্চা প্রতিষ্ঠানের শংসিতকরণ প্রকল্পের আওতায় চারটি স্তরে এই ধরনের প্রতিষ্ঠানগুলিকে শংসিতকরণের ব্যবস্থা রয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ে সেই সব প্রতিষ্ঠানগুলিকে শংসিত করা হবে যে প্রতিষ্ঠানগুলি অন্তত প্রথম দুটি স্তরের (উপদেষ্টা এবং শিক্ষক) ঐচ্ছিক শংসিতকরণ (ভলান্টারি সার্টিফিকেশন) প্রকল্পের ক্ষেত্রে যোগচর্চাকারী পেশাদারদের প্রশিক্ষণ দিতে সক্ষম। দ্বিতীয় স্তরের শংসিতকরণের ব্যবস্থাটি স্থায়ী প্রতিষ্ঠানগুলির জন্য—এই ব্যবস্থায় সেই সমস্ত প্রতিষ্ঠানকেই স্বীকৃতি দেওয়া হবে যেগুলি মৌলিক (বেসিক) যোগচর্চার পাশাপাশি যোগ অ্যাসোসিয়েশন অনুমোদিত শিক্ষণ/প্রশিক্ষণ কর্মসূচির অন্তত পক্ষে ৫০ শতাংশ যোগ শিক্ষাদান এবং সেই সঙ্গে ISO ২৯৯৯০ : ২০১০ মানদণ্ডের শর্তগুলি পূরণে সক্ষম।

তৃতীয় পর্যায়টি আরও উচ্চ স্তরের। এই পর্যায়ে সেই সব প্রতিষ্ঠানকেই স্বীকৃতি দেওয়া হবে যেগুলি দ্বিতীয় পর্যায়ের সমস্ত শর্ত পূরণ করবে তো বটেই; সেই সঙ্গে বিভিন্ন প্রয়োজন ও পরিস্থিতি অনুযায়ী ঠিক যেমন, চাই তেমন ধরনের যোগ শিক্ষা কর্মসূচির নকশা তৈরি করে শিক্ষাদান করতে সমর্থ।

স্বীকৃতিদানের সর্বোচ্চ স্তর, অর্থাৎ আশ্রমস্তরে সেই সমস্ত প্রতিষ্ঠানকেই স্বীকৃতি দেওয়া হবে যেগুলি তৃতীয় পর্যায়ের সমস্ত শর্ত পূরণ করার পাশাপাশি আশ্রমিক পরিবেশে ২০০ ঘণ্টা ও তার বেশি সময়ের শিক্ষাক্রমের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে পারবে।

প্রতিটি স্তরে প্রতিষ্ঠানগুলির স্বীকৃতির মাপকাঠি আলাদা আলাদাভাবে বেঁধে দেওয়া হয়েছে।

স্বীকৃতিপ্রাপ্ত এই প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে যারা উত্তীর্ণ হয়ে বেরোবে তাদের সুবিধার্থে 'যোগচর্চা পেশাদার শংসাপত্র' প্রদান করা হবে। সারাদিনব্যাপী লিখিত পরীক্ষা ও হাতে-কলমে মূল্যায়নের বদলে শুধুমাত্র সাক্ষাৎকার বা ভাইভা-ভোসির মাধ্যমেই মূল্যায়ন করে এই শংসাপত্র প্রদান করা হবে, যেমনটা করা হয় সরাসরি আবেদনকারীদের ক্ষেত্রে।

বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ

একজন শিক্ষকের কাছ থেকে শিক্ষার্থী কতটা জ্ঞান আহরণ করছেন তার কি মূল্যায়ন বা পরিমাপ করা যায়?—একজন পেশাদার যোগচর্চাকারীর দক্ষতা মূল্যায়নের ক্ষেত্রে প্রধান সমস্যা এটাই। দ্বিতীয়ত, অন্যেরা কি কারও মনের ভেতরটা দেখতে পারে বা মূল্যায়ন ও পরিমাপ করতে পারে? একজনের মনের ভেতরে কী চাঞ্চল্য ঘটছে, না ঘটছে তার সম্যক উপলব্ধি অন্যদের কীভাবে হবে?[৫]

তাই যোগচর্চাকারীদের শংসিতকরণের কাজটা মোটেই সহজ নয়। কারণ যোগ পুরোপুরি অভিজ্ঞতাধর্মী এক শিক্ষা। অনেকে মনে করেন যে যোগচর্চার জ্ঞান ও দক্ষতাকে শংসিতকরণের এই প্রচেষ্টা আসলে যোগচর্চাকে নৈর্ব্যক্তিক করারই অপচেষ্টা। যোগচর্চার নির্যাস লুকিয়ে রয়েছে এর গূঢ় রহস্য, গভীরতা এবং ব্যাখ্যার ওপর।

যোগ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলিও সমস্যার আরেকটা কারণ। আমাদের দেশে তো বটেই সেই সঙ্গে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে খ্যাতনামা যোগ প্রতিষ্ঠানগুলির পাশাপাশি অসংখ্য ছোট ছোট প্রতিষ্ঠান যোগ প্রশিক্ষক হওয়ার জন্য পাঠ্যক্রম পরিচালনা করছে। প্রতিষ্ঠানভেদে এই পাঠ্যক্রম সময়ের দিক থেকে আলাদা এবং বিষয়বস্তুর দিক থেকেও আলাদা। ফলে এই পাঠ্যক্রম আয়ত্ত করে যারা শিক্ষক হচ্ছেন তাদের অভিজ্ঞতা, দক্ষতা, জ্ঞান কোনও কিছুর মধ্যেই সামঞ্জস্য থাকছে না। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে যোগ অনুশীলনের ধরনও আলাদা। এই বৈচিত্র্যের ফলে সনাতন এই শৈলী আরও গতিময় ও সর্বব্যাপী হয়ে উঠবে ঠিকই; কিন্তু সেই সঙ্গে সৃষ্টি হবে এক ব্যাপক অনিশ্চয়তা—যোগচর্চার সঠিক রীতিটি কী? কোন রীতিটি অনুসরণ করা উচিত? এ নিয়ে সংশয় দেখা দেবে শিক্ষার্থীদের মনে।[৬]

যখনই কোনও ঘটনাকে নিয়ে বেশি চর্চা হয়, তখনই জনসমাজের একটা বিরাট অংশ যে যার নিজের মতো করে ব্যাখ্যা করে নেয় ঘটনাটিকে। বহু শতাব্দী ধরে লালিত জ্ঞানের ওপর প্রতিষ্ঠিত কোন শিক্ষামূলক ব্যাখ্যা বা ততটা শিক্ষামূলক নয় এমন ব্যাখ্যা যদি নিজেকে শিকড় থেকে বিচ্ছিন্ন করে নেয় তবে তার মধ্যে বেনোজল ঢুকবেই। যোগচর্চার ক্ষেত্রেও এই কথাটি একশো ভাগ প্রযোজ্য।

ভারতে হোক বা বিদেশে যোগগুরুরা যতদিন তাদের নিজস্ব যোগচর্চার ব্যাখ্যা অনুযায়ী মানসিক সান্ত্বনা, প্রশান্তি বা স্বাস্থ্যকর বিভিন্ন অভ্যেসের সন্ধান দিতে পেরেছেন শিষ্যরা তা সাদরে বরণ করে নিয়েছে। এই শিক্ষা অনেক সময়ই তাঁদের নিজস্ব অভিজ্ঞতাপ্রসূত যা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বা

আশ্রমের শিক্ষার সঙ্গে মেলে না। যোগচর্চার প্রক্রিয়াকে আরও বৈজ্ঞানিক, অভিন্ন ও নৈর্ব্যক্তিক করে তোলার জন্য শংসিতকরণের এই প্রকল্পে যোগচর্চার অনন্য অভিজ্ঞতাপ্রসূত, ব্যাখ্যামূলক দিকটিকে কি বিসর্জন দেওয়া হবে না? এই প্রশ্নটি এখন সবচেয়ে বড় হয়ে উঠেছে।

এই চ্যালেঞ্জগুলি মোকাবিলার লক্ষ্যে প্রকল্পটির কয়েকটি মৌলিক নিয়ম বেঁধে দেওয়া হয়েছে। শুরুতেই এটা স্থির করা হয়েছে যে, শংসিতকরণের প্রক্রিয়ায় যোগচর্চার মূল নির্যাস এবং যোগচর্চার বিভিন্ন বিদ্যালয়/প্রতিষ্ঠানের অভিনবত্ব অক্ষুণ্ণ রাখা হবে। যোগচর্চার আবেদন ও জনপ্রিয়তা বাড়ানোর জন্য একে আরও বিজ্ঞানসম্মত করে তোলা হবে ঠিকই, তবে এর দার্শনিক, অভিজ্ঞতাপ্রসূত ব্যাখ্যা ও আধ্যাত্মিক দিকগুলির সঙ্গে আপস করা হবে না। বিশ্বের দরবারে যোগচর্চার বিজ্ঞানকে তুলে ধরতে গিয়ে মূল নির্যাসকে বিসর্জন দেওয়া হবে না।

সমাধানের পথ

রাষ্ট্রসংঘের তরফে ২১ জুন তারিখকে 'আন্তর্জাতিক যোগ দিবস' হিসাবে ঘোষণা করার পর বিশ্বজুড়ে যোগচর্চার জনপ্রিয়তা আরও কয়েক কদম এগিয়ে গেছে। যোগচর্চার ক্ষেত্রে বিশ্বকে নেতৃত্ব দিতে হবে এখন ভারতকেই। যোগের মূল নির্যাস অক্ষুণ্ণ রেখে যোগচর্চার প্রসার ঘটানোর গুরুদায়িত্ব এখন ভারতের কাঁধে।

উপরোক্ত দায়িত্ব পালন তথা ২০১৫ সালে 'আন্তর্জাতিক যোগ দিবস' ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে যোগচর্চাকারী পেশাদারদের মূল্যায়ন ও শংসিতকরণ এবং সেই সঙ্গে যোগ প্রতিষ্ঠানগুলির শংসিতকরণের লক্ষ্যে কোয়ালিটি কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া (QCI)-কে চিহ্নিত করেছে 'আয়ুষ' মন্ত্রক। মন্ত্রকের তরফে এও স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে যে সেরা আন্তর্জাতিক মাপকাঠি অনুযায়ী শংসিতকরণের উপযুক্ত গুণমানসম্পন্ন কাঠামো গড়ে তোলার দক্ষতা QCI-এর রয়েছে।

ঐচ্ছিক পেশাদার যোগচর্চাকারী শংসিতকরণ প্রকল্পের আওতায় সেই সব যোগচর্চাকারী পেশাদারদের দক্ষতাকে শংসিত করার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হবে, যারা উপদেষ্টা হিসাবে (ইনস্ট্রাকটর) যোগ শিক্ষা দেন/যোগচর্চার ক্লাস নেন, অথবা প্রশিক্ষক (টিচার) হিসাবে যোগশিক্ষা বা প্রশিক্ষণ দেন, কিংবা মাস্টার হিসাবে বিশ্বজুড়ে প্রথাগত বা অপ্রথাগত উপায়ে এই শৈলীকে লালন করেন, তথা আচার্য হিসাবে এই জ্ঞানের রোগ প্রতিরোধ এবং রোগ নিরাময়ের দিকগুলি সম্বন্ধে সম্যকভাবে অবহিত থেকে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক নীতি ও মাপকাঠি, যেমন— ISO ১৭০২৪ : ২০১২ 'জেনারেল রিকোয়ারমেন্টস ফর বডিজ অপারেটিং সার্টিফিকেশন অফ পার্সনস' ইত্যাদি মেনে তা প্রয়োগ করেন। বিভিন্ন স্তরের পেশাদার যোগচর্চাকারীদের শংসিতকরণের ক্ষেত্রে QCI-এর এই প্রকল্পে সমস্ত ধরনের বৈচিত্র্যকে এক ছাতার তলায় এনে চেষ্টা করা হবে যাতে যোগ অনুশীলনকারীরা কোন প্রতিষ্ঠান থেকে প্রথাগত বা প্রথা-বহির্ভূত শিক্ষা অর্জন করেছেন তার ঊর্ধ্বে উঠে তাদের দক্ষতা ও জ্ঞানের ক্ষেত্রে একটা গ্রহণযোগ্য মানদণ্ড স্থির করা যায়।

শংসাপত্রপ্রাপ্ত সমস্ত যোগচর্চাকারী পেশাদারের যোগসম্পর্কিত তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক ধারণা যে অভিন্ন হবে সে মর্মে সীলমোহর দেবে শংসিতকরণের এই ব্যবস্থা। এক অর্থে শংসিতকরণের এই ব্যবস্থা যোগচর্চাকারী পেশাদারদের দক্ষতা ও জ্ঞানের গুণমান সুনিশ্চিত করবে। এছাড়া, শংসিতকরণের প্রস্তাবিত এই প্রক্রিয়ায় দক্ষতা ও জ্ঞানের ভিত্তিতে যোগচর্চাকারী পেশাদারদের মধ্যে স্তর বিন্যাস থাকবে। কারণ দক্ষতা ও জ্ঞানই একজন যোগচর্চাকারীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যোগ্যতা।

যে মূল তত্ত্ব ও আদর্শের ভিত্তিতে যোগ প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলি গড়ে ওঠা উচিত এবং এগুলির শিক্ষকদের শিক্ষাদানের মান নির্ধারিত হওয়া উচিত তার মধ্যে একটা সমাঞ্জস্য গড়ে তোলাই যোগ প্রতিষ্ঠানগুলির শংসিতকরণ প্রকল্পটির লক্ষ্য।

এখানে শংসিতকরণের ক্ষেত্রে শিক্ষকদের শিক্ষণ প্রণালীই বিচার্য, তারা কোন প্রতিষ্ঠান থেকে প্রশিক্ষণ পেয়েছেন সেটা নয়। নিবিড় অনুশীলনভিত্তিক যে শৈলী মানব-শরীর ও মনের ওপর গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করে সেটির ব্যাপারে একেবারে শুরু থেকেই কড়াকড়িভাবে নিয়মকানুন স্থির করে দেওয়া উচিত। তা না হলে একবার এই শৈলী বিভিন্ন বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের মুঠোয় চলে গেলে ভারতীয় পুরাণ ও ধর্মগ্রন্থে যোগচর্চার যে ঐতিহ্য বর্ণিত হয়েছে তা রক্ষা করা মুশকিল হবে। যোগচর্চার আদি রূপকে অক্ষুণ্ণ রাখতে শংসিতকরণ প্রক্রিয়ার পাঠ্যসূচি তৈরির মাধ্যমে একটা সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে।

শংসিতকরণের ব্যবস্থা যাতে আন্তর্জাতিক-মহলের কাছে গ্রহণযোগ্য হয় তা সুনিশ্চিত করতে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রচলিত সেরা নিয়মবিধি গ্রহণ তথা শ্রেষ্ঠ আন্তর্জাতিক মাপকাঠি ও শংসিতকরণ ব্যবস্থা অনুযায়ী এই প্রকল্পের নকশা তৈরি করা হয়েছে। এতে যোগ শিক্ষায় ইচ্ছুক যে কোনও ব্যক্তি এবং যোগ প্রশিক্ষকের শিক্ষার মধ্যে সামঞ্জস্য সুনিশ্চিত করা যাবে।

যোগ প্রতিষ্ঠানগুলির ক্ষেত্রে শংসিতকরণের প্রক্রিয়া এমন এক মাপকাঠির সাহায্যে স্থির করা হয়েছে যেখানে গুরুত্ব পান শিক্ষার্থীরা। সেই সঙ্গে প্রতিষ্ঠানে গৃহীত বিভিন্ন ব্যবস্থার ফলাফলের ওপরও জোর দেওয়া হচ্ছে এতে। পঠন-পাঠনের ক্ষেত্রে সব ধরনের বিকল্প পেশ করার ওপরই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এই মাপকাঠিতে। প্রতিষ্ঠানের দক্ষতাই যেহেতু এখানে মূল বিচার্য বিষয় তাই এই প্রকল্পে যোগ পাঠ্যসূচির রূপরেখা তৈরি, সেটির ঘষামাজা ও প্রয়োগ তথা জ্ঞান ও দক্ষতার যথাযথ পরীক্ষা ও মূল্যায়নে প্রতিষ্ঠানগুলিকে সাহায্য করা হবে। এই প্রকল্পের রূপরেখা এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যে, এতে যোগ শিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলি আলাদা-আলাদাভাবে নিজস্ব ঐতিহ্য বজায় রাখার ক্ষেত্রে উৎসাহ পাবে। প্রতিষ্ঠানগুলিতে যে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে তার ফলাফলের ওপরই মূলত গুরুত্ব দেওয়া হবে।

কোনও ব্যক্তিবিশেষ বা প্রতিষ্ঠানকে তাদের দক্ষতাপূরণ তথা দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য কোনও পেশাদার যোগচর্চাকারী বা যোগ প্রতিষ্ঠান বেছে নেওয়ার কাজে সাহায্য করাই এই উদ্যোগের লক্ষ্য।

যোগচর্চাকারী পেশাদার এবং যোগ প্রতিষ্ঠানগুলির শংসিতকরণের প্রকল্পগুলি পরিচালনা করবে QCI এবং এই কাজে তৃতীয় পক্ষের মাধ্যমে মূল্যায়নের আন্তর্জাতিক নীতি মেনে চলা হবে। যোগচর্চাকারী পেশাদার/যোগ প্রতিষ্ঠানগুলিকে দক্ষতার ক্ষেত্রে যে শর্ত পূরণ করতে হবে তার রূপরেখা নির্ধারণ থেকে শুরু করে শংসিতকরণ ব্যবস্থা গঠনের মাধ্যমে মূল্যায়ন পদ্ধতির সংজ্ঞা নিরূপণ এবং তারপর দক্ষতা নির্ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় শর্তগুলি বিধিবদ্ধ করা ও স্বীকৃতিদানের মাধ্যমে মূল্যায়নকারী সংস্থাগুলির পরিচালনার পদ্ধতি বেঁধে দেওয়া পর্যন্ত চলবে এই পুরো প্রক্রিয়া।

এই প্রকল্পের রূপরেখা তৈরি করতে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞদের নিয়ে 'মাল্টিস্টেক হোল্ডার' কমিটি গঠন করেছে কোয়ালিটি কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া (QCI)। যোগচর্চাকারী, যোগ প্রতিষ্ঠান, আয়ুষ ও বাণিজ্য মন্ত্রক, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, উপভোক্তা সংস্থা, শংসিতকরণের সম্ভাব্য সংস্থার প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠন করা হয়েছে এই ধরনের কমিটি। শংসিতকরণের কাজে সামগ্রিকভাবে পরামর্শ দেওয়ার জন্য উপদেষ্টা কমিটিও রয়েছে।

যোগচর্চাকারী পেশাদারদের শংসিত-করণের প্রকল্পের ক্ষেত্রে QCI-এর নিম্নলিখিত স্তরবিন্যাস রয়েছে।

(১) **পরিচালন ব্যবস্থার কাঠামো :** অংশ-গ্রহণকারী সংস্থা এবং কমিটির (যদি থাকে) কাঠামো, বিভিন্ন অংশ, কাজের দায়িত্ব ও ভূমিকা।

(২) **শংসাপত্র পাওয়ার যোগ্যতা :** বিশেষজ্ঞদের নিয়ে গঠিত কারিগরি কমিটির সঙ্গে আলাপ-আলোচনা সাপেক্ষে শংসিতকরণের মানদণ্ড স্থির করা হবে।

(৩) **শংসিতকরণ প্রক্রিয়া :** প্রাথমিক মূল্যায়ন, কত দিন অন্তর নজরদারি হচ্ছে সে বিষয়টি, মূল্যায়নকারীদের প্রয়োজনীয়তা।

(৪) **শংসিতকরণের সংস্থার প্রয়োজনীয়তা :** শংসিতকরণ সম্পর্কিত সমস্ত তথ্য দিয়ে একটি বিশেষ ওয়েবসাইট চালু করা হয়েছে। সেটি হল—
www.yogacertification.qci.org.in

বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা তথা শংসাপত্রপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের উৎসাহদান

QCI-এর এই প্রকল্পে সহায়তা করার পাশাপাশি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মঞ্চগুলিতে এই প্রকল্পকে তুলে ধরতে এগিয়ে এসেছে ভারত সরকার। সফল যোগচর্চাকারীদের যে শংসাপত্র দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে তাতে আয়ুষ মন্ত্রকের প্রতীক থাকার ফলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিশ্বাসযোগ্যতা বাড়ে। শুধু তাই নয় এই প্রতীক তাঁকে একটা আলাদা সম্মানও দেয়।

সরকারি নিয়োগের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেওয়া-সহ বিভিন্নভাবে যোগচর্চাকারীদের উৎসাহিত করতে চাইছে সরকার। যোগচর্চাকারীদের নিজস্ব দক্ষতাকে QCI পেশাদার শংসিতকরণ প্রকল্পের আওতায় শংসিত করিয়ে নেওয়ার আহ্বানও জানিয়েছে সরকার। সেই সঙ্গে সরকারের পক্ষ থেকে সিবিএসই, কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের মতো বিভিন্ন শিক্ষা পর্ষদের কাছে এই মর্মে অনুরোধ জানানো হয়েছে যে যোগশিক্ষক নিয়োগের সময় যেন এই শংসাপত্র জমা নেওয়া হয়। শংসিতকরণের উদ্দেশ্যে এ দেশে কোন ব্যক্তি আসতে চাইলে সহজে ভিসা প্রদানের ব্যবস্থা করা বা ভিসার অর্থ মকুব করা কিংবা এ ব্যাপারে নিয়ম-কানুন শিথিল করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে স্বরাষ্ট্র ও বিদেশ মন্ত্রককে। বিদেশে যোগ সংক্রান্ত সমস্ত নিয়োগের ক্ষেত্রে যোগ প্রকল্পের আওতায় বেঁধে দেওয়া সমস্ত শর্ত পূরণ করতে হবে বলে ঘোষণা করার ব্যাপারে 'দ্য ইন্ডিয়ান কাউন্সিল ফর কালচারাল রিলেশনস' (ICCR)-কে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

প্রথম বারের প্রচেষ্টায় যে ২০০০ জন আবেদনকারী সফল হয়েছেন QCI-এর মাধ্যমে তাদের ১০০ শতাংশ ফি ফেরৎ দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছে ভারত সরকারের আয়ুষ মন্ত্রক। এই প্রকল্পের এক বড় সাফল্য এটি।

যোগ পেশাদারদের শংসিতকরণের প্রকল্পটিকে বিশ্বজুড়ে চালু করতে পেরে QCI অত্যন্ত আনন্দিত। QCI-এর একটি দল জাপানে গিয়ে আবেদনকারীদের মধ্যে মূল্যায়ন চালিয়ে ১৩ জন যোগ পেশাদারকে এই প্রকল্পের আওতায় শংসাপত্র প্রদান করেছে।

মনে করা হচ্ছে যে আগামী দিনে QCI-এর যোগ প্রকল্পের আওতায় শংসাপত্র না থাকলে যোগ পাঠ্যসূচি পরিচালনকারী বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথাগত ও প্রথা-বহির্ভূত যোগ প্রতিষ্ঠান, বিদ্যালয়, হেল্‌থ রিসর্ট, স্পা, যোগ রিসর্টগুলি কোনও যোগ পেশাদারই নিয়োগ করতে পারবে না।❑

সহায়ক সূত্র :

(১) পতঞ্জলি—যোগশাস্ত্রের অন্যতম প্রবক্তা। তৃতীয় থেকে পঞ্চম খ্রিস্টপূর্বাব্দ—এই সময়ের মধ্যে তিনি বেঁচে ছিলেন। যোগসূত্রগুলিকে তিনিই সংকলিত করেছিলেন। যোগের মৌলিক দর্শন এবং মন চেতনার দার্শনিক ব্যাখ্যার জন্য তিনি বিশেষভাবে স্মরণীয়।

(২) ভারতের দুই শ্রেষ্ঠ মহাকাব্যের মধ্যে একটি। অপরটি রামায়ণ।

(৩) ভগবৎ গীতা মহাভারতের একটি অংশ এবং এর আঠেরোটি অধ্যায় রয়েছে। যোগের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কিছু ভাষ্য এবং পতঞ্জলির যোগসূত্রের উল্লেখ রয়েছে এখানে।

(৪) পতঞ্জলির অষ্টাঙ্গ যোগের অন্তিম লক্ষ্য হল কৈবল্য, যখন মানব জীবনের সমস্ত দুঃখ-যন্ত্রণার অবসান ঘটবে।

(৫) ড. জে যোগেন্দ্র ও অন্যান্য, ২০১৬, নিবন্ধ, যোগা অ্যাক্রিডিটেশন নর্মস, পৃ.-৫০

(৬) ড. গণেশ রাও, যোগ বিশেষজ্ঞ, কোয়ালিটি কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া

(**লেখক পরিচিতি :** শ্রীসিং কোয়ালিটি কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়ার মহাসচিব এবং শ্রীপাণ্ডে যুগ্ম অধিকর্তা, কোয়ালিটি কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া। ইমেল : sg@qcin.org/singhravip@gmail.com)

বি। শে। ষ। নি। ব। ন্ধ

জীববৈচিত্র্য : একটি সাধারণ ধারণা ও কিছু কর্মকাণ্ড

*পৃথিবীতে মানুষ না থাকলে বৈচিত্র্যময় উদ্ভিদ বা প্রাণী জগতের কোনও ক্ষতি হবে না। কিন্তু এইসব জীব পৃথিবী থেকে হারিয়ে গেলে মানুষের বেঁচে থাকাটাই কঠিন হয়ে পড়বে। অথচ মানব সমাজের উন্নয়নে জীববৈচিত্র্যের ভূমিকাকে সরকারিভাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয় মাত্র এই সেদিন—১৯৯২ সালে, 'জীববৈচিত্র্য চুক্তি'—CBD পেশ করে। CBD চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী বিশ্বের ১৯৬-টি দেশের অন্যতম হল ভারত। জীববৈচিত্র্য সমৃদ্ধ এদেশে নথিভুক্ত উদ্ভিদ প্রজাতির সংখ্যা ৪৫ হাজারেরও বেশি এবং প্রাণী প্রজাতির সংখ্যা প্রায় লক্ষের কাছাকাছি। আর এদেশের ৩ শতাংশেরও কম ভৌগোলিক অঞ্চলের অধিকারী রাজ্য আমাদের এই পশ্চিমবঙ্গে এই সংখ্যা দু'টি যথাক্রমে সাত হাজার ও এগারো হাজারের মতো। এই জীববৈচিত্র্যই আজ সংকটের সম্মুখীন। শুধু পশ্চিমবঙ্গ বা ভারতে নয়, বিশ্ব-জুড়েই এক অবস্থা। এই সংকটের কারণ এবং সেই সূত্রে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ নিয়ে বিশ্ব, দেশ ও রাজ্যে গৃহীত বিবিধ কর্মকাণ্ড নিয়ে বর্তমান নিবন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। আলোচনায় অবশ্যই বিশেষ প্রাধান্য পেয়েছে আমাদের রাজ্য—পশ্চিমবঙ্গ। গত ২২ মে পালিত আন্তর্জাতিক জীববৈচিত্র্য দিবস উপলক্ষে নিবন্ধটি লিখেছেন—***

ড. সৌমেন্দ্রনাথ ঘোষ

Biodiversity বা জীববৈচিত্র্য' কথাটির সঙ্গে আজ অনেকেরই কমবেশি পরিচিত—বিশেষ করে শিক্ষিত মহল। কিন্তু খুব কম মানুষই উপলব্ধি করতে পারেন যে এই 'জীববৈচিত্র্য' আমাদের জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত। আমাদের খাওয়া-পরা-বেঁচে থাকা সবটাই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জীববৈচিত্র্যের উপর নির্ভরশীল। একটাও খাদ্যের কথা ভাবতে পারা যায় না—যেখানে কোনও-না-কোনও উদ্ভিজ বা প্রাণীজ উপাদান নেই। যে সুতোগুলো দিয়ে আমাদের জামা-কাপড় তৈরি হয় তার বেশিরভাগটাই উদ্ভিদ বা প্রাণীসম্পদ নির্ভর এবং সেগুলোই বেশি আরামদায়ক। আমাদের প্রতিদিনের ব্যস্ত-একঘেয়ে জীবন থেকে মন-প্রাণকে আরাম দিতে আমরা ছুটে যাই উন্মুক্ত প্রাকৃতিক পরিবেশে—অচেনা-অদেখা জীবসম্পদের সান্নিধ্য পেতে। আমাদের রোজকার জীবনে বৈচিত্র্যময় উদ্ভিদ-প্রাণীর তাৎপর্য ঠিক এখানেই। অথচ বিষয়টি এখনও অতখানি গুরুত্ব আদায় করতে পারেনি। শুধু বিজ্ঞানী, পরিবেশবিদ এবং অল্প কিছু মানুষের মধ্যেই 'জীববৈচিত্র্য' বিষয়ক আলাপ-আলোচনা এখনও সীমাবদ্ধ।

একটি নির্দিষ্ট সময়ে, একটি নির্দিষ্ট জায়গার জীব-সমষ্টি এবং তাদের বাসস্থানকে একসাথে সেই অঞ্চলের জীববৈচিত্র্য বলা হয়। এর মধ্যে খালি চোখে দেখতে না পাওয়া অকোষীয় বা এককোষী অণুজীব বা জীব যেমন আছে, তেমনই ছোট-বড় গাছ-পালা, পশু-পাখী সবই আছে। আমরা 'মানুষ'-ও এর বাইরে নই। মানুষ এই জীববৈচিত্র্যের একটি উপাদানমাত্র। আর যেহেতু বাস্তুতন্ত্রের (Eco-system) উপর অনেকাংশে নির্ভর করে জীবের প্রকারভেদ—সেই জন্য বাস্তুতন্ত্র-ও জীববৈচিত্র্যের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য একে-অপরের পরিপূরক (সারণি-২)।

পৃথিবীতে মানুষ না থাকলে বৈচিত্র্যময় উদ্ভিদ বা প্রাণী জগতের কোনওই ক্ষতি হবে না। কিন্তু ওই সব জীব পৃথিবী থেকে হারিয়ে গেলে—মানুষের বেঁচে থাকা খুব কঠিন হয়ে যাবে। বিজ্ঞানীরা এই সত্যটি অনুধাবন করে মানুষের জীবনে জীববৈচিত্র্যর গুরুত্ব সম্পর্কে সকলকে জানাতে শুরু করেন গত শতকের আটের দশক থেকে। আটের দশকের শেষদিক থেকে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের পক্ষে জোরালো দাবি উঠতে থাকে। বিশিষ্ট বিজ্ঞানী Dr. E.O. Wilson 'Biodiversity' নামে একটি বই সম্পাদনা এবং প্রকাশ করেন ১৯৮৮ সালে। ক্রমশ পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এই দাবির স্বপক্ষে আওয়াজ জোরাল হয়। অবশেষে ১৯৯২ সালে ব্রাজিলের রিও-ডি-জেনিরো শহরে U.N. Conferance on Environment & Development আয়োজিত বসুন্ধরা সম্মেলনে (Earth Summit) 'জীববৈচিত্র্য চুক্তি' (Convention on Biological Diversity সংক্ষেপে CBD) পেশ করা হয়। এই প্রথম সরকারিভাবে স্বীকৃতি দেওয়া হল মানবসমাজের উন্নয়নে জীববৈচিত্র্যের ভূমিকাকে। কন্‌ভেন্‌শন্‌ অনুযায়ী কোনও দেশের জীবসম্পদের উপর সেই দেশের সার্বভৌম অধিকার। পাশাপাশি দেশের জীবসম্পদ সংরক্ষণ (Conservation) ও তার সুনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার (Sustainable use)-এর দায়িত্ব ও কর্তব্যও সেই দেশের। ভারত ১৯৯৩ সালে এই Convention-এ স্বাক্ষর করে। এখনও পর্যন্ত ১৯৬-টি দেশ (Countries) এই Convention-এ স্বাক্ষর করেছে। ব্যতিক্রম পৃথিবীর সবচেয়ে উন্নত দেশের দাবিদার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

CBD-তে স্বাক্ষরকারী হিসাবে আমাদের দেশের জীবসম্পদের উপর আমাদের সার্বভৌম অধিকার প্রতিষ্ঠিত হল। একইরকমভাবে তার সংরক্ষণ ও নিয়ন্ত্রিত ব্যবহারের দায়িত্বও আমাদের উপরই ন্যস্ত হল। ভারতে যে কাজটি প্রথম করা হয়, তাহল আমাদের দেশে কত ধরনের/প্রকারের জীবসম্পদ আছে তার একটি হিসাব-নিকাশ করা। তারপরের কাজটি ছিল এই সম্পদ সংরক্ষণের একটি পরিকল্পনা এবং তা বাস্তবায়নের রূপরেখা তৈরি করা। অবশেষে, ২০০২ সালে একটি আইন প্রণয়ন—জীববৈচিত্র্য আইন (The Biological Diversity Act) এবং ২০০৪ সালে এ সম্বন্ধীয় নিয়মাবলী (The Biological Diversity Rules) প্রকাশ। এই আইন প্রণয়নের প্রধান উদ্দেশ্য তিনটি—জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, জীববৈচিত্র্যর সুনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার নিশ্চিত করা এবং জীবসম্পদ ব্যবহারে উদ্ভুত লাভের সুষম বণ্টন সুনিশ্চিত করা। এই আইন বাস্তবায়নের জন্য দেশে একটি ত্রিস্তরীয়

কাঠামো তৈরি করা হয়। জাতীয় স্তরে—জাতীয় জীববৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষ (National Biodiversity Authority), রাজ্য স্তরে—রাজ্য জীববৈচিত্র্য পর্ষদ (State Biodiversity Board) এবং স্থানীয় স্তরে (Local Body)—জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা সমিতি (Biodiversity Management Committee)। ২০০৩ সালে জাতীয় জীববৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠিত হয়—যাঁরা বর্তমানে কাজ করছেন চেন্নাই শহর থেকে। এই কর্তৃপক্ষের উপরই প্রধান দায়িত্ব—দেশের জীববৈচিত্র্য সম্পর্কে যে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার এবং কেন্দ্রীয় সরকারকে এই বিষয়ে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেওয়ার।

ভারতবর্ষের মাত্র ২.৭ শতাংশ জায়গা জুড়ে আছে পশ্চিমবঙ্গ। অথচ এখনও পর্যন্ত যত সংখ্যক জীব তালিকাভুক্ত হয়েছে সারা দেশ থেকে তার প্রায় ১২ শতাংশের হদিস পাওয়া গেছে পশ্চিমবঙ্গে থেকেও। বিভিন্ন রকম প্রাকৃতিক পরিবেশ—বরফ ঢাকা পাহাড়, তরাই, নদী-নালা বাহিত সমভূমি, রুক্ষ-শুষ্ক লালমাটির অঞ্চল, উপকূল অঞ্চল—পশ্চিমবঙ্গের জীববৈচিত্র্যকে করেছে সমৃদ্ধ। এখনও পর্যন্ত প্রায় ১১০০০ (সারণি-২ দ্রষ্টব্য) প্রজাতির প্রাণী ও প্রায় ৭০০০ (সারণি-১ দ্রষ্টব্য) প্রজাতির উদ্ভিদ তালিকাভুক্ত করা গেছে। রাজ্যের অর্থনীতি কৃষিনির্ভর। প্রচুর সংখ্যক মানুষের বিশেষত, গ্রামের দরিদ্র পিছিয়ে পড়া শ্রেণির খাবার, ওষুধ-পত্তর ও জীবন ধারণ (Livelihood) এখনও সরাসরি বৈচিত্র্যময় উদ্ভিদ-প্রাণীর উপরই নির্ভরশীল (সারণি-২ দ্রষ্টব্য)।

এই জীববৈচিত্র্য আজ সঙ্কটের সম্মুখীন। শুধু পশ্চিমবঙ্গ বা ভারতে নয়, বিশ্বজুড়েই এক অবস্থা। তার মূল কারণ আবার আমরা—মানুষ। সেই জন্যই এই বিষয় নিয়ে এত আলাপ-আলোচনা-পরিকল্পনা। সমস্যা-গুলোও কম-বেশি একই ধরনের।

জনসংখ্যার চাপ বা জনবসতির ঘনত্ব পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে এক অনন্য সমস্যা। বিপুল সংখ্যক মানুষের থাকা-খাওয়ার সংস্থান করতে বাস্তুতন্ত্রের চরিত্র পাল্টে যাচ্ছে। বনভূমি পরিণত হচ্ছে কৃষিজমি বা চারণভূমিতে। কৃষিজমিতে উঠছে ঘর-বাড়ি। জলাভূমিও বাদ যাচ্ছে না। ফলে বাস্তুতন্ত্রের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হচ্ছে সেখানকার উদ্ভিদ-প্রাণী বৈচিত্র্য। সেখানকার আদি

সারণি-১
দেশ ও রাজ্যে এযাবৎ তালিকাভুক্ত উদ্ভিদ বৈচিত্র্য

বিভাগ	প্রজাতি সংখ্যা	
	ভারত	পশ্চিমবঙ্গ
ব্যাকটিরিয়া	৮৫০	৯৬
শৈবাল	৬৫০০	৮৬৫
ছত্রাক	১৪৫০০	৮৬০
লাইকেন	২০৫১	৬০০
ব্রায়োফাইটা	২৮৫০	৫৫০
টেরিডোফাইটা	১২০০	৪৫০
ব্যক্তবীজী	৬৪	২১
গুপ্তবীজী	১৭৫০০	৩৫৮০
মোট	**৪৫৫১৫**	**৭০২২**

সূত্র : স্যানাল ইত্যাদি, ২০১২

সারণি-২
দেশ ও রাজ্যে এযাবৎ তালিকাভুক্ত প্রাণীবৈচিত্র্য

বিভাগ	প্রজাতি সংখ্যা	
	ভারত	পশ্চিমবঙ্গ
প্রোটোজোয়া	৩৫০০	১১৩৬
পরিফেরা	৫০০	১৬
সিডারিয়া	১০৪২	২৩
সিটেনোফোরা	১২	২
প্ল্যাটিহেলমিনথেস	১৬৫০	২৪৮
গ্যাসট্রোট্রিচা	১০০	২৪
কিনোহাইনচা	১০	৫
নেমাটোডস	২৯০২	৩০৬
সিপানকিউলা	৩৫	৩
মোলাসকা	৫১৫২	২৭৪
একোওরা	৪৩	৩
এ্যানেলিডা	১০০০	১৯৪
এ্যানথ্রোপোডা	৭৪১৭৫	৬৭৮৫
ব্রাইজোয়া (বিশুদ্ধ জল)	২০০	৯
ইকিনোডারমাটা	৭৭৯	২২
হেমিকরডাটা	১২	১
মৎস্য	৩০২২	৬১০
উভচর	৩৪২	৩৯
সরীসৃপ	৫২৬	১৪৮
পক্ষী	১২৩৩	৮৪৬
স্তন্যপায়ী	৪২৩	১৮৮
মোট	**৯৬৬৫৮**	**১০৮৮২**

সূত্র : স্যানাল ইত্যাদি, ২০১২; পাণ্ডে এবং অরোরা, (Eds.) ২০১৪

বাসিন্দাদের মধ্যে যারা পারছে তারা অন্য জায়গা খুঁজে চলে যাচ্ছে, যারা পারছে না তারা চিরতরে হারিয়ে যাচ্ছে। পাশাপাশি, রাসায়নিক ও প্রযুক্তি নির্ভর প্রকৃতি-পরিবেশ নির্বিশেষে একই ধরনের চাষ পদ্ধতির সৌজন্যে আমরা হারিয়ে ফেলেছি আমাদের ধানের/মাছের বিভিন্নতা/ ভবিষ্যতের জন্য যা একেবরেই বাঞ্ছনীয় নয়।

যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির ফলে এবং মানুষের রুচির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ইচ্ছেয় বা আমাদের অজান্তে কোনও প্রজাতির অণুজীব-উদ্ভিদ-প্রাণী আর এক জায়গায় সীমাবদ্ধ থাকছে না—ছড়িয়ে পড়ছে বিভিন্ন বাস্তুতন্ত্রে। অনেকক্ষেত্রেই তারা নতুন বাস্তুতন্ত্রে খুব তাড়াতাড়ি মানিয়ে নিয়ে দ্রুত বংশবৃদ্ধি করছে, আর সেখানকার আদি বাসিন্দাদের স্থানচ্যুত করছে। স্থানচ্যুত জীবদের দেখা দিচ্ছে অস্তিত্ব-সংকট। যেমন, কচুরীপানা—বিদেশ থেকে আমাদের দেশে আনা হয়েছে। এখন এটি একটা সমস্যা। কচুরীপানা নেই এমন জলাশয় দেখতে পাওয়া ভার এবং ঠিকঠাক নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলে তা খুব তাড়াতাড়ি পুরো জলাশয়ে বিস্তার লাভ করে। তাতে সেই জলাশয়ের আদি বাসিন্দাদের বেঁচে থাকা খুব কঠিন হয়ে পড়ে।

ক্রমবর্দ্ধমান দূষণ জীববৈচিত্র্য বিলোপের আর একটি প্রধান কারণ। বিশ্ব উষ্ণায়ণের প্রভাব আমাদের পশ্চিমবঙ্গও এড়াতে পারে না। অসহনীয় গরম, অনিয়মিত বৃষ্টিপাত, অসময়ের স্বল্পস্থায়ী প্রবল বৃষ্টি—সঙ্গে ঝড়ের তাণ্ডব, অল্প কয়েকদিনের জন্য ঠাণ্ডা—এসবই তার নিদর্শন। এর প্রতিকূল প্রভাব পড়ছে জীববৈচিত্র্যের উপর। বড়-বড় নদ-নদী বছরের বেশিরভাগ সময়েই থাকছে প্রায় জলশূণ্য। এবছর তো গঙ্গার জলস্তর এতটাই নিচে নেমেছে যে বন্ধ করে দিতে হয়েছিল তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র। তার উপর আছে কৃষিক্ষেত্রে অতিমাত্রায় ব্যবহৃত রাসায়নিক সার-ওষুধ। যেগুলি জলে ধুয়ে পড়ছে বিভিন্ন জলাশয়েই। তাছাড়াও আছে কারখানা বা অন্যান্য জায়গার জলবাহিত বর্জ্য। একে জলের স্বল্পতা, তার উপর রাসায়নিক জলের জীবদের অবস্থাকে করে তুলেছে সঙ্গীণ। এছাড়াও আছে লাগামছাড়া বিভিন্ন আকার-প্রকারের প্লাস্টিক বা ওই ধরনের অবিয়োজিত জিনিসের ব্যবহার। যা জলে-স্থলের

সারণি-৩
রাজ্যে দানাশস্য ব্যতীত অন্যান্য ফসলের বৈচিত্র্য

		সংখ্যা			সংখ্যা
সব্জি	আলু	২+	**মশলা**	লঙ্কা	১২
	বেগুন	২৫		আদা	২+
	বাঁধাকপি	১৮	**বাগিচা**	নারকেল	৫
	ফুলকপি	২২	**শস্য**	সুপারী	৩
	টমেটো	১৭	**তন্তু**	পাট	২
	ট্যাঁরস	১৫	**শস্য**	মেসটা	১০
	শশা	১১	**ফুল**		অসংখ্য প্রকার
ফল শস্য	আম	১৫০+	**ওষধি উদ্ভিদ**		৭৫০ বাণিজ্যিকভাবে সংগৃহীত
	কলা	২৫			
	পেয়ারা	৮			
	আনারস	৬			
	লিচু	৭			

সূত্র : ঘোষ, এ.কে., ২০১৩

সারণি-৪
এযাবৎ রাজ্য জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা কমিটি প্রস্তুতি

জেলার নাম	**ব্লক/পঞ্চায়েত সমিতি**		**পৌরসভা/কর্পোরেশন**	
	ব্লক সংখ্যা পঞ্চায়েত সমিতি	**জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থা-পনা কমিটি সংখ্যা**	**পৌরসভা সংখ্যা/ কর্পোরেশন**	**জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থা-পনা কমিটি সংখ্যা**
দার্জিলিং	১২	৬	৫	২
জলপাইগুড়ি	৭	১	৩	—
আলিপুরদুয়ার	৬	২	১	—
কোচবিহার	১২	৭	৬	১
উত্তর দিনাজপুর	৯	২	৪	২
দক্ষিণ দিনাজপুর	৮	৪	২	—
মালদা	১৫	১৫	২	২
মুর্শিদাবাদ	২৬	৭	৭	২
পুরুলিয়া	২০	৩	৩	—
বাঁকুড়া	২২	১২	৩	—
বীরভূম	২০	৬	৬	১
নদীয়া	১৭	১৫	১০	৬
বর্ধমান	৩১	১৬	১১	২
হুগলী	১৮	৫	১২	৪
হাওড়া	১৪	৬	৩	—
উত্তর ২৪ পরগণা	২২	৩	২৮	৫
দক্ষিণ ২৪ পরগণা	২৯	১৩	৭	১
উত্তর মেদিনীপুর	২৫	২২	৫	৩
পশ্চিম মেদিনীপুর	২৯	২২	৮	১
মোট	**৩৪৩**	**১৬৭**	**১২৭**	**৩০**

জীববৈচিত্র্য বেঁচে থাকার পরিপন্থী। অনেক সময়েই শোনা যায় কোনও জায়গার হঠাৎ হঠাৎ গবাদিপশু মারা যাচ্ছে। তাদের অনেকের পেট থেকেই বেরিয়েছে প্লাস্টিকের প্যাকেট বা ওই ধরনের জিনিস। আর দূষণকে শোষণ করে আমাদের পরিবেশকে বাসযোগ্য করে তোলে যে গাছপালা, তাদেরকে ধ্বংস করেই আমরা আরও দূষিত করে তুলছি আমাদের চারপাশ। শুধু আমাদের নয়, টিকে থাকা দুষ্কর হয়ে পড়ছে সমগ্র জীবজগতের।

অন্যতম কারণ না হলেও, দারিদ্র্য জীববৈচিত্র্য ধ্বংসের একটি বড় কারণ। গরিব মানুষ, বিশেষ করে যারা জঙ্গল বা জঙ্গলের আশেপাশে থাকে, নিজেদের বেঁচে থাকার তাগিদেই বনের গাছপালা কাটে। গরু-ছাগলকে চরতে পাঠায় জঙ্গলে। জেনে বা না জেনে নষ্ট করে অনেক অমূল্য বনজসম্পদ। সুন্দরবনের খাঁড়ি-নদীর জলে জীবনকে বাজি রেখে 'মীন' ধরে অনেক মানুষ, বিশেষ করে মহিলারা। যারা চিংড়িচাষ করে তাদের কাছে সেগুলো বিক্রি করে কোনরকমে সংসার চলে। কিন্তু, সেই 'মীন' ধরতে গিয়ে নষ্ট করে ফেলে অসংখ্য অন্যান্য প্রাণীর (ছোট) ডিম ও বাচ্চা। জীবিকা নির্বাহের অন্য পন্থা না দেখানো পর্যন্ত তাদের এই অভ্যাস চলতে থাকবে।

শুধু জনসংখ্যার চাপ নয়, আমাদের আকাশ-ছোঁয়া চাহিদা, লোভ, জীবনশৈলীর পরিবর্তন জীববৈচিত্র্য ধ্বংসের একটি প্রধান কারণ। আমরা চাই তাৎক্ষণিক লাভ। তার জন্য প্রকৃতি থেকে আহরণ করছি যথেচ্ছ জীবসম্পদ, যেন-তেন প্রকারে। ব্যবহার করছি অনিয়ন্ত্রিতভাবে, ভবিষ্যতের কথা না ভেবেই। মাঠে-ঘাটে বনে-জঙ্গলে প্রচুর ঔষধি গাছ পাওয়া যায়, যার বেশিরভাগই চাষ হয় না। অথচ সেগুলো যথেচ্ছভাবে আমরা সংগ্রহ করছি, উৎপাদনশীলতার কথা না ভেবেই, তাৎক্ষণিক লাভের আশায়। অনেক গাছের ফল বা বীজ পেড়ে নিচ্ছি একেবারে গাছ খালি করে। আমাদের প্রথা ছিল বছরের একটা সময়ে ইলিশ মাছ না ধরা বা না খাওয়ার। তা ইলিশ মাছের বংশবৃদ্ধিকে নিশ্চিত করত। এখন শত প্রচারেও ইলিশ মাছ ধরা বন্ধ হয় না। আইন করেও বন্ধ করা যায় না ৫০০ গ্রামের কম ওজনের ইলিশ ধরা, বিক্রি বা কেনা। শহরের মধ্যে বা শহর-লাগোয়া জায়গায় একটুও ফাঁকা জমি বা ছোট জলাশয় বাকি থাকে না বাড়ি তৈরি হতে।

এতসব নেতিবাচক কারণ থাকা সত্ত্বেও জীববৈচিত্র্যের নিরিখে পশ্চিমবঙ্গের স্থান অনন্য। ভারতের আয়তনের মাত্র ২.৭ শতাংশ জায়গা নিয়ে থাকা এই রাজ্যে ভারত থেকে লিপিবদ্ধ হওয়া জীবসম্পদের প্রায় ১২ শতাংশ এখানে পাওয়া যায়। তা সম্ভব হয়েছে এখানকার প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যের জন্য। পাহাড়, তরাই, নদী বিস্তৃত সমভূমি, লাল কাঁকুড়ে মাটির অঞ্চল, বালুকাময় এবং কাদামাখা উপকূল পশ্চিমবঙ্গকে করে তুলেছে জীবসম্পদে সমৃদ্ধ। নথিভুক্ত প্রায় ১১০০০ প্রজাতির প্রাণী এবং ৭০০০ প্রজাতির উদ্ভিদের মধ্যে অনেক প্রজাতিই এখন সংকটের মুখে। ২০১২ সালের একটি পরিসংখ্যানে উল্লেখ আছে ১৫২ প্রজাতির উদ্ভিদ ও ১২০ প্রজাতির প্রাণীর অস্তিত্ব সঙ্কটাপন্ন। সাম্প্রতিক আর একটি নথি থেকে জানা যাচ্ছে যে, ১৯৮৫-২০০৫ সালের মধ্যে ৭-টি স্তন্যপায়ী, ১৪-টি পাখী এবং ১৩-টি মাছের প্রজাতি আর পশ্চিমবঙ্গে দেখা যাচ্ছে না।

পশ্চিমবঙ্গের কৃষিবৈচিত্র্যও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, বিশেষ করে ধানের বৈচিত্র্য। 'সবুজ-বিপ্লব' পূর্ববর্তী সময়ে এই অঞ্চলে প্রায় ৫৫০০ ধরনের ধানের অস্তিত্ব ছিল বলে জানা যায়। ২০০৭ সালের একটি হিসাব দেখাচ্ছে সংখ্যাটি এসে ঠেকেছে ৪৬৭-তে। এছাড়া অন্যান্য সবজী-ফুল-ফলের বৈচিত্র্যেও এই রাজ্য সমৃদ্ধ।

এই জীববৈচিত্র্যর উপর নির্ভর করে অনেক মানুষের জীবন ধারণ। এখনও রাজ্যের কমবেশি ৬৫ শতাংশ মানুষের নির্ভরশীলতা কৃষির উপর। প্রায় ১৫ লক্ষ মানুষ জলজ প্রাণীসম্পদের উপর তাদের জীবন-জীবিকা নির্বাহ করেন। এর পাশাপাশি আছে বনজসম্পদ, প্রাণীজসম্পদ, ঔষধী গাছপালা ইত্যাদি আরও অনেক জীবসম্পদ। তথ্য বলছে প্রায় ১০,০০০ মানুষ শুধুমাত্র ফুলঝাড়ু ব্যবসার সাথে যুক্ত। সুস্বাদু কাঁকড়া (Mucrab)-র উপর নির্ভরশীলতা প্রায় এক লক্ষ মানুষের। একটি পরিসংখ্যান বলছে পশ্চিমবঙ্গে জীবসম্পদের বাজার বছরে প্রায় দুই লক্ষ কোটি। এর বাইরে আছে প্রকৃতি বা জীবসম্পদ নির্ভর ট্যুরিজম। এই ধরনের অনেক সম্পদ এই রাজ্যে আছে, যার উপযুক্ত ব্যবহার আরও অনেক মানুষের জীবন-জীবিকার সংস্থান করতে পারে।

রাজ্যের ভৌগলিক আয়তনের (৮৮৭৫২ স্কোয়ার কিলোমিটার) ১৩.৩৮ শতাংশ (১১৮৭৯ স্কোয়ার কিলোমিটার) অঞ্চল বনভূমি হিসাবে নির্ধারিত। Dir. of Forest 2013-14

সারণি-৫
এযাবৎ রাজ্যে জন-জীববৈচিত্র্য নথি PBR প্রস্তুতি

সর্বমোট প্রস্তুত হয়েছে	১০০৪-টি নথি
গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে	৫০ "
মৌজা স্তরে	৩৪ "
পৌরসভা	১২ "

রাজ্যের নির্ধারিত জঙ্গল (designated forest)-বহির্ভূত এলাকার জীববৈচিত্র্য দেখা-শোনা (management) ও তার সুনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার (sustainable use) নিশ্চিত করার দায়িত্ব রাজ্য জীববৈচিত্র্য পর্ষদের উপর। জীববৈচিত্র্য আইন অনুসারে ২০০৪ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর পশ্চিমবঙ্গ জীববৈচিত্র্য পর্ষদ (West Bengal Biodiversity Board) তৈরি হয়। শুরু থেকেই পর্ষদ জীববৈচিত্র্য আইন রূপায়ণে সচেষ্ট। আইন অনুসারে প্রত্যেক 'স্থানীয় কর্তৃপক্ষ' (local body)-কে তাদের নিজ এলাকার জন্য একটি 'জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা সমিতি' (Biodiversity Management Committee) গঠন করতে হবে। সেই সমিতির প্রাথমিক কাজ হবে এলাকার মানুষকে দিয়েই সেখানকার 'জন-জীববৈচিত্র্য নথি' (People's Biodiversity Register) তৈরি করা। নথিতে থাকে এলাকার ভূমিচিত্র (landscape) ও ভূমির ব্যবহার; জীবনচিত্র (lifescape)—কৃষি ও পশুপালন-সহ অঞ্চলের উদ্ভিদ ও প্রাণীর হাল-হকিকৎ—তারা কোথায় থাকে, কেমন দেখতে, মানুষের কী উপকার-অপকার করে, স্বাভাবিকভাবেই আছে, না হারিয়ে যাচ্ছে, ইত্যাদি; জনচিত্র (peoplescape)—জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে মানুষজনের উপস্থিতি-পেশা-জীববৈচিত্র্যের উপর তাদের নির্ভরতা, জীববৈচিত্র্য নিয়ে তৈরি হওয়া পরম্পরালব্ধ জ্ঞান ও প্রথা (traditional knowledge and practice) এবং জীববৈচিত্র্য সম্পর্কিত তাদের ধারণা-অনুভূতি-চাওয়া-পাওয়া ইত্যাদি। মৌজা

(revenew village) বা গ্রামপঞ্চায়েত বা পৌরসভা ধরে ধরে তৈরি হওয়া এইসব নথি সেখানকার এক অমূল্য সম্পদ। তার উপর নির্ভর করে অঞ্চলের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা নেওয়া যায়—যা পরিবেশ-জীববৈচিত্র্য রক্ষায় এবং মানুষের জীবন-জীবিকার উন্নয়নে অত্যন্ত উপযোগী। রাজ্য পর্ষদ এই কাজে সহায়কের (Falicitator) ভূমিকা পালন করছে। জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা সমিতি গঠন থেকে জন-জীববৈচিত্র্য নথি তৈরি করা পর্যন্ত প্রতিটি পর্যায়ে পর্ষদ সক্রিয়। এখনও পর্যন্ত রাজ্যে ১৯৫-টি সমিতি গঠিত হয়েছে বিভিন্ন পঞ্চায়েত সমিতি ও পৌরসভায়। ১০২-টি জন-জীববৈচিত্র্য নথি তৈরি হয়েছে এইসব সমিতির মাধ্যমে। আরও প্রায় ৭০-টি জায়গায় এই কাজ চলছে। এই কাজের মধ্যে দিয়ে বেশ কিছু সংখ্যক মানুষকে জীববৈচিত্র্য বিষয়ে সচেতন করা গেছে এবং তাদের মধ্যে অনেকেই জীববৈচিত্র্য রক্ষায় উৎসাহিত করা গেছে। এইসব মানুষের সাহায্যেই জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের কিছু পরিকল্পনা ও তার বাস্তবায়নের কাজ করা হচ্ছে। যার মধ্যে আছে দেশীয় ধান, স্থানীয় মাছ সংরক্ষণ; অঞ্চল থেকে হারিয়ে যাওয়া বা কমে যাওয়া গাছ-পালা ফিরিয়ে আনা; ঠাকুরের থান বা মাজার ঘিরে থাকা ছোটখাট জঙ্গল রক্ষা করা ইত্যাদি। এইসব করতে গিয়ে দেখা গেছে যে জীববৈচিত্র্য বিষয়ে মানুষের সচেতনার অত্যন্ত অভাব এবং তা সকল স্তরের মানুষের মধ্যেই। আমাদের মানসিকতা প্রকৃতি আমাদের বেঁচে থাকার সমস্ত রসদ দেবে, আমরা নিয়েই যাব। প্রকৃতিকে রক্ষা করার দায়িত্ব যে আমাদেরও কিছু আছে—সেটা আমরা মনেই করি না। পর্ষদ এই সচেতনতা বৃদ্ধির কাজে প্রথম থেকেই সক্রিয়। বিশেষ করে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে। তাদের নিয়ে বিভিন্ন আলাপ-আলোচনা, প্রকৃতি-পর্যবেক্ষণ ইত্যাদি প্রায়ই করা হয়। উদ্ভিদ-প্রাণী কিভাবে চেনা যাবে—খুব সাধারণভাবে তার উপর 'মেঠো বই' (field guide) প্রকাশ করা হয়েছে। রাজ্যের জীববৈচিত্র্য নিয়ে বেশকিছু অনুসন্ধানমূলক গবেষণার কাজও পর্ষদ করছে। কত ধরনের ধান এখনও পাওয়া যাচ্ছে এবং কোথায় কোথায়; কত ধরনের মাছ পাওয়া যায়; কত ধরনের ছত্রাক (Fungus) পাওয়া যায় এবং তার কোনগুলো মানুষ ব্যবহার করে; প্রজাপতির হিসাব-নিকাশ; কাঠ ছাড়া অন্যান্য বনজ সম্পদের উপর জঙ্গল ও জঙ্গলের আশেপাশের মানুষের নির্ভরতা কতখানি... ইত্যাদি ইত্যাদি। এই ধরনের গবেষণা-নির্ভর প্রকাশনাও পর্ষদ করে আসছে। জীববৈচিত্র্য আইন ২০০২ অনুযায়ী রাজ্যের জীবসম্পদ নিয়ে যারা ব্যবসা করতে চান বা করছেন তাদের রাজ্য জীববৈচিত্র্য পর্ষদকে জানাতে হবে। তাদের বলতে হবে কী কী জীবসম্পদ ব্যবহার করা হচ্ছে, সেগুলোর প্রাপ্তিস্থল, পরিমাণ এবং ব্যবসার মূল্য। পর্ষদ বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত দেবে। যদি দেখা যায় খুব কমে যাওয়া বিলুপ্তপ্রায় উদ্ভিদ বা প্রাণী নিয়ে ব্যবসার কথা বলা হচ্ছে তাহলে পর্ষদ তার অনুমোদন নাও দিতে পারে। যারা এই ধরনের জীবসম্পদ নিয়ে ব্যবসার অনুমোদন পাচ্ছেন বা পাবেন, তাদের চুক্তিবদ্ধ (agreement) হতে হবে—ব্যবসায়িক লাভের একটি অংশ (সরকার নির্দিষ্ট) জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে ফিরিয়ে দেওয়ার। পর্ষদ এই কাজটিও শুরু করেছে। প্রায় ৭০-টির মত এই ধরনের আবেদন বিচার-বিবেচনার স্তরে আছে। বেশ কয়েকটি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান তাদের লভ্যাংশ বণ্টনে (share) চুক্তিবদ্ধ হয়েছে। 'রাজ্যের জীববৈচিত্র্য তহবিল'-এর সূচনা হয়েছে।

জীববৈচিত্র্য আইন তৈরি হওয়ার (২০০২) এতদিন পরে আমরা বলছি এইসব জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ বিষয়ক কর্মকাণ্ড 'শুরু হয়েছে' বা 'সূচনা মাত্র'। হ্যাঁ, এটাই সত্যি। চিত্রটা শুধু এ রাজ্যের নয়, সমগ্র ভারতের, এমনকি বোধহয় সারা পৃথিবীর। জীববৈচিত্র্য মানুষের জীবনের ভিত্তি। দিনের শুরু থেকে রাত পর্যন্ত প্রতিমুহূর্তে কোন-না-কোনভাবে আমরা এর উপর নির্ভর করি। অথচ আমরা গ্রাহ্য (care) করি না এই দান, উদাসীনতা দেখাই। নিজেদের জীবনের সঙ্গে একে একাত্ম করতে পারি না। আমাদের এই মনোভাব (attitude) জীববৈচিত্র্য নষ্টের সবচেয়ে বড় কারণ। এখন খুব জরুরি সমস্ত পরিকল্পনায় জীববৈচিত্র্যকে অন্তর্ভুক্ত করা। উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলি হতে হবে পরিবেশ-জীববৈচিত্র্য কেন্দ্রিক। এই কারণেই এবছরের ২২ মে পালিত হওয়া আন্তর্জাতিক জীববৈচিত্র্য দিবস (International Day for Biological Diversity)-এর মূল ভাবনা ছিল—'Mainstreaming Biodiversity : sustaining people and their livelihoods'। সকলের সমবেত প্রচেষ্টায় আশা করা যায় পরিবেশ-জীববৈচিত্র্য বিষয়গুলি মানুষের ভাবনা এবং কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রে আসবে অদূর ভবিষ্যতে। তাহলেই আমাদের জীবন-জীবিকার ধারা সুস্থিত হবে। ভবিষ্যত প্রজন্ম সুরক্ষিত থাকবে।❑

(**লেখক পরিচিতি** : লেখক পশ্চিমবঙ্গ জীববৈচিত্র্য পর্ষদ-এর সিনিয়র রিসার্চ অফিসার। ইমেল : sro.wbbb@nic.in)

তথ্য সূত্র :

- Sanyal, A.K.; Alfred, J.R.B.; Venkataraman, K.; Tiwari, S.K. and Mitra, Sangeeta; 2012. Status of Biodiversity of West Bengal. Published by the Director, Zoological Survey of India, Kolkata.
- Ghosh, A.K. (Ed.), 2013. Status of Environment in West Bengal : Second Citizenis Report. Published by ENDEV-Society for Environment and Development, Kolkata.
- Pands, H.K. and Arora, S. (Eds.); 2014. India's Fifth National Report to the Convention on Biological Diversity. Ministry of Environment and Forests, Govt. of India.
- Mathew, Jose T. and Mandal, Rupam (Eds.); 2015. Tradable Bioresources of West Bengal Published by West Bengal Biodiversity Board, Kolkata.
- Directorate of Forests, Govt. of West Bengal; 2015. Annual Report 2013-2014.
- West Bengal Biodiversity Board. www.wbbb.nic.in and different awareness materials.
- National Biodiversity Authority, India; 2004. The Biological Diversity Act, 2002 and Biological Diversity Rules, 2004.

কৃষি ও কৃষকের কল্যাণ : বর্তমান হালহকিকৎ

*বিশ্ব অর্থনীতি মন্দার কবলে। নৈরাজ্যের এই গাঢ় আঁধারে ভারত যেন এক বাতিঘর—লাইটহাউস। বিকাশ হার বৃদ্ধিতে ভারত ইদানীং চিনকেও টপকে গিয়েছে। বিকাশ হার বৃদ্ধিই অবশ্য যথেষ্ট নয়; এই বৃদ্ধির সুফল দেশের প্রতিটি মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া চাই। বর্তমান সরকারের লক্ষ্য তাই সর্বজনীন উন্নয়ন (ইনক্লুসিভ ডেভলপমেন্ট)। এই উদ্দেশ্য হাসিল করতে হলে কৃষি ও কৃষক-এর কল্যাণসাধন জরুরি। কৃষি ও কৃষকের মঙ্গলে সরকারের বেশ কিছু পদক্ষেপ নিয়ে এই নিবন্ধে আলোচনা করেছেন—***জে. পি. মিশ্র**

কৃষি আজও ভারতের অর্থনীতির বৃহত্তম ক্ষেত্র। ২০১৪-১৫তে সার্বিক মোট মূল্য সংযোজনে (ওভারঅল গ্রস ভ্যালু অ্যাডেড) কৃষির অংশভাগ ছিল ১৬.১ শতাংশ। অর্থনীতির ইঙ্গিত বা সংকেতবাহী হওয়া ছাড়াও, খাদ্য ও পুষ্টি এবং কর্মসংস্থানের প্রেক্ষিতে সামাজিক নিরাপত্তার জন্য এই ক্ষেত্র সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কৃষিক্ষেত্র থেকে রুজিরোজগার জোটে দেশের বহু মানুষের। গ্রামাঞ্চলের বেলায় এ কথা আরও বেশি সত্যি। তবে কিনা, কর্মসংস্থানে এই ক্ষেত্রের অংশভাগ কমে যাচ্ছে। ১৯৯৩-৯৪-এ কৃষিতে নিযুক্ত ছিল কর্মীবাহিনীর ৬৪.৮ শতাংশ। আর ২০১১-১২-তে তা দাঁড়ায় ৪৮.৯ শতাংশ। তথাপি, সবচেয়ে বেশি মানুষকে এখনও কাজ যোগায় কৃষি ক্ষেত্রই। শিল্প ও পরিষেবার মতো অর্থনীতির অন্যান্য ক্ষেত্রের তুলনায় কৃষিতে নিযুক্ত কর্মীদের রোজগারপাতি অবশ্য ঢের কম। কৃষক ও কৃষি ক্ষেত্রকে প্রায়শই কম বা বেশি ফলন এবং ফলস্বরূপ ফসলের দামের অনিশ্চয়তার সমস্যার মুখে পড়তে হয়। আবহাওয়ায় রদবদল বাড়ছে। সৌজন্যে জলবায়ু পরিবর্তন। খরা ও বন্যার বাড়বাড়ন্ত এসব সমস্যা মোকাবিলায় সাহায্যের প্রচলিত ব্যবস্থাদিকে নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর বা মামুলি পর্যায়ে নামিয়ে এনেছে। চাষবাসের উপর নির্ভরশীল লক্ষ লক্ষ পরিবারের মঙ্গলের জন্য জোরাল প্রচেষ্টা শুরু করা জরুরি হয়ে দাঁড়িয়েছে। কৃষক কল্যাণের ক্ষেত্রে বেশ কিছু দিকে নজর দেওয়া দরকার। কৃষকদের মঙ্গলের জন্য ব্যবস্থা নেবার পাশাপাশি প্রাতিষ্ঠানিক-প্রচলিত ব্যবস্থাদির ত্রুটিবিচ্যুতি দূর করার উদ্যোগ নেওয়া উচিত। চাই উপযুক্ত প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও আয় বাড়ানোর জন্য চাষির কাছে তা পৌঁছে দেওয়া। খাদ্যশস্য ও অন্যান্য কৃষিপণ্যের জন্য বেড়ে চলা চাহিদা মেটানোও হবে এর লক্ষ্য। উল্লেখ্য, আগামী ২০২০-২১ সালে ২৭ কোটি ৭০ লক্ষ টন খাদ্যশস্য দরকার। আর তৈলবীজের চাহিদা দাঁড়াবে ৭ কোটি ১০ লক্ষ টন। উৎপাদন বৃদ্ধির বর্তমান ভাবগতিক থেকে আঁচ করা চলে যে খাদ্যশস্যের চাহিদা মেটানো সম্ভব হবে। কিছুটা ঘাটতি হবে ডালে। বনস্পতি/রান্নার তেলে অবশ্য টান পড়বে বেজায়। এখন এই তেলের চাহিদার ৬০ শতাংশ মোট আমদানির সুবাদে।

কৃষিতে দক্ষতা বিকাশ এবং আরও বিবিধ ধরনের পেশা বা জীবিকা অর্জনের পথ খুলতে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, চাষিদের ফসলের ন্যায্য দাম, কৃষির সমস্যাদি ঘোচানোর ব্যবস্থার জন্য এক সার্বিক উন্নয়ন প্রচেষ্টা আবশ্যক। এক্ষেত্রে বাজার এবং জমি সংক্রান্ত সংস্কারও অনেকখানি সাহায্য করবে। দেশের পূর্বাঞ্চলে খাদ্যশস্য উৎপাদন বাড়ানোর দিকে বিশেষ নজর দেওয়া চাই। ঝুঁকি কমাতে চাষিদের সাহায্য করতে হবে। আরও বেশি ধরনের কাজকর্মের মাধ্যমে পুবের রাজ্যগুলিতে চাষিদের আয় বাড়ানো দরকার। এজন্য ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। দেখতে হবে এসব ব্যবস্থার সুযোগ যেন চাষির নাগালে আসে। সরকারের নীতি ও কর্মসূচির মূলকথা—কৃষক কল্যাণ। তাদের সমস্যার সুসার ও মঙ্গলের জন্য সরকার বেশি কিছু নতুন ধরনের ও গৎছাড়া উপায় হাতে নিয়েছে। আরও বেশি জমিতে সেচ এবং উন্নত কৃষি উপকরণ যোগানো ছাড়াও, যারপরনাই নজর দেওয়া হচ্ছে শস্যহানি ও পড়তি দামের ঝুঁকি থেকে চাষিকে রেহাই দেবার প্রতি। শস্য বিমা এবং জাতীয় কৃষি বাজার ও ফসলের ন্যায্য দাম মেলার দিকে জোর দেওয়া হয়েছে। জৈব চাষ, সনাতন বা পরম্পরাগত কৃষি, পশুপালন ও মাছ চাষে লাভের অঙ্ক বেশি। কৃষির বৈচিত্রকরণে এসব দিকেও সরকারি কর্মসূচি গুরুত্ব দিয়েছে। অত্যাধুনিক কৃষি প্রযুক্তি ও ফসল বিক্রিবাটার পন্থাপদ্ধতি চাষির কাছে তুলে ধরার জন্য চালু হয়েছে কিসান টিভি চ্যানেল। দেশের অজস্র চাষির কল্যাণ ও তাদের সমস্যা দূর করার জন্য সরকার গত দু' বছরে একগুচ্ছ কর্মসূচি ও প্রকল্প চালু করেছে। এর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে :

(১) **প্রধানমন্ত্রী কৃষি সিঁচাই যোজনা :** ভারতে ৫৫ শতাংশ চাষের জমি জলাভাবগ্রস্ত। এহেন দেশে চাষিদের কল্যাণ হাসিল করতে 'হর খেত কো পানি' এবং 'মোর ক্রপ পার ড্রপ' (প্রতি জলের ফোঁটায় আরও বেশি ফসল) এর জুড়ি নেই। সম্প্রতি চালু হওয়া প্রধানমন্ত্রী কৃষি সিঁচাই যোজনা হর খেত কো পানি এবং মোর ক্রপ পার ড্রপ-এর প্রত্যাশা পূরণে সঠিকভাবেই এই প্রকল্প দ্রুত রূপায়ণে জোর দিয়েছে। সেইসঙ্গে, জল সঞ্চয় এবং তার সুষ্ঠু ব্যবহার

প্রধানমন্ত্রী কৃষি সিঁচাই যোজনা

সূত্র : pmksy.gov.in

বাড়ানোও এর লক্ষ্য। ব্রত পালনের পদ্ধতিতে (মিশন মোড)-এ যোজনা রূপায়িত হবে। সেচের ব্যবস্থা করা হবে ২৮.৫ লক্ষ হেক্টরে। এ বাবদ বরাদ্দ হয়েছে ৪৫১০ কোটি টাকা। এর মধ্যে ত্বরান্বিত সেচ সুবিধা কর্মসূচি (অ্যাকসিলারেটেড ইরিগেশন বেনিফিটস প্রোগ্রাম) এবং প্রধানমন্ত্রী কৃষি সিঁচাই যোজনা—হর ক্ষেত কো পানি খাতে ২০১৫-১৬-র সংশোধিত হিসেবে জলসম্পদ, নদী উন্নয়ন ও গঙ্গাকে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনার মন্ত্রকের (MoWR, RD & GR) ২৫১০ কোটি টাকার অতিরিক্ত অনুদান অন্তর্ভুক্ত। ২০১৬-১৭-র কেন্দ্রীয় বাজেট এই যোজনার অগ্রাধিকার ঠিক করে দিয়েছে। ত্বরান্বিত সেচ সুবিধা কর্মসূচির আওতাভুক্ত ৮৯-টি ঝুলে থাকা সেচ প্রকল্প দ্রুত শেষ করা হবে। এই প্রকল্পগুলি থেকে সেচের সুবিধে পাবে ৮০.৬ লক্ষ হেক্টর জমি। আগামী বছর দরকার হবে ১৭ হাজার কোটি টাকা। তারপরের ৫ বছরে ৮৬ হাজার ৫শো কোটি। ২০১৭-র মার্চের আগে ২৩-টি প্রকল্প সম্পূর্ণ করার লক্ষ্য আছে। নাবার্ডে প্রাথমিকভাবে ২০ হাজার কোটি টাকার একটি দীর্ঘমেয়াদী সেচ তহবিল গড়া হবে। এসব লক্ষ্য পূরণের জন্য ২০১৬-১৭-তে বাজেট বরাদ্দ এবং বাজার থেকে ঋণের মাধ্যমে মোট ১২,৫১৭ কোটি টাকার সংস্থান করা হয়েছে।

জল সংরক্ষণ ও সংগ্রহের জন্য অনেক রাজ্য নতুন নতুন ব্যবস্থা নিচ্ছে। জলাশয় তৈরি ও সংস্কারের জন্য বাণিজ্যিক সংস্থার সামাজিক দায়িত্ব তহবিল কাজে লাগাচ্ছে মহারাষ্ট্রের 'জলযুক্ত শিওয়ার' প্রকল্প। বিন্দু এবং ছোটানো সেচ (ড্রিপ অ্যান্ড স্প্রিংকলার) ব্যবস্থার জন্য কর্নাটক সরকার ভরতুকি বাড়িয়ে দিয়েছে। সেরাজ্যে ক্ষুদ্র সেচে এ ধরনের ব্যবস্থায় কেন্দ্রের ভরতুকির সঙ্গে রাজ্য সরকারের ভরতুকি জুড়ে ১০০ শতাংশ খরচই মিটিয়ে দেওয়া হয়। ক্ষুদ্র সেচের জন্য চাষিদের সঙ্গে হাত মেলানোর অসাধারণ এক ব্যবস্থা করেছে গুজরাত। কেন্দ্রীয় তহবিল থেকে টাকা পেয়ে গুজরাত সবুজ বিপ্লব নিগম ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্প রূপায়ণ করে। প্রথম তিন বছর এই প্রকল্প দেখভালের দায়িত্ব তুলে দেয় চাষিদের হাতে। সেচের জন্য রাজস্থানে অনেক খাল কাটা হয়েছে। খালের পাড় ধসে যাওয়া, খাল বুজে আসা ইত্যাদির দরুন জলের টাটাটানি ঘটে আকছার। সেজন্য ওই রাজ্য কম জল খরচ করে চাষের কাজ মেটাতে স্প্রিংকলার বা ছোটানো সেচে জোর দিয়েছে। জল সংরক্ষণ, সংগ্রহ ও সুষ্ঠু ব্যবহারের জন্য অন্যান্য রাজ্যও খুব অভিনব কিছু ব্যবস্থা রূপায়ণ করেছে।

(২) **প্রধানমন্ত্রী কৃষি বিমা যোজনা :** জাতীয় কৃষি বিমা প্রকল্প ও সংশোধিত জাতীয় কৃষি বিমা প্রকল্প তুলে দিয়ে ২০১৬-র খরিফ মরশুম থেকে চালু হয় প্রধানমন্ত্রী ফসল বিমা যোজনা। আগেকার দুই বিমা প্রকল্প থেকে এ যোজনার ফারাক এই যে সারা দেশে অ্যাকচুয়ারিয়াল প্রিমিয়াম বা কিস্তি বাবদ চাষির দেয় অংশ কমানো হয়েছে। খরিফ খাদ্যশস্য, ডাল ও তৈলবীজের জন্য এক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সীমা বিমাকৃত অঙ্কের ২ শতাংশ। রবি খাদ্যশস্য, ডাল ও তৈলবীজে ১.৫ শতাংশ। আর খরিফ ও রবি বার্ষিক বাণিজ্যিক/বার্ষিক উদ্যানজাত বা হর্টিকালচার ফসলের ক্ষেত্রে ৫ শতাংশ। ২০১৬-১৭ সালের জন্য এ যোজনায় বরাদ্দের অঙ্ক ৫৫০০ কোটি টাকা। ২০১৬-র খরিফ মরশুম থেকে এই প্রকল্প শুরু করার জন্য রাজ্যগুলিকে অনুরোধ করা হয়েছে। এই বিমা যোজনায় প্রাকৃতিক দুর্যোগের জন্য ফসলহানির ঝুঁকি থেকে চাষি অনেকটা রেহাই পাবে।

(৩) **মাটির উর্বরতা কার্ড প্রকল্প বা সয়েল হেলথ কার্ড স্কিম :** সবুজ বিপ্লব শুরু হওয়া ইস্তক দেশে সার ব্যবহার বেড়ে চলেছে। কিন্তু সুসমঞ্জসভাবে নয়, ইউরিয়ার বিক্রি বেড়েছে লাগামছাড়া। ইউরিয়া হচ্ছে নাইট্রোজেনের উৎস। সাতের দশকের গোড়ার দিকে নাইট্রোজেন, ফসফেট ও পটাশ প্রয়োগের গড় অনুপাত ছিল ৬ : ১.৯ : ১। ১৯৯৬-এ তা দাঁড়ায় ১০ : ২.৯ : ১। এরপর অবশ্য কিঞ্চিৎ হলেও এই অনুপাত কমতির দিকে ঝোঁকে। ২০১২-১৩-তেও তা ছিল ৮.২ : ৩.২ : ১। সবার ধারণা, ভারতে চাষিরা বড় বেশি ইউরিয়া ব্যবহার করে। কিন্তু উপরের তথ্য থেকে বোঝা যায় এই মতামত বড় বেশি সাদামাটা। জমি ও ফসলের ধরনধারণ, সেচ বনাম বৃষ্টি নির্ভর এলাকা—এসব মাথায় রেখে আরও সূক্ষ্মভাবে বিষয়টি খতিয়ে দেখা দরকার। সারের সুষ্ঠু ব্যবহারে চাষিকে সক্ষম করে

তুলতে হবে। নিজের জমির গুণাগুণ সম্পর্কে চাষিকে ওয়াকিবহাল রাখতে এখন তাই মাটির উর্বরতা কার্ড প্রকল্প রূপায়িত হচ্ছে। ২০১৭-র মার্চ নাগাদ দেশের ১৪ কোটি কৃষি জোতকেই এই প্রকল্পের আওতায় আনার লক্ষ্য ধার্য হয়েছে। মাটির স্বাস্থ্য ও উর্বরতা সংক্রান্ত জাতীয় প্রকল্প খাতে দেওয়া হয়েছে ৩৬৮ কোটি টাকা। এছাড়া, আগামী ৩ বছরে সার সংস্থাগুলির ২০০০-টি মডেল খুচরো বিক্রয়কেন্দ্রে মাটি ও বীজ পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হবে।

(৪) **পরম্পরাগত কৃষি বিকাশ যোজনা ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলে জৈব চাষ :** দেশে চাষের জমির প্রায় ৫৫ শতাংশ বৃষ্টির দাক্ষিণ্যের উপর নির্ভরশীল। এসব জমিতে ফসল বাড়াতে উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে জৈবচাষে। সরকার দু'টি উল্লেখযোগ্য প্রকল্পে হাত দিয়েছে। প্রথম, পরম্পরাগত কৃষি বিকল্প যোজনা। এই প্রকল্পে ৩ বছরে ৫ লক্ষ একর জমি জৈব চাষের আওতায় আনা হবে। দ্বিতীয়, উত্তর-পূর্বাঞ্চলে জৈব চাষের প্রসার। এই প্রকল্পের লক্ষ্য অনুযায়ী উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলিতে জৈব চাষ বাড়ানো ও মূল্য সংযোজনের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে; যাতে এখানকার জৈব উৎপাদন দেশবিদেশের বাজার ধরতে পারে। এই দু'টি প্রকল্প বাবদ বরাদ্দের অঙ্ক ৪১২ কোটি টাকা।

(৫) **জাতীয় কৃষি বাজার :** মাণ্ডিতে কর ধার্য করার নিয়মকানুনে কোন মাথামুণ্ডু নেই। তদুপরি কর ও লেভির পরিমাণে বাড়াবাড়ির দরুন ফসল বিপণন ব্যবস্থার ভোগান্তির একশেষ। কর ব্যবস্থায় স্বচ্ছতার অভাব। রাজ্যে রাজ্যে কর হারেও রয়েছে ফারাক। ফসলের ন্যায্য দাম পাওয়ার ক্ষেত্রে চাষির কাছে এ এক মস্ত সমস্যা। সমস্যা সামাল দিতে কর্নাটক এক মডেল বানিয়েছে। এই মডেলে এক লাইসেন্স ব্যবস্থার আওতায় আনা হয়েছে বেশ কয়েকটি বাজারকে। এই মডেলকে ভিত্তি করে সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার জাতীয় কৃষি বাজার সংক্রান্ত নয়া প্রকল্প অনুমোদন করেছে। কৃষি-প্রযুক্তি পরিকাঠামো তহবিলের মাধ্যমে ২০১৫-১৬ থেকে ২০১৭-১৮ পর্যন্ত এই প্রকল্প রূপায়ণের জন্য বাজেটে দেওয়া হয়েছে ২০০ কোটি টাকা। কৃষি, সমবায় ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরের আওতাধীন স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা, ক্ষুদ্র চাষি কৃষি-ব্যবসা গোষ্ঠী মারফত জাতীয় কৃষি বাজার (NAM) প্রকল্প কার্যকর করার কথা ভাবা হয়েছে। এই প্রকল্পে এক সর্বভারতীয় বৈদ্যুতিন বাণিজ্য পোর্টাল গড়ে তোলার সংস্থান করা হয়েছে। ফসলের জন্য এক সংযুক্ত জাতীয় বাজার গঠন করার জন্য এই পোর্টাল কিছু বাছাই করা কৃষিপণ্য বিপণন কমিটির নেটওয়ার্ক তৈরি করবে। এই ই-প্ল্যাটফর্মের সুযোগ মিলবে দেশের নির্বাচিত ৫৮৫-টি নিয়ন্ত্রিত পাইকারি বাজারে। গোটা রাজ্যে এক লাইসেন্স, এক বাজার কর এবং দাম মেটানোর জন্য বৈদ্যুতিন নিলাম ব্যবস্থার ক্ষেত্রে সংস্কারে এগিয়ে থাকা রাজ্যগুলি থেকে এসব নিয়ন্ত্রিত পাইকারি বাজার বেছে নেওয়া হবে।

(৬) **দাম স্থিতিশীলতা তহবিল :** ফসলের দামের চটজলদি ওঠাপড়া চাষির কাছে এক বড় সমস্যা। ফসল উঠলে প্রায়শই জলের দামে বেচতে হয়। কঠোর মেহনতের ফল মেলে না। কেনার সময় কিন্তু উলটপুরাণ। চাষিকে তখন তার সাধ্যের অতীত খরচ করতে হয়। পচনশীল কৃষি ও উদ্যানজাত পণ্য সংগ্রহ এবং বণ্টনের জন্য দাম স্থিতিশীলতা তহবিল গড়া হয়েছে। এহেন ফসল সংগ্রহ ও বণ্টন বাবদ চলতি মূলধন (ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল) এবং অন্যান্য ব্যয় যোগানো এই তহবিলের লক্ষ্য। চাষি এবং গ্রাহকের স্বার্থও এতে সুরক্ষিত থাকবে।

(৭) **রাষ্ট্রীয় গোকুল মিশন :** কৃষিক্ষেত্রে মোট মূল্য সংযোজনের ২৫ শতাংশ আসে পশুপালন থেকে। পশুপালন প্রায় ২ কোটি ১০ লক্ষ মানুষকে সুনিযুক্তির সুযোগ দেয়। কৃষিতে দ্রুত বিকাশকারী ক্ষেত্রের অন্যতম এই পশুপালন। এথেকে দুটো বাড়তি পয়সার মুখ দেখে চাষিরা। অভাব-অনটন, বিপদ-আপদেও এ তাদের কাছে এক মুশকিল আসান। দেশি প্রজাতি সংরক্ষণের লক্ষে ২০১৪-১৫-এ রাষ্ট্রীয় গোকুল মিশনের পথ চলা শুরু। দেশি গবাদি প্রাণির উন্নয়নের জন্য সংহত গবাদি পশু উন্নয়ন কেন্দ্র— গোকুল গ্রাম গড়ে তোলার পরিকল্পনাও আছে এই মিশনে। মিশনের জন্য ২০১৩-১৪ থেকে ২০১৬-১৭ ইস্তক বরাদ্দ ৫০০ কোটি টাকা।

(৮) **জাতীয় কামধেনু প্রজনন কেন্দ্র :** দেশি প্রজাতির উন্নয়ন, সংরক্ষণ-সুরক্ষার জন্য উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে একটি করে জাতীয় কামধেনু প্রজনন কেন্দ্র গড়ে তোলা হচ্ছে। এক পূর্ণাঙ্গ ও বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে দেশি প্রজাতির উন্নয়ন ও সংরক্ষণের উৎকর্ষ কেন্দ্র হিসেবে তা কাজ করবে। দেশি গরু-মোষের সব প্রজাতি (৩৯-টি গরু, ষাঁড় ও ১৩-টি মোষ), মিথুন ও ইয়াক সংরক্ষণ এবং উন্নয়ন করা হবে। এদের উৎপাদনশীলতা ও জিনগত গুণমান বাড়ানো এর উদ্দেশ্য। দেশি জার্ম-প্ল্যাজম এর এক ভাণ্ডার হওয়া ছাড়াও, কেন্দ্রটি দেশে সার্টিফায়েড জার্ম-প্ল্যাজম এর উৎস হয়ে উঠবে। এই কেন্দ্র গড়ে তোলার জন্য মধ্যপ্রদেশ ও অন্ধ্রপ্রদেশকে ২৫ কোটি টাকা করে দেওয়া হয়েছে।

(৯) **নীল বিপ্লব :** মাছচাষ ও মৎস্যজীবী বা মেছুয়াদের উন্নয়নের বিস্তর সুযোগ আছে। এটা বুঝে নীল বিপ্লবের আওতায় সংহত মাছচাষ উন্নয়নের প্রকল্প চালু হয়েছে। আগামী ৫ বছরে এ বাবদ বরাদ্দের অঙ্ক তিন হাজার কোটি টাকা।

(১০) **বাজেট সহায়তা :** এসব কাজকর্মে সমর্থন যোগাতে সরকার ২০১৬-১৭-র বাজেটে পর্যাপ্ত সাহায্যের ব্যবস্থা রেখেছে। কৃষি মন্ত্রকের জন্য বরাদ্দ করেছে ৩৫,৯৮৪ কোটি টাকা। এছাড়া, চাষিদের ৯ লক্ষ কোটি টাকা ঋণ দেওয়া হবে। সর্বোপরি, গ্রামে রাস্তাঘাট, বিদ্যুৎ এবং অন্যান্য সামাজিক ক্ষেত্রে লগ্নির উদ্যোগে গ্রামাঞ্চলের ভোল যাবে বদলে—আসবে আমূল পরিবর্তন। মোদ্দাকথা, এসব ব্যবস্থার দরুন চাষিদের কল্যাণ হবে। গ্রাম ভারতে আসবে দীর্ঘস্থায়ী বিকাশ ও সমৃদ্ধি। ❑

(**লেখক পরিচিতি :** লেখক ভারত সরকারের নীতি আয়োগের কৃষি বিষয়ক উপদেষ্টা। ইমেল : mishrajaip@gmail.com)

আন্তর্জাতিক যোগ দিবস

যোগের প্রতি বিশ্বজুড়ে সর্বজনীন আকর্ষণকে স্বীকৃতি দিয়ে রাষ্ট্রসংঘ ২১ জুন তারিখটিকে আন্তর্জাতিক যোগ দিবস হিসেবে ঘোষণা করেছে। আন্তর্জাতিক যোগ দিবস হিসাবে দিনটিকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য ভারত রাষ্ট্রসংঘে খসড়া প্রস্তাব উপস্থাপন করে, এবং নজিরবিহীনভাবে ১৭৫-টি সদস্য দেশ সেই প্রস্তাবের সমর্থন করে। রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ সভার ৬৯তম অধিবেশনের সূচনাকালে নিজের ভাষণে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী প্রথমবার এই প্রস্তাব উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন, "যোগ আমাদের প্রাচীন ঐতিহ্যের অমূল্য উপহার। চিন্তা ও কর্ম, মন ও শরীরের ঐক্যের প্রতিরূপ যোগ... আমাদের সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণের জন্য মূল্যবান এক সর্বাত্মক অভিমুখ। যোগ মানে শুধু ব্যায়াম বা আসন অনুশীলন না; নিজের অন্তরাত্মার সঙ্গে, জগতের সঙ্গে ও প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হওয়ার পথ যোগ।"

যোগ এক প্রাচীন শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক চর্চা পদ্ধতি; যার উৎপত্তি ভারতে। যোগ শব্দের উদ্ভাবন সংস্কৃত থেকে এবং এর অর্থ হচ্ছে 'যোগ করা' বা মিলন ঘটানো, শরীর ও চেতনার ঐক্যের প্রতিরূপ। আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের উদ্দেশ্য যোগচর্চার সুফল নিয়ে সারা দুনিয়ার সচেতনতা বৃদ্ধি করা। ২০১৫ সালে ২১ জুন প্রথমবার আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উদ্‌যাপনের সময় আন্তর্জাতিক মহল থেকে ইতিবাচক সাড়া মেলে ও ইয়েমেন বাদ দিয়ে রাষ্ট্রসংঘের ১৯৩-টি সদস্য দেশে আন্তর্জাতিক যোগ

দিবস পালিত হয়। এ দিন বিভিন্ন দেশে ভাষণ, যোগের প্রচলিত সূত্র অনুযায়ী যোগাসন প্রদর্শন ও গণ অনুশীলন, স্থানীয় যোগ সংস্থার সঙ্গে সাক্ষাৎ, যোগ সঙ্গীতানুষ্ঠান, যোগাথন (একটানা যোগ অভ্যাস), যোগ ভ্রমণ (ওয়াক), চলচ্চিত্র, তথ্যচিত্র ও চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন হয়। ভারত সরকারও গত বছর ২১ জুন সাড়ম্বরে আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উদ্‌যাপন করে—এই উপলক্ষে দেশের সর্বত্র উৎসাহী অংশগ্রহণকারীরা দলে দলে একইসঙ্গে একইসময়ে যোগ অনুশীলন করেন। দু'-দু'টি গিনেস বিশ্ব রেকর্ড সৃষ্টি হয়—বিশ্বের বৃহত্তম যোগ অনুশীলনী অনুষ্ঠান যেখানে ৩৫,৯৮৫ সংখ্যক মানুষ ও ৮৪-টি দেশের নাগরিকরা অংশগ্রহণ করেন। চলতি বছরও এই দিনটাকে উদ্‌যাপন করার জোরদার প্রস্তুতি চলছে।

আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের প্রতীকচিহ্ন (লোগো)-এর তাৎপর্য নিয়ে আলোচনা করা যাক : হাত জোড় করা যোগের প্রতীক, আক্ষরিক অর্থে যোগ বা মিলন, ব্যক্তির চেতনার সঙ্গে সর্বাত্মক চেতনার মিলনের প্রতিরূপ; মন ও শরীর, মানব ও প্রকৃতির মধ্যে পূর্ণাঙ্গ সংহতি; সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণের জন্য এক সর্বাত্মক অভিমুখ। বাদামি রংয়ের পাতা পৃথিবীর প্রতীকস্বরূপ; সবুজ পাতা অর্থাৎ প্রকৃতি; নীলরং জলের স্বরূপ; উজ্জ্বলতা অগ্নির প্রতীক; এবং শক্তি ও অনুপ্রেরণার উৎসের স্বরূপ সূর্য। এই প্রতীকচিহ্নের মাধ্যমে মানবজাতির জন্য সংহতি ও শান্তি প্রতিফলিত হয়, এটাই যোগের মূলমন্ত্র। এতে ২১ জুন তারিখটিরও উল্লেখ রয়েছে। প্রতীকচিহ্নের একেবারে নিচে লেখা আছে—"Yoga for Harmony & Peace" অর্থাৎ 'সংহতি ও শান্তির জন্য যোগ'। ❑

সংকলক : ভাটিকা চন্দ্রা

যো ❖ জ ❖ না ❖ ডা ❖ য়ে ❖ রি

(১ এপ্রিল-২০ মে ২০১৬)

আন্তর্জাতিক

● **ওয়াশিংটনে চতুর্থ পরমাণু নিরাপত্তা শীর্ষ সম্মেলন :**

ওয়াশিংটনে অনুষ্ঠিত হল দু'দিন ব্যাপী (৩১ মার্চ-১ এপ্রিল) চতুর্থ পরমাণু নিরাপত্তা শীর্ষ সম্মেলন। ব্রাসেলস থেকে ভারতের তরফে সম্মেলনে যোগ দিতে ওয়াশিংটন যান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। পরমাণু নিরাপত্তা বিষয়ক এই শীর্ষ সম্মেলনে অংশ নেওয়ার পাশাপাশি মোদী বৈঠক করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার সঙ্গেও।

পরমাণু নিরাপত্তা শীর্ষ সম্মেলনের মূল উদ্দেশ্য বিশ্বকে পারমাণবিক সন্ত্রাস থেকে সুরক্ষিত রাখা। প্রথম সম্মেলনটিও আয়োজিত হয় ওয়াশিংটনে (২০১০)। পরের দু'বছর সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় যথাক্রমে দক্ষিণ কোরিয়ার সোল (২০১২) ও নেদারল্যান্ডসের হেগ (২০১৪)-এ।

নিউক্লিয়ার এনার্জি ইনস্টিটিউট আয়োজিত পরমাণু নিরাপত্তা শীর্ষ সম্মেলনের এই সংস্করণে অংশগ্রহণ করেন রাষ্ট্র/সরকারের প্রধান-সহ মোট ৫৮-টি দেশের প্রতিনিধি। এই পরমাণু নিরাপত্তা শীর্ষ বৈঠকের সমাপ্তি ভাষণে ওবামা বলেন, পারমাণবিক উপাদানের সম্ভার নিরাপদ রাখার জন্য গত ছ'বছর ধরে উল্লেখযোগ্য কাজ করেছে বিশ্বের দেশগুলি। ওবামা-সহ সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিরা সাইবার আক্রমণ থেকে পারমাণবিক সম্পদগুলোর সুরক্ষা আরও মজবুত করতে এবং বিপজ্জনক দ্রব্যগুলো আইএস-এর মতো সন্ত্রাসবাদীদের নাগালের বাইরে রাখতে তথ্য আদান-প্রদানের ব্যবস্থা আরও উন্নত করতে সহমত হন।

● **জৈশ প্রধানকে নিষিদ্ধ করতে বাধা চিনের :**

পাকিস্তানভিত্তিক জঙ্গি সংগঠন জৈশ-ই-মহম্মদকে ২০০১ সালেই নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে রাষ্ট্রসংঘ। মুম্বইতে জঙ্গিহানার পর জৈশ-ই-মহম্মদ প্রধান মাসুদ আজহারকেও নিষিদ্ধ ঘোষণা করার জন্য ভারত রাষ্ট্রসংঘের দ্বারস্থ হয়। সে বারও বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল চিন।

আবারও তাই হল। পাঠানকোটে বায়ুসেনা ঘাঁটিতে জঙ্গি হানার পিছনে জৈশ-এর যোগ থাকার প্রমাণ পাওয়ার পরই, মাসুদ আজহারকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করার জন্য জোরদার দাবি তোলে ভারত। রাষ্ট্রসংঘের সংশ্লিষ্ট কমিটিতে বিষয়টি পেশ করা হয়েছিল। ১ এপ্রিল চিন ভেটো প্রয়োগ করে মাসুদ আজহারকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করার ভারতীয় প্রস্তাব আটকে দেয়। নিরাপত্তা পরিষদের পাঁচ স্থায়ী সদস্য দেশের অন্যতম হওয়ায়, চিনের ভেটো প্রয়োগের ক্ষমতা রয়েছে।

● **লন্ডনের প্রথম এশীয় বংশোদ্ভূত মুসলিম মেয়র সাদিক খান :**

লন্ডনের মেয়র পদের নির্বাচনে (৬ মে হয় ভোট গণনা) ইতিহাস গড়ে জিতে গেলেন লেবার পার্টির সাদিক খান। তিনিই ব্রিটিশ রাজধানীর প্রথম এশীয় বংশোদ্ভূত মুসলিম মেয়র। পেশায় আইনজীবী।

১৯৪৭-এর ভারত ভাগ হওয়ার পরে সাদিকের ঠাকুরদা-ঠাকুমা ভারত থেকে পাকিস্তানে পাড়ি দেন। তারপর সাদিক জন্মানোর আগেই পাকিস্তান থেকে ব্রিটেনে চলে আসেন সাদিকের মা-বাবা। বিদেশে এসে পেট চালানোর জন্য সাদিকের বাবা বেছে নেন বাসচালকের কাজ। আর মা শুরু করেন দর্জির কাজ। অন্যদিকে, তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন কনজারভেটিভ দলের কোটিপতি প্রার্থী জ্যাক গোল্ডস্মিথ—প্রাক্তন পাকিস্তানী ক্রিকেটার তথা বর্তমানে রাজনীতিক ইমরান খানের প্রাক্তন স্ত্রী জেমাইমা গোল্ডস্মিথের ভাই।

● **বাংলাদেশের চমকপ্রদ আর্থিক বিকাশ :**

অর্থনীতির নিরিখে বিশ্বকে চমকে দিল বাংলাদেশ। বিশ্বব্যাংক, এশীয় ব্যাংক-এর তরফে ভাবা হয়েছিল যে বাংলাদেশের বিকাশহার মেরেকেটে ছয়ে পৌঁছবে, কিন্তু বাস্তবে সেই হার সাত পেরিয়ে গেছে। রাজনৈতিক অস্থিরতা ও তারপর বিশ্বমন্দার বাধা পেরিয়ে ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে এই সাফল্য এল পড়শি দেশে।

এখনও কৃষিতে অবদান কম। জনপ্রশাসন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবহণ—এই চারটি স্তম্ভ উন্নয়নের ভিত গড়েছে। সমস্যা বিনিয়োগে। গত বছর ছিল ২২.০৭ শতাংশ। এবার একটু কমে ২১.৭৮ শতাংশ। তা সত্ত্বেও মাথাপিছু জাতীয় আয় বাড়ছে। ১,৩১৬ ডলার থেকে হয়েছে ১,৪৬৬ ডলার। উন্নতির রকম দেখে চমকেছে ইউরোপীয় ইউনিয়নও। বাংলাদেশকে সমীহ করতে শুরু করেছে। অনেক আন্তর্জাতিক সংস্থাই মনে করছে, ২০৫০ সালের মধ্যেই বাংলাদেশ ২৩তম উন্নত অর্থনীতির দেশ হবে। এই সাফল্যের কৃতিত্ব দেওয়া হচ্ছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে। ২০০৯ সালে ক্ষমতায় ফিরেই হাসিনা অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে পা বাড়ান।

● **সাসপেন্ড জিউমা, পালাবদল শুরু ব্রাজিলে :**

ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট পদ থেকে জিউমা হুসেফকে সাসপেন্ড করল সে দেশের আইনসভা। অন্তর্বর্তীকালীন প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব নেন মিশেল তেমের। ব্রাজিলে ভয়াবহ আর্থিক মন্দা ও রাষ্ট্রায়ত্ত তেল সংস্থার কেলেঙ্কারির জেরে হুসেফ সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ শুরু হয়। হুসেফের বিরোধী পক্ষে যোগ দেন তাঁর সরকারের প্রাক্তন ভাইস প্রেসিডেন্ট মাইকেল তেমেরও।

ব্রাজিলের সংবিধান অনুযায়ী, প্রেসিডেন্টের 'ইমপিচমেন্ট'-এ আইনসভা সেনেট সায় দিলে তাকে সাসপেন্ড করা হয়; এর পরে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ খতিয়ে দেখে সেনেট এবং অভিযোগ প্রমাণিত হলে তাঁকে 'ইমপিচ' করা হয়। ভোটাভুটিতে জিউমার বিরুদ্ধে 'ইমপিচমেন্ট'-এর প্রক্রিয়া শুরুতে সায় দিয়েছে সেনেট।

● **একাত্তরে গণহত্যার নায়ক নিজামির ফাঁসি :**

প্রাণভিক্ষা না-চাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরই একাত্তরে গণহত্যার নায়ক, জামাতে ইসলামির শীর্ষ নেতা মতিউর রহমান নিজামিকে ১০ মে ফাঁসি দেয় বাংলাদেশ সরকার। আন্তর্জাতিক যুদ্ধাপরাধ আদালত

ফাঁসির আদেশ দেওয়ার পরে ৫ মে সুপ্রিম কোর্ট নিজামির 'রিভিউ পিটিশন' খারিজ করে দেয়। আলফার ১০ ট্রাক অস্ত্র মামলাতেও খালেদা জিয়া সরকারের এই প্রাক্তন মন্ত্রীকে প্রাণদণ্ড দিয়েছিল অন্য একটি আদালত।

● **ব্রিটেনের প্রথম মহিলা মুসলিম মেয়র :**

ব্রিটেনের ক্যামডেন শহরের মেয়র নির্বাচিত হলেন বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত নাদিয়া শাহ। ব্রিটেনের কোনও শহরে তিনিই প্রথম মহিলা মুসলিম মেয়র।

বাংলাদেশের মৌলবিবাজার জেলায় নাদিয়াদের পরিবারের আদি বাড়ি। নাদিয়ার জন্ম অবশ্য ব্রিটেনেই। যে শহরের মেয়র নির্বাচিত হলেন তিনি, সেই ক্যামডেনেই জন্ম। গ্রিনিচ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক হওয়ার পর ব্যাংকে এবং বিভিন্ন সরকারি বিভাগে কাজ করেছেন। ২০১৪ সালে সরাসরি রাজনীতিতে যোগ দেন তিনি। রিজেন্ট পার্ক আসন থেকে তিনি নির্বাচিত হয়েছেন এবার। এই আসন থেকে আগে কাউন্সিলর ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নাতনি টিউলিপ সিদ্দিক। পরে হ্যাম্পস্টেড-কিলবার্ন আসন থেকে টিউলিপ সাংসদ নির্বাচিত হন।

● **কানাডায় দাবানল :**

উত্তর-পূর্ব কানাডার অ্যালবার্টার জঙ্গলে আগুন জ্বলছিল ১ মে থেকেই। ৩ মে সেই আগুন জঙ্গল লাগোয়া ফোর্ট ম্যাকমুরে শহরে ছড়িয়ে পড়ায় অন্তত ৮০ হাজার মানুষকে দক্ষিণের শহরগুলিতে নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়।

ফোর্ট ম্যাকমুরে শহরে প্রায় ৮৫০ বর্গকিলোমিটার এলাকা জুড়ে আগুন ধ্বংসলীলা চালায়, পুড়ে ছাই হয়ে যায় ১৬০০ ঘরবাড়ি। ধ্বংস হয়ে গিয়েছে বহু স্কুল, হাসপাতাল এমনকী রাস্তাও। ১ মে প্রথম অ্যালবার্টার জঙ্গলে আগুন লাগার খবর আসে। এই জঙ্গলের কাছেই রয়েছে বেশ কিছু তেলের খনি। দেশের মোট খনিজ তেলের তিন ভাগের দুই ভাগের জোগান আসে এই এলাকা থেকে। ঝোড়ো হাওয়ায় দাপটে ৩ মে মধ্যেই খনি এলাকা ও নিকটবর্তী ফোর্ট ম্যাকমুরে শহরে আগুন ছড়িয়ে পড়ে।

● **৩৬ বছর পর উত্তর কোরিয়ায় পার্টি কংগ্রেস :**

খাতায়-কলমে উত্তর কোরিয়ায় এখনও একটিই শাসক দল রয়েছে—তাদেরই মূল সিদ্ধান্তগ্রহণকারী গোষ্ঠীর সম্মেলনের নাম ওয়ার্কার্স পার্টি কংগ্রেস। আর প্রায় ৩৬ বছর পর পিয়ংইয়ংয়ের মাটিতে ফের দলীয় সম্মেলনের আসর বসল।

শেষবার যখন দেশে পার্টি কংগ্রেস হয়েছিল, তখন জন্মই হয়নি বর্তমান সর্বাধিনায়ক কিম জং-উনের। ১৯৮০ সালে শেষ সম্মেলনের সময় এক নতুন শাসক পেয়েছিল দেশবাসী। কিমের দাদু কিম উল-সুং-কে সরিয়ে তখন ক্ষমতায় আসেন কিমের বাবা কিম জং-ইল। ২০১১-এ তার মৃত্যু হলে সেই ফাঁকা আসনে বসেন ছেলে কিম জং-উন। ছ'বছর নিজের মর্জিমাফিক দেশ চালানোর পর অবশেষে সম্মেলনের আসর বসাতে রাজি হন কিম। শাসক দলের কর্মকর্তাদের বৈঠক বসে 'এপ্রিল ২৫ হাউস অব কালচার' ভবনে। প্রায় সত্তর দিন ধরে চলে প্রচার পর্ব। ডাক পান ১৩০ জন বিদেশি সাংবাদিকও। তবে ঘটা করে তাদের নিমন্ত্রণ করে নিয়ে এলেও সম্মেলন স্থলে ঢোকার অনুমতি দেওয়া হয়নি বিদেশি সাংবাদিকদের।

● **ভারত থেকে দূত ফিরিয়ে নিল নেপাল :**

ভারত থেকে নিজেদের রাষ্ট্রদূত দীপকুমার উপাধ্যায়কে ফিরিয়ে নিলে নেপাল সরকার। এর আগেও বেশ কিছু সিদ্ধান্ত নিয়ে রাষ্ট্রদূত উপাধ্যায়ে সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী খড়্গা প্রসাদ শর্মা ওলির মতভেদ হয়েছে।

নেপাল বিদেশ মন্ত্রকের তরফে জানানা হয়েছে, সে দেশের মন্ত্রিসভা ৬ মে এই সিদ্ধান্ত নেয়। কিছুদিন টানাপোড়েনের পর ভারত ও নেপালে সম্পর্ক ক্রমশ স্বাভাবিক হচ্ছে। অভিযোগ, এই পরিস্থিতিতে এমনকী প্রধানমন্ত্রীকেও অন্ধকারে রেখে নেপালের রাষ্ট্রপতি বিদ্যাদেবী ভাণ্ডারীর ভারত সফর বাতিল করেন রাষ্ট্রদূত উপাধ্যায়। ৯ মে ভারতে আসার কথা ছিল নেপালের প্রথম মহিলা রাষ্ট্রপতির। দায়িত্ব নেওয়ার পর এটাই ছিল তাঁর প্রথম বিদেশ সফর।

● **ইরানের পার্লামেন্টে নতুন নজির :**

ইরানে পার্লামেন্টের সদস্য হিসেবে শপথ নিলেন ১৮ জন মহিলা। সে দেশের ইতিহাসে এই প্রথম পার্লামেন্টে ধর্মগুরুর সংখ্যাকে ছাপিয়ে গেলেন মহিলা সদস্যরা। ইরানের প্রেক্ষিতে এ এক বড়সড় রাজনৈতিক পট পরিবর্তন। এবার ইরানের পার্লামেন্টে ঠাঁই হয়েছে ১৬ জন ধর্মগুরুর। ১৯৭৯ সালে প্রথম সে দেশে পার্লামেন্ট নির্বাচন হয়। ২৯০টি আসনের মধ্যে ১৬৪-টি আসনে জিতেছিলেন ধর্মগুরুরা। এরপর থেকেই কমতে শুরু করে ধর্মগুরুদের সংখ্যাটি।

● **ছাবাহারে ভারত-ইরান যৌথ বন্দর নির্মাণ চুক্তি :**

ইরানের ছাবাহারে ভারত-ইরান যৌথ বন্দর তৈরির সমঝোতা চূড়ান্ত করে ফেলল বিদেশমন্ত্রক। পাকিস্তানের গোয়াদরে চিনা বন্দরের খুব কাছে, মাত্র ৭২ কিলোমিটার পশ্চিমে ছাবাহারে বন্দরটি তৈরি করতে চলেছে ভারত। ভারত ইরানে একটি সংস্থা গঠন করেছে ইতিমধ্যেই। সেই সংস্থাই এই প্রকল্পের দেখভাল করবে।

ভারত ও ইরানের যৌথ উদ্যোগে আরবসাগরে এই বন্দর তৈরির সমঝোতা ১৭ এপ্রিল চূড়ান্ত করে বিদেশ মন্ত্রক। চিন-পাকিস্তান অর্থনৈতিক করিডোর গঠন এবং গোয়াদরে চিনা বন্দর তৈরির তোড়জোড় যখন থেকে শুরু হয়েছিল, তার কিছু দিন পর থেকেই ইরানের ছাবাহারে নিজেদের উপস্থিতি সুনিশ্চিত করার বিষয়ে এগোতে শুরু করে নয়াদিল্লি। কিন্তু ইরানের বিতর্কিত পরমাণু কর্মসূচি রুখতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তথা আন্তর্জাতিক মহল সে দেশের উপর বেশকিছু নিষেধাজ্ঞা জারি করায়, ভারত-ইরান যৌথ বন্দর প্রকল্পের অগ্রগতি ধাক্কা খেয়েছিল। ইরানের প্রেসিডেন্ট হাসান রুহানির তরফে জানানো হয়েছে, ছাবাহার বন্দর নিয়ে ভারত-ইরান সমঝোতা দৃষ্টান্তমূলক—গোটা মধ্য এশিয়া এই বন্দরের মাধ্যমে উপকৃত হবে। প্রসঙ্গত, ২২-২৩ মে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দু'দিনের ইরান সফর চলাকালীন এই যৌথ বন্দর প্রকল্পের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

জাতীয়

● **চার রাজ্য ও পুদুচেরিতে বিধানসভা নির্বাচন :**

কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল পুদুচেরির পাশাপাশি চার রাজ্য—পশ্চিমবঙ্গ, কেরালা, তামিলনাড়ু ও অসমে সম্প্রতি বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হল। ফল ঘোষিত হয় ১৯ মে। পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে সংশ্লিষ্ট বিভাগে। এখন সংক্ষেপে দেখে নেওয়া যাক দেশের অন্যত্র বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল।

কেরালায় ১৪তম বিধানসভা গঠনের জন্য ১৬ মে ভোট গ্রহণ হয়। মোট ১৪০ আসনের মধ্যে এলডিএফ জিতেছে ৯১-টি আসনে, ইউডিএফ ৪৭-টি আসনে। প্রথমবার এই রাজ্যে একটি আসন জিতে খাতা খুলল ভারতীয় জনতা পার্টি। নতুন মুখ্যমন্ত্রী হলেন বর্ষীয়ান সিপিআই(এম) নেতা পিনারাই বিজয়ন।

১৯৮২ সাল থেকে রাজ্যের প্রধান দুই জোট সিপিআই(এম)-এর নেতৃত্বাধীন এলডিএফ এবং কংগ্রেসের নেতৃত্বাধীন ইউডিএফ— কোনও জোটই এ রাজ্যে পর পর দু'বার নির্বাচনে জিততে পারেনি। সেই ধারা মেনে ২০১৬ নির্বাচনে এলডিএফ-এর জেতার সম্ভাবনাই প্রবল ছিল। বাস্তবেও সেটি ঘটেছে। গত নির্বাচনে ৭৫.১২ শতাংশ মানুষ তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছিলেন। এইবার সংখ্যাটি বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭৭.৩৫ শতাংশে।

দ্বিতীয়বারের জন্য তামিলনাড়ুতে ক্ষমতায় ফিরল এআইএডিএমকে। ২৩৪ আসনের বিধানসভায় করুণানিধিকে থমকাতে হল ৯৮-এ। আর ম্যাজিক ফিগার ১১৮ টপকে ১৩৪-এর নিরাপদ স্থানে জয়ললিতা (২-টি আসনে ভোটদান হয় ২৩ মে)।

কেরালার মতো তামিলনাড়ুতেও ভোটগ্রহণ হয় ১৬ মে আর এখানেও বিদায়ী সরকারকে দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় না ফেরানোর প্রবণতা রয়েছে জনতার। শেষবার এই ঘটনার ব্যতিক্রম ঘটেছিল ১৯৮৪ সালে। সেবার টানা দ্বিতীয়বার জিতে ক্ষমতায় আসেন প্রবাদপ্রতিম এমজিআর। পরবর্তী তিন দশকে পালা করে সরকার গড়েছে এআইডিএমকে ও ডিএমকে। কিন্তু এবার সেই হিসেব ওলোটপালোট হয়ে গেল। এমজিআর-এর সঙ্গে একই বন্ধনীতে উঠে এল জয়ললিতার নাম।

টানা দেড় দশকের কংগ্রেস শাসনের অবসান ঘটিয়ে অসমে ক্ষমতায় এল বিজেপি। উত্তর-পূর্ব ভারতে এই প্রথম কোনও রাজ্যে সরকার গঠন করল তারা। নতুন মুখ্যমন্ত্রী হচ্ছেন বিজেপি-র সর্বানন্দ সোনোয়াল।

২০১১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি একা লড়েছিল। যার পরিণামে ভরাডুবি হয়েছিল। এবার স্থানীয় দল অসম গণ পরিষদের সঙ্গে গাঁটছড়ার সিদ্ধান্ত নেয় দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। যার ফলে ১২৬-টি আসনের মধ্যে ৮৬-টি আসনে জয় পেয়ে বিজেপি-র নেতৃত্বাধীন এনডিএ জোট অসমে ক্ষমতা দখল করল। কংগ্রেস পেয়েছে ২৬ আসন ও এআইইউডিএফ জিতেছে ১৩ আসনে। ভোটগ্রহণ হয় ২ দফায়—৪ ও ১১ এপ্রিল। পুরনো সব নজির ভেঙ্গে ৮৪.৭২ শতাংশ ভোট পড়ে।

কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল পুদুচেরির ৩০ আসনে জন্য ১৬ মে ভোট হয়। ১৭ আসন জিতে ক্ষমতায় আসে কংগ্রেস। এআইএনআরসি পেয়েছে ৮ আসন ও এডিএমকে ৪ আসন।

● **অভিন্ন মেডিক্যাল প্রবেশিকা পরীক্ষা এক বছরের জন্য পিছিয়ে গেল :**

কেন্দ্রীয় সরকার অর্ডিন্যান্স জারি করে জাতীয় অভিন্ন মেডিক্যাল প্রবেশিকা পরীক্ষা এক বছরের জন্য পিছিয়ে দিল। ২০ মে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার সবুজ সংকেত পেয়েই অর্ডিন্যান্স জারি করা হয়। সরকার ও বিরোধী দলগুলির সর্বসম্মতিতেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে অর্ডিন্যান্স জারি করে প্রবেশিকা পরীক্ষা এক বছরের জন্য পিছিয়ে দেওয়া হবে।

এপ্রিল মাসে সুপ্রিম কোর্ট এক রায়ে জানিয়েছিল, এবার থেকে মেডিক্যাল ও ডেন্টাল কোর্সে ভর্তির জন্য দেশজুড়ে একটিই পরীক্ষা হবে—'ন্যাশনাল এলিজিবিলিটি-কাম-এন্ট্রান্স টেস্ট' বা 'নিট'। বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজে রাজ্যগুলি নিজেদের মতো করে যে প্রবেশিকা পরীক্ষা নিত, তা মানা হবে না। গত ৬ মে প্রথম পর্যায়ের প্রবেশিকা পরীক্ষা দেয় প্রায় সাড়ে ছয় লক্ষ ছাত্রছাত্রী। আগামী ২৪ জুলাই পরবর্তী পর্যায়ের পরীক্ষা হওয়ার কথা।

● **ক্ষেপণাস্ত্র হানা রুখতে দেশীয় 'এএডি ইন্টারসেপ্টর' ক্ষেপণাস্ত্র :**

ডিফেন্স রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ডিআরডিও)-এর তরফে জানানো হয়েছে, ওড়িশা উপকূলের কাছে গত ১৫ মে সফল পরীক্ষামূলক উৎক্ষেপণ হয়েছে সম্পূর্ণ দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি অ্যাডভান্সড এয়ার ডিফেন্স (এএডি) মিসাইলের।

ভারত এত দিন ভূমি থেকে আকাশে নিক্ষেপযোগ্য স্বল্পপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র 'আকাশ'-কে ইন্টারসেপ্টর মিসাইল হিসেবে ব্যবহার করত। রাশিয়ার কাছ থেকে কেনা এস-৩০০ মিসাইল ডিফেন্স সিস্টেমও মোতায়েন করা আছে দেশের বিভিন্ন কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ এলাকায়। কিন্তু আকাশ ক্ষেপণাস্ত্র ইন্টারসেপ্টর গোত্রের মিসাইল নয়। এবং এস-৩০০ ইন্টারসেপ্টর হলেও বিদেশ থেকে কেনা।

১৫ মে সকাল ১১টা ১৫ মিনিট নাগাদ বঙ্গোপসাগর থেকে ভারতীয় নৌসেনা পৃথ্বী গোত্রের একটি ব্যালিস্টিক মিসাইল দেশের মূল ভূখণ্ডের দিকে নিক্ষেপ করে। ওড়িশা উপকূলের অদূরে আবদুল কালাম আইল্যান্ডে মোতায়েন করা হয়েছিল অ্যাডভান্সড এয়ার ডিফেন্স মিসাইল নামের এই নবনির্মিত ইন্টারসেপ্টর। বঙ্গোপসাগরের দিক থেকে যে ব্যালিস্টিক মিসাইল ছুটে আসছে, তা রেডারে ধরা পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই গর্জন করে ছুটতে শুরু করে এএডি। সমুদ্রের উপর মাঝ আকাশেই সফলভাবে ধ্বংস করে ধেয়ে আসা ব্যালিস্টিক মিসাইলকে।

● **উচ্চশিক্ষার মান নির্ধারণের সমীক্ষা :**

সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়, ইঞ্জিনিয়ারিং, ম্যানেজমেন্ট কলেজ, ফার্মেসি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির মান নির্ধারণ করতে সমীক্ষা চালিয়েছিল কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক। সমীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেছে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স-ব্যাঙ্গালোর (বিশ্ববিদ্যালয়), আইআইটি-মাদ্রাজ (ইঞ্জিনিয়ারিং), আইআইএম-ব্যাঙ্গালোর (ম্যানেজমেন্ট) ও মণিপাল কলেজ অব ফার্মাসিউটিক্যাল সায়েন্সেস-মণিপাল (ফার্মেসি)।

সমীক্ষায় বিচার্য মাপকাঠি ছিল প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত, শিক্ষকদের যোগ্যতা, গ্রন্থাগার, গবেষণাগার-সহ পরিকাঠামোর দিকগুলি। পরীক্ষার পরে ছাত্রছাত্রীদের চাকরি পাওয়ার সাফল্য, বেতনের অঙ্ককেও মাথায় রাখা হয়েছে। দেশের প্রায় ৩৫০০ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কোন পর্যায়ে রয়েছে তা খতিয়ে দেখতে গত বছর থেকে এই কাজে হাত দেয় কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক। ৪ এপ্রিল সেই তালিকা প্রকাশ করেছে মন্ত্রক।

ইঞ্জিনিয়ারিং-এ আইআইটি খড়্গপুর ও ম্যানেজমেন্টে আইআইএম কলকাতা বাদে প্রথম দশে স্থান পায়নি পশ্চিমবঙ্গের একটিও প্রতিষ্ঠান। দেখা যাচ্ছে, আইআইটি খড়্গপুর ছাড়া প্রথম একশোয় রয়েছে রাজ্যের তিনটি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ। ৩০-এ এনআইটি দুর্গাপুর। আইআইইএসটি শিবপুরের স্থান ৮৩ নম্বরে। বেঙ্গল ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি ৯১-এ। পশ্চিমবঙ্গের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের আওতাধীন বিশ্বভারতী ১১ নম্বরে থাকলেও, প্রেসিডেন্সির জায়গা হয়েছে ৪১-এ। কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় ৪৫-এ। বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ৩১-এ। তবে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় সমীক্ষায় অংশগ্রহণ করেনি। আর তালিকায় নেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ও।

● **ভারত-মার্কিন 'এক্সারসাইজ রেড ফ্ল্যাগ' :**

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মহড়া দিতে গিয়ে অসামান্য সাফল্যের নজির রাখল ভারতীয় বায়ুসেনা। আলাস্কায় ভারত-মার্কিন যৌথ সামরিক মহড়ায় ভারতীয় বায়ুসেনার অবিশ্বাস্য দক্ষতা দেখে প্রশংসায় পঞ্চমুখ মার্কিন কম্যান্ডাররাও। 'এক্সারসাইজ রেড ফ্ল্যাগ' নামে এই মহড়ায় মার্কিন নৌসেনা এবং বিমানবাহিনী অংশ নিয়েছিল। সঙ্গী ছিল শুধু ভারতীয় বায়ুসেনা।

২৮ এপ্রিল থেকে ১৩ মে আলাস্কাতে চলে এই মহড়া। অধিকাংশ সময়ই তাপমাত্রা ছিল হিমাঙ্কের নিচে। সুখোই-৩০এমকেআই, জাগুয়ারের মতো অত্যাধুনিক ফাইটার জোট নিয়ে মহড়ায় অংশ নিয়েছিল ভারত। ভারতীয় বায়ুসেনার ১৭০ জন কর্মী আলাস্কা গিয়েছিলেন এই মহড়ায় অংশ নিতে। অবশ্য এই প্রথমবার নয়, ২০০৮ সালেও আমেরিকা ও ভারত এই যৌথ মহড়ায় অংশ নিয়েছিল।

● **স্টেশনের পরিচ্ছন্নতার হাল জানতে রেলমন্ত্রকের সমীক্ষা :**

রেলমন্ত্রক সম্প্রতি 'এ-ওয়ান' ক্যাটাগরির ৭৫-টি স্টেশন এবং 'এ' ক্যাটাগরির ৩৩২-টি স্টেশন, অর্থাৎ মোট ৪০৭-টি স্টেশনের পরিচ্ছন্নতার মান নির্ণয়ের জন্য সমীক্ষা চালায়। ভারতীয় রেলের প্রায় আট হাজার স্টেশনের মধ্যে 'এ-ওয়ান' ক্যাটাগরির শীর্ষস্থানে রয়েছে সুরাত, রাজকোট এবং বিলাসপুর স্টেশন। এর অর্থ হচ্ছে, এই তিনটি স্টেশন জনগণের রায়ে পরিচ্ছন্নতম স্টেশন হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। তারপর রয়েছে শোলাপুর, মুম্বই সেন্ট্রাল এবং চণ্ডীগড়।

কলকাতার মেট্রো রেল বাদ দিয়ে বাকি ১৬-টি আঞ্চলিক রেলের অন্য স্টেশনগুলির মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের নিউ জলপাইগুড়ি, খড়্গপুর এবং হাওড়া স্টেশন তালিকার মাঝামাঝি স্থান পেয়েছে। 'এ-ওয়ান' ক্যাটাগরির মধ্যে শিয়ালদহ স্টেশনের স্থান ৭১ নম্বরে।

পশ্চিমবঙ্গ

● **মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে তৃণমূল কংগ্রেস রাজ্যে পুনঃনির্বাচিত :**

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস ২১১ আসন জিতে দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় এল রাজ্যে। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস (৪৪) ও বামফ্রন্টের (৩২) জোট জিতেছে মোট ৭৬ আসন। ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) জিতেছে ৩-টি আসন ও তাদের জোট সঙ্গী গোর্খা জনমুক্তি মোর্চাও জিতেছে ৩-টি আসন। একটি আসনে জয়ী হয়েছেন একজন নির্দল প্রার্থী। ভোট গণনা হয় ১৯ মে। ২৭ মে নতুন মন্ত্রীসভার শপথ গ্রহণ।

রাজ্যের বিধানসভার ২৯৪-টি আসনের জন্য নির্বাচন হয়। প্রথম দফায় ৪ এপ্রিল। পরবর্তী দফাগুলোতে নির্বাচন হয় ১১ এপ্রিল, ১৭ এপ্রিল, ২১ এপ্রিল, ২৫ এপ্রিল, ৩০ এপ্রিল ও ৫ মে। পরিসংখ্যান বলছে বিজয়ী তৃণমূল কংগ্রেস পেয়েছে ৪৪.৯ শতাংশ ভোট, বামফ্রন্ট ২৫.৯ শতাংশ, কংগ্রেস ১২.৩ শতাংশ ও বিজেপি ১০.২ শতাংশ। ১.৫ শতাংশ ভোট পড়েছে নোটা (নান অব দ্য অ্যাবাভ)-তে। ২০১৪ সালের সংসদীয় নির্বাচনে এ ধরনের ভোটের অংশভাগ ছিল ১.১ শতাংশ।

উল্লেখ্য, বঙ্গ রাজনীতিতে ১৯৮৭ সালে ২৫১-টি আসন নিয়ে জ্যোতি বসুর নেতৃত্বে তৃতীয়বার ক্ষমতায় এসেছিল বামফ্রন্ট। আর ২০০৬ সালে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের নেতৃত্বাধীন বামফ্রন্ট পেয়েছিল ২৩৫-টি আসন। অতীতের সেই রেকর্ড হয়তো এবার ভাঙতে পারেনি তৃণমূল, কিন্তু ১৯৬২ সালের পর এই প্রথম কোনও রাজনৈতিক দল জোট না করে একক শক্তিতে ক্ষমতায় এল।

● **১৩৮০ কোটি টাকার জল প্রকল্পে মাত্র ৩০ শতাংশ কাজ হয়েছে :**

বিশ্বব্যাংকের দেওয়া ১৩৮০ কোটি টাকার প্রকল্পে মাত্র ৩০ শতাংশ কাজ শেষ করতে পেরেছে রাজ্যের জলসম্পদ উন্নয়ন দফতর। জলসম্পদ উন্নয়ন দফতরের অধীন ও বিশ্বব্যাংকের দেওয়া অর্থ সাহায্যে অ্যাকসিলারেটেড ডেভেলপমেন্ট অব মাইনর ইরিগেশন প্রকল্প (অ্যাডমিপ) শেষ হবে ২০১৭ সালের ডিসেম্বরে।

অ্যাডমিপ-এর হিসেব বলছে, বিভিন্ন জেলায় গত জানুয়ারির ১০ তারিখ অবধি ১২৯৮-টি প্রকল্পের মধ্যে মাত্র ৩৯৬-টি বা ৩০.৫০ শতাংশ কাজ শেষ হয়েছে। আরও ৩৬৪-টি প্রকল্পের কাজ চলছে।

জলপাইগুড়িতে ৭২ শতাংশ, কোচবিহারে ৬০ শতাংশ, উত্তর দিনাজপুরে ৪৬ শতাংশ, মালদহে ৩৩ শতাংশ এবং পূর্ব মেদিনীপুরে ২৮ শতাংশ কাজ হয়েছে। অন্যদিকে, পুরুলিয়ায় ১২৬-টি প্রকল্পের মধ্যে কাজ হয়েছে ১৫-টির। বাঁকুড়ায় ১০৮-টির মধ্যে শেষ হয়েছে ১৯-টির কাজ। বীরভূমে ১৩৭-টির মধ্যে ১৮-টি এবং পশ্চিম মেদিনীপুরে ৭৭-টির মধ্যে ১৮-টি কাজ শেষ হয়েছে। এছাড়া দার্জিলিং, মুর্শিদাবাদে যথাক্রমে ৩৩ এবং ২৮-টি প্রকল্পের মধ্যে শেষ হয়েছে ৫-টির কাজ। হাওড়ায় মঞ্জুর হয়েছিল ২৭-টি প্রকল্প, হয়েছে ৬-টি কাজ।

● **সিভিল সার্ভিস দিবসে স্বীকৃতি উত্তর ২৪ পরগণা ও নদীয়ার :**

'সিভিল সার্ভিস' দিবস (২১ এপ্রিল) উপলক্ষে গোটা দেশের প্রায় সাড়ে ছ'শোর মধ্যে ৭৪-টি জেলাকে বেছে নিয়ে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসনকে স্বীকৃতি দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সেই তালিকায় স্থান পেয়েছে এ রাজ্যের উত্তর ২৪ পরগণা ও নদীয়া জেলা।

প্রতিবারই 'সিভিল সার্ভিস' দিবসে বিভিন্ন জেলা প্রশাসনকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। কিন্তু এবার নিয়মটি বদলে ফেলা হয়েছে। এবারে আর কোনও সুপারিশ বা ভাল রিপোর্টের ভিত্তিতে জেলাকে বেছে নেওয়া হয়নি। বরং একটি টিম গঠন করে খতিয়ে দেখা হয়েছে, কারা কারা ভাল কাজ করেছে। বিশেষ করে চারটি ক্ষেত্রে— প্রধানমন্ত্রী জন-ধন যোজনা, স্বচ্ছ ভারত অভিযান, স্বচ্ছ বিদ্যালয় ও মাটির স্বাস্থ্য নিরূপণ।

● **দীনদয়াল উপাধ্যায় গ্রামীণ জ্যোতি যোজনায় হাওড়ায় প্রকল্প :**

দীনদয়াল উপাধ্যায় গ্রামীণ জ্যোতি যোজনার আওতায় হাওড়া জেলায় বিদ্যুৎ চুরি রুখতে এবার খোলা তারের বদলে কেবল ব্যবহার করবে রাজ্য বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থা। আগামী তিন বছর ধরে এই খাতে খরচ করা হবে প্রায় দেড়শো কোটি টাকা। দীনদয়াল উপাধ্যায় গ্রামীণ জ্যোতি যোজনা প্রকল্পে পুরো টাকাই দিচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার।

হাওড়ায় গ্রামীণ বৈদ্যুতীকরণ প্রকল্প সফল হওয়ার ফলে এই জেলায় প্রতিটি মৌজায় বিদ্যুৎ পৌঁছে গিয়েছে। কিন্তু জেলায় চুরির জন্য বণ্টন সংস্থার লোকসানের হার মোট আয়ের ৩০ শতাংশে পৌঁছে গেছে। দীনদয়াল উপাধ্যায় গ্রামীণ জ্যোতি প্রকল্পে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যকে চলতি আর্থিক বছরে মোট সাড়ে সাত হাজার কোটি টাকা দিয়েছে। বিভিন্ন জেলাকে সেই টাকা ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। এই টাকা বিভিন্ন জেলা বিদ্যুৎ সংযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে ব্যবহার করতে পারবে। হাওড়া জেলা মূলত হুকিং রোখার কাজে এই টাকা ব্যবহার করার পরিকল্পনা করেছে।

● **হলদিয়ায় এলপিজি প্রকল্পে পরিবেশ মন্ত্রকের ছাড়পত্র :**

শিল্প সংক্রান্ত এক বিশেষজ্ঞ মূল্যায়ন কমিটির সুপারিশের উপর ভিত্তি করে পশ্চিমবঙ্গে বিপিসিএল-এর এক প্রকল্পকে পরিবেশ ও উপকূল অঞ্চলের বিধি সংক্রান্ত ছাড়পত্র দিয়েছে কেন্দ্রীয় পরিবেশ মন্ত্রক।

হলদিয়া ডক কমপ্লেক্স-এ রাষ্ট্রায়ত্ত জ্বালানি সংস্থা ভারত পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন লিমিটেডের (বিপিসিএল) ৬৯৪ কোটি টাকার প্রস্তাবিত রান্নার গ্যাস (এলপিজি) আমদানির টার্মিনাল গড়ছে সংস্থাটি। সেই সঙ্গে তৈরি হচ্ছে ওই গ্যাস মজুত করা, সিলিন্ডারে ভরা এবং বণ্টনের ব্যবস্থাও। প্রস্তাবিত এলপিজি প্রকল্পটি মূলত দেশের পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব অঞ্চলগুলিতে রান্নার গ্যাস সরবরাহ নিশ্চিত করবে। এবং একই সঙ্গে তৈরি করবে পরিবেশ সহায়ক এলপিজি জ্বালানি আমদানি করার উপযুক্ত পরিকাঠামো। এর ফলে ২০১৮ সালের মধ্যে দেশের প্রতিটি পরিবারে রান্নার গ্যাস পৌঁছে দেওয়ার যে উদ্যোগ কেন্দ্রীয় সরকার নিয়েছে, তা বাস্তবায়িত হবে।

অর্থনীতি

● **ভারত-মরিশাস কর চুক্তি :**

১০ মে মরিশাসের রাজধানী পোর্ট লুই-এ ১৯৮৩ সাল থেকে দু' দেশের মধ্যে বহাল থাকা দ্বৈত কর প্রতিরোধ চুক্তির সংশোধনীতে স্বাক্ষর করে ভারত ও মরিশাস। লক্ষ্য আয়কর ও মূলধনী লাভ কর অবাধে ফাঁকি দেওয়ার সুযোগ বন্ধ করা। মরিশাস থেকে আসা বিদেশি লগ্নিকে করের আওতায় আনতে সে দেশের সঙ্গে নতুন এই চুক্তি করল ভারত সরকার। সেই সঙ্গেই নিয়মের গণ্ডিতে এল কর এড়ানোর স্বর্গরাজ্য বলে পরিচিত আফ্রিকার দ্বীপরাষ্ট্র মরিশাস। একই পথে হেঁটে সংশোধিত হতে চলেছে সিঙ্গাপুরের সঙ্গে চুক্তিও।

সংশোধনী অনুসারে ২০১৭ সালের ১ এপ্রিল থেকে ভারতে ব্যবসা করা মরিশাসের সংস্থার শেয়ার বিক্রিতে বসবে মূলধনী লাভ কর। তবে তা হবে ভারতে চালু থাকা ওই করের হারের অর্দ্ধেক। মরিশাসের সংস্থা হিসেবে তাদেরই গণ্য করা হবে, যাদের সেদেশে লগ্নি ২৭ লক্ষ টাকার বেশি (গত ১২ মাসের মধ্যে)। ২০১৯ সালের ৩১ মার্চ পর্যন্ত একই নিয়ম বহাল থাকবে। ২০১৯ সালের ১ এপ্রিল থেকে ভারতে চালু হারেই আদায় করা হবে মূলধনী লাভ কর।

● **নতুন খনন আইন :**

গত ১৬ মার্চ লোকসভায় পাশ হয়েছিল খনন আইনের সংশোধনী। রাজ্যসভা তাতে সায় দেয় ২ মে। এই নতুন আইন কার্যকর হওয়ায়, সিমেন্ট ও ইস্পাত কারখানার হাতবদল সহজ হবে। পথ প্রশস্ত হবে দুটি সিমেন্ট বা ইস্পাত সংস্থা মিশে যাওয়ারও।

কারখানা বিক্রি করা যেত। অথচ হাতবদল করা যেত না সেখানে ব্যবহৃত কাঁচামালের খনি। নতুন খনন আইনে এবার সেই গেরো কাটবে বলে আশার আলো দেখছে সিমেন্ট ও ইস্পাত শিল্প। খুশি বিপুল অনুৎপাদক সম্পদের বোঝা ঘাড়ে চেপে থাকা ব্যাংকগুলিও। কারণ, ধুঁকতে থাকা সিমেন্ট বা ইস্পাত কারখানা অন্য সংস্থার হাতে দেওয়া গেলে, ঋণের টাকা আদায় কিছুটা অন্তত সহজ হবে।

● **আইএমএফ-এর সমীক্ষা জিএসটি-র পক্ষে :**

গত ৪ মে এশীয় ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের জন্য সমীক্ষা রিপোর্ট (রিজিয়নাল ইকনমিক আউটলুক) পেশ করেন আইএমএফ-এর এশীয় ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের সমীক্ষা বিভাগের প্রধান রণিল মনোহর সালগাদো। ভারতে অর্থনীতির চাকায় গতি বাড়াতে আর্থিক সংস্কারের রথ দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যেতে বলে আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার (আইএমএফ)। তারা মূলত জোর দিয়েছে পণ্য পরিষেবা কর (জিএসটি) চালু করা, জমি ও শ্রম আইন সংস্কারের উপর। এ যাবৎ এ ধরনের কাঠামোগত সংস্কারের পথে তেমনভাবে এগোতে পারেনি ভারত। তা সত্ত্বেও আর্থিক বৃদ্ধি ৭.৫ শতাংশ ছুঁয়েছে।

● **ষোলো মাসে পরিকাঠামোয় সর্বোচ্চ বৃদ্ধি মার্চে :**

গত ২ মে কেন্দ্রের প্রকাশিত পরিসংখ্যান অনুযায়ী, গত অর্থবর্ষের শেষ মাসে (মার্চ) পরিকাঠামোয় বৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে ৬.৪ শতাংশ। ২০১৪ সালের নভেম্বরের (৬.৭ শতাংশ) পর থেকে গত ১৬ মাসের মধ্যে যা সর্বোচ্চ। ফেব্রুয়ারিতেও ওই হার ছিল ৫.৭ শতাংশ। পর পর দু'মাসে বৃদ্ধির এই হার আশাজনক। বিশেষত মার্চে বিদ্যুৎ (১১.৩ শতাংশ), সার (২২.৯ শতাংশ), সিমেন্ট (১১.৯ শতাংশ), তেল শোধনের (১০.৮ শতাংশ) মতো গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামো শিল্পে উৎপাদন যেভাবে লাফিয়ে বেড়েছে, আগামী দিনে তার হাত ধরেই শিল্পের চাকায় গতি ফেরার ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে।

অন্যদিকে উপদেষ্টা সংস্থা মার্কিটের করা সমীক্ষা অনুযায়ী, এপ্রিলে পিএমআই সূচক নেমে গিয়েছে ৫০.৫-এ। মার্চে যা ছিল ৫২.৪। ভারতে উৎপাদন শিল্পের হাল কেমন, বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে সমীক্ষা করে সে বিষয়ে পূর্বাভাস দেয় নিক্কেই-এর ম্যানুফ্যাকচারিং পারচেজিং ম্যানেজার্স (পিএমআই) সূচক। ওই সূচক ৫০-এর উপরে থাকার মানে কলকারখানায় উৎপাদন বৃদ্ধি। আর তা তার নিচে নেমে যাওয়ার অর্থ, উৎপাদন শিল্পে ঘাটতি।

প্রসঙ্গত, উৎপাদন শিল্পের ৩৮ শতাংশই আসে আটটি ক্ষেত্র থেকে—কয়লা, অশোধিত তেল, প্রাকৃতিক গ্যাস, তেল শোধন, সার, ইস্পাত, সিমেন্ট এবং বিদ্যুৎ উৎপাদন। এগুলি পরিকাঠামোর অন্তর্ভুক্ত।

● **২৫ শতাংশ সরকারি শেয়ার কিনে নেবে নালকো :**

রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা নালকোয় নিজেদের হাতে থাকা ৮০.৯৩ শতাংশ শেয়ারের মধ্যে ২৫ শতাংশ ওই সংস্থাকেই বিক্রি করতে চলেছে কেন্দ্র। এ ব্যাপারে রাষ্ট্রায়ত্ত অ্যালুমিনিয়াম সংস্থাটি তার সম্মতি জানিয়েছে। কেন্দ্রীয় খনন সচিব বলবিন্দর কুমার ২ মে এ কথা জানিয়ে বলেন, অর্থ মন্ত্রকই নালকোকে এই শেয়ার কেনার আর্জি জানাতে বলেছিল। এই খাতে ৩২৫০ কোটি টাকা ঘরে তুলতে চায় কেন্দ্র।

● **দশ বছরে সর্বনিম্ন প্রত্যক্ষ করের অংশভাগ :**

গত অর্থবর্ষে প্রত্যক্ষ কর আদায়ের পরিমাণ জিডিপি-র মাত্র ৫.৪৭ শতাংশ। দশ বছরে সবচেয়ে কম। অথচ গত দেড় দশকে ১২ গুণ বেড়েছে কর্পোরেট কর আদায়। ৯ গুণ বেড়েছে কেন্দ্রের ঘরে জমা পড়া আয়করের অঙ্ক।

২৯ এপ্রিল কর জমার পরিসংখ্যান প্রকাশ করে কেন্দ্র। সেই তথ্যে দেখা যাচ্ছে, ২০১৫-১৬ সালে প্রত্যক্ষ কর আদায় হয়েছে রাজস্বের ৫১.০৫ শতাংশ। গত ৯ বছরে সর্বনিম্ন। অন্যদিকে, পরিষেবা কর ইত্যাদির দৌলতে পরোক্ষ কর আদায় বেড়েছে চোখে পড়ার মতো।

এপ্রিল ২০১৬ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী চলতি অর্থবর্ষের প্রথম মাসে ৬৪,৩৯৪ কোটি টাকা পরোক্ষ কর আদায় হয়েছে, যা গত বছরের (এপ্রিল ২০১৫) তুলনায় ৪১.৮ শতাংশ বেশি; উৎপাদন শুল্ক বেড়েছে ৭০.৭ শতাংশ ও পরিষেবা কর বেড়েছে ২৭.৯ শতাংশ। অতিরিক্ত রাজস্ব আদায়ের নতুন উপায়গুলো বাদ দিলেও দেখা যাচ্ছে যে সব মিলিয়ে ১৭ শতাংশ বেড়েছে পরোক্ষ কর।

গত বছর ৭,০৯,০২২ কোটি টাকার রাজস্ব আসে পরোক্ষ কর থেকে। এ বছর ৭,৭৮,০০০ কোটি টাকার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত হয়েছে। আর ২০১৬-১৭ অর্থবর্ষের জন্য বাজেটে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার ৮.৩ শতাংশ পরোক্ষ কর বাবদ রাজস্ব ইতিমধ্যেই জমা হয়ে গেছে প্রথম মাসেই।

● **সিআইআই-ডেলয়েট সমীক্ষা :**

বণিকসভা সিআইআই ও উপদেষ্টা সংস্থা ডেলয়েটের এক সমীক্ষায় জানা গেছে যে পণ্য-পরিষেবা কর (জিএসটি) নেট বাজারের হাত শক্ত করবে। 'ই-কমার্স ইন ইন্ডিয়া—আ গেম চেঞ্জার ফর দ্য ইকনমি' শীর্ষক রিপোর্টে একথা উল্লেখ করা হয়েছে।

ভারতে লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে নেট বাজারের জনপ্রিয়তা। কিন্তু জটিল কর কাঠামো, পণ্য পরিবহণ সংক্রান্ত সমস্যা, দাম মেটানোর পদ্ধতি নিয়ে বিভ্রান্তি, প্রত্যন্ত এলাকায় নেটের প্রসার কম থাকা, এই নতুন মাধ্যমের সঙ্গে সড়গড় দক্ষ মানবসম্পদের অভাবের মত বেশকিছু নতুন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হচ্ছে সংস্থাগুলিকে।

তবে প্রস্তাবিত পণ্য-পরিষেবা কর ব্যবস্থা চালু হলে এক ধাক্কায় এ ধরনের অনেক অসুবিধাই কেটে যাবে বলে জানানো হয়েছে সমীক্ষা। তার কারণ, দেশ জুড়ে পরোক্ষ করের একটিই হার বহাল হলে এবং সব রাজ্যই জিএসটি-র কাঠামোয় এলে ব্যবসার ক্ষেত্রে অনেকটাই সুবিধা হবে ই-কমার্স সংস্থাগুলির।

প্রসঙ্গত, অনলাইনে কেনাকাটাই নেট বাজারে লেনদেনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় মাধ্যম হয়ে উঠতে চলেছে। ২০২০ সালের মধ্যে তা ১০ হাজার কোটি ডলার (৬.৭০ লক্ষ কোটি টাকা) ছোঁবে বলেও পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে এই সমীক্ষায়।

● **ইন্ডিয়ান অয়েল-এর এলপিজি টার্মিনাল চট্টগ্রামে :**

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনের (বিপিসি) সঙ্গে চুক্তি সই করল ভারতের রাষ্ট্রায়ত্ত তেল সংস্থা ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন (আইওসি)। এই চুক্তি অনুযায়ী রান্নার গ্যাস আমদানির জন্য চট্টগ্রামের উপকূলীয় অঞ্চলে গড়া হবে একটি টার্মিনাল। সেখান থেকে পাইপলাইন বসানো হবে ত্রিপুরা পযন্ত। বাংলাদেশ বন্দরের ওই টার্মিনাল ব্যবহার করেই রান্নার গ্যাস বয়ে আনা হবে। তার পরে তা ত্রিপুরায় সরবরাহ করা হবে পাইপের মাধ্যমে। উল্লেখ্য, সম্প্রতি কেন্দ্রীয় তেলমন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের তিন দিনের বাংলাদেশ সফরকালে এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

● **অনুৎপাদক সম্পদের আন্তর্জাতিক অভিন্ন মাপকাঠির প্রস্তাব :**

বিভিন্ন রাষ্ট্রের শীর্ষ ব্যাংকগুলির সংগঠন 'দ্য ব্যাংক ফর ইন্টারন্যাশনাল সেট্‌লমেন্টস' বা বিআইএস এবার দুনিয়া জুড়ে অনুৎপাদক সম্পদের (এনপিএ) অভিন্ন মাপকাঠি বেঁধে দেওয়ার প্রস্তাব এনেছে। ইচ্ছাকৃতভাবে ঋণখেলাপিদের কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ বকেয়া উদ্ধারে এ ধরনের সংজ্ঞা ঠিক করে দেওয়াটা অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত হবে।

প্রসঙ্গত, সুইৎজারল্যান্ডভিত্তিক বিআইএস-এর ভাইস চেয়ারম্যান পদে রয়েছেন ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংকের গভর্নর রঘুরাম রাজন। ২০১৫ সালে তিন বছরের জন্য তিনি এই দায়িত্বে আসেন। ৬০-টি দেশের শীর্ষ ব্যাংক এই মুহূর্তে বিআইএস-এর সদস্য।

বিআইএস জানিয়েছে, এখনও পর্যন্ত আন্তর্জাতিক স্তরে অনাদায়ী ঋণের বিচার করার কোনও বাঁধাধরা মাপকাঠি নেই—এক একটি দেশে তা এক এক রকম। এ ধরনের ঋণের কোনগুলির ক্ষেত্রে শোধ করার তারিখের পরে ৯০ দিন পেরিয়ে গিয়েছে, কোনগুলির আর ফেরত আসার সম্ভাবনা নেই, তার ভিত্তিতেই অনুৎপাদক সম্পদ তকমা দেওয়ার পক্ষপাতী বিআইএস।

● **কৃষিপণ্যের নেট-বাজার :**

কৃষকরা যাতে নিজেদের পণ্য সরাসরি অনলাইনে বিক্রি করতে পারেন, সে জন্য কৃষিপণ্যের পাইকারি বাজারকে ইন্টারনেটের সুতোয় বাঁধার পরিকল্পনা করেছে কেন্দ্র। এই পরিকল্পিত নেট-বাজারে প্রথম দফায় থাকছে গুজরাত, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, অন্ধ্রপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ, হরিয়ানা, তেলঙ্গানা ও ঝাড়খণ্ড।

ন্যাশনাল এগ্রিকালচার মার্কেট (ন্যাম) প্রকল্পের প্রথম পর্বে ঠাঁই পাওয়া আট রাজ্যে ৫৮৫-টি কৃষিপণ্যের পাইকারি বাজারকে (মাণ্ডি) এক সূত্রে বাঁধবে নেট প্রযুক্তি। সেক্ষেত্রে ফড়েদের এড়িয়ে লাভের টাকা সরাসরি ঘরে তুলতে পারবেন কৃষকরা। তার উপর এই প্রকল্প বাস্তবায়িত করতে রাজ্যের কার্যত কোনও খরচও নেই। প্রযুক্তি ও পরিকাঠামো জোগানোর খরচ দেবে কেন্দ্র। প্রতি মাণ্ডির জন্য বরাদ্দের অঙ্ক ৩০ লক্ষ টাকা। চাল, গম, পেঁয়াজ, হলুদ, ছোলার ডাল-সহ মোট ২৫-টি কৃষিপণ্য কেনা-বেচা হবে এই নেট-বাজারে।

তবে এই দফায় তালিকায় নাম নেই পশ্চিমবঙ্গের। নেট-বাজারে ব্যবসা করতে কৃষি বিপণন (এগ্রিকালচারাল প্রোডিউস মার্কেট কমিটি বা এপিএমসি) আইনে যে রদবদল প্রয়োজন, এত দিনেও তা করে উঠতে পারেনি এ রাজ্য।

● **রয়টার্সের সমীক্ষায় ভারতীয় অর্থনীতির দ্রুত অগ্রগতির ইঙ্গিত :**

মার্কিন সংবাদ সংস্থা রয়টার্সের সাম্প্রতিক সমীক্ষায় ইঙ্গিত মিলেছে যে চলতি বছরেও এ দেশের অর্থনীতির চাকা গড়াবে দ্রুতগতিতে। আর্থিক বৃদ্ধিতে বিশ্বের বহু দেশকেই পিছনে ফেলবে ভারত। গত ৬ থেকে ১৩ এপ্রিলের মধ্যে রয়টার্সের করা এক সমীক্ষায় এই সম্ভাবনার কথা উঠে এসেছে। ১৪ এপ্রিল প্রকাশিত হয় এই প্রতিবেদন।

এদিকে যুক্তরাষ্ট্রে এক সভায় ভারতের অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি সম্প্রতি দাবি করেন, সদ্য শেষ হওয়া ২০১৫-১৬ সালে বৃদ্ধি প্রত্যাশা মতো ৭.৬ শতাংশই হবে। অবশ্য অর্থনীতিবিদেরা মনে করছেন, এর অনেকটাই মূল্যবৃদ্ধির হারের উপরও নির্ভর করবে। তাদের মতে, চলতি ২০১৬-১৭ আর্থিক বছরে গড়ে তা ৫.৩ শতাংশ ছুঁতে পারে।

● **কয়লা উৎপাদন বৃদ্ধি, আমদানি হ্রাস :**

কোল ইন্ডিয়ার কয়লা উত্তোলন ক্ষমতা বাড়ার ফলে সদ্য শেষ হওয়া অর্থবর্ষে (২০১৫-১৬) দেশের শিল্প সংস্থাগুলির আমদানি করা বিদেশি কয়লার উপর নির্ভরতা উল্লেখযোগ্য হারে কমে গিয়েছে। তাতে খরচ বেঁচেছে প্রায় ২৮ হাজার কোটি টাকা।

কয়লা উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হয়নি। তবুও ২০১৪-১৫ অর্থবর্ষের তুলনায় সদ্য শেষ হওয়া ২০১৫-১৬ সালে কোল ইন্ডিয়ার

কয়লা উত্তোলন বেড়েছে ৮.৫ শতাংশ—অর্থাৎ ৪.২ কোটি টন বেশি কয়লা উৎপাদন করেছে কোল ইন্ডিয়া। মোট কয়লা তোলা হয়েছে ৫৩ কোটি ৬০ লক্ষ টন। তবে লক্ষ্য ছিল ৫৫ কোটি টন। ফলে লক্ষ্যের চেয়ে উত্তোলন কম হয়েছে ১ কোটি ৪০ লক্ষ টন।

কোল ইন্ডিয়ার বাড়তি উৎপাদনের কারণে গত অর্থবর্ষে ৩ কোটি ৪২ লক্ষ টন কম কয়লা আমদানি করতে হয়েছে। যার ফলে ২৮ হাজার কোটি টাকা শিল্প সংস্থাগুলির বেঁচে গিয়েছে। ২০১৪-১৫ আর্থিক বছরের তুলনায় ২০১৫-১৬ অর্থবর্ষে কয়লা আমদানি ২৭ শতাংশ কমে গিয়েছে।

● **দেশের ৮৪৯-টি রাজ্য সরকারি সংস্থার ৩০ শতাংশই লোকসানে চলছে :**

দেশের ৮৪৯-টি রাজ্য সরকারি সংস্থার প্রায় ৩০ শতাংশই লোকসানে চলছে বলে গত ৭ এপ্রিল এক রিপোর্টে জানাল রিজার্ভ ব্যাংক। রিপোর্টে লোকসানে চলা সংস্থাগুলিকে ঘুরে দাঁড়ানোর দাওয়াইও বাতলেছে শীর্ষ ব্যাংক। সেই লক্ষ্যে বিলগ্নিকরণ, বেসরকারিকরণের কথা যেমন বলা হয়েছে, তেমনই জোর দেওয়ার প্রস্তাব রয়েছে গবেষণা ও উন্নয়নে। এছাড়া, সমীক্ষার মাধ্যমে বাজারের উপযুক্ত পণ্য তৈরিতে জোর, কর্মীদের সংস্থার শেয়ার দেওয়ার মতো পদক্ষেপ করলেও সংস্থাগুলির আর্থিক হাল ফিরতে পারে বলে মত প্রকাশ করেছে শীর্ষ ব্যাংক। পাশাপাশি, সংস্থাগুলির পরিচালনায় আরও অনেক বেশি স্বাধীনতা দেওয়ারও পক্ষপাতী রিজার্ভ ব্যাংক। তাদের দাবি, বেসরকারিকরণের আগে যদি সংস্থার আর্থিক স্বাস্থ্য ঢেলে সাজানো যায়, তা হলে বিক্রির সময় ভাল দাম মিলবে।

এদিকে, চতুর্দশ অর্থ কমিশনের সুপারিশ মানায় রাজ্যগুলিকে দেওয়া কেন্দ্রের অর্থের পরিমাণ মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের ০.৩ শতাংশ কমেছে বলেও রিপোর্টে দাবি। রাজ্যগুলিকে ইচ্ছে মতো প্রকল্পে খরচের জন্য করের ভাগ বাড়িয়েছে কেন্দ্র। কিন্তু তা সত্ত্বেও বরাদ্দ কমেছে বিভিন্ন কেন্দ্রীয় প্রকল্প বন্ধ হয়ে যাওয়ায়।

● **বিশ্ব বাণিজ্যের পূর্বাভাস কমালো ডব্লিউটিও :**

চলতি বছরে বিশ্বে বাণিজ্য বৃদ্ধির পূর্বাভাস কমিয়ে ২.৮ শতাংশ করল বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (ডব্লিউটিও)। আগে তা ৩.৯ শতাংশ হবে বলে জানিয়েছিল তারা। উন্নয়নশীল দেশগুলিতে চাহিদা কমা ও আর্থিক অস্থিরতাই এর কারণ বলে দাবি বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার।

● **নিউজিল্যান্ডের সঙ্গে বাণিজ্যিক গাঁটছড়া ভারতের :**

১ মে ভারতীয় রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায় এবং নিউজিল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী জন কি-এর উপস্থিতিতে সই হয় দু'দেশের মধ্যে বিমান পরিষেবা সংক্রান্ত চুক্তিপত্র। যার নিট ফল, ভারত ও নিউজিল্যান্ডের মধ্যে সরাসরি উড়ান সম্ভব হবে এখন থেকে। দু'দেশের মধ্যে গত পাঁচ বছর ধরেই আলোচনা চলছিল মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে। সম্প্রতি ছ'দিনের (২৭ এপ্রিল-২ মে) পাপুয়া নিউ গিনি ও নিউজিল্যান্ড সফরে যান রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়। প্রসঙ্গত, এটাই কোনও ভারতীয় রাষ্ট্রপতির প্রথম অকল্যান্ড সফর।

এই সফর চলাকালীন মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে জন কি এবং প্রণব মুখোপাধ্যায় দু'জনেই সরব হন। চুক্তিটি ভারত এবং নিউজিল্যান্ড দু'দেশের জন্যই লাভজনক। এর ফলে পারস্পরিক বিনিয়োগ বাড়বে। দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য বাড়ানোর যে অপার সম্ভাবনা রয়েছে তাকেও কাজে লাগানো যাবে। মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির পাশাপাশি কেন্দ্রীয় সরকারের মেক ইন ইন্ডিয়া, স্কিল ইন্ডিয়া, স্মার্ট সিটির মত এমন বেশকিছু প্রকল্প নিউজিল্যান্ডের সামনে তুলে ধরেন রাষ্ট্রপতি।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

● **ভারতের নিজস্ব জিপিএস ব্যবস্থার জন্য :**

নিজস্ব 'গ্লোবাল পোজিশানিং সিস্টেম' বা জিপিএস ব্যবসথা গড়ে তোলার জন্য সপ্তম তথা শেষ উপগ্রহটি মহাকাশে পাঠিয়েছে ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা ইসরো। ভারতের নিজস্ব জিপিএস ব্যবস্থার নাম দেওয়া হয়েছে 'নাবিক'।

২৮ এপ্রিল অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীহরিকোটায় সতীশ ধবন মহাকাশ কেন্দ্র থেকে দুপুর ১২টা ৫০ মিনিটে ইসরোর মহাকাশযান পিএসএলভি-সি৩৩ রওনা দেয় সপ্তম ন্যাভিগেশন স্যাটেলাইট আইআরএনএসএস-১জি-কে নিয়ে। এই ব্যবস্থা গড়ে তুলতে ভারতের খরচ হল ১৪২০ কোটি টাকা। ভারত হয়ে উঠল পৃথিবীর পঞ্চম দেশ, যাদের নিজস্ব জিপিএস ব্যবস্থা রয়েছে।

জিপিএস যোগাযোগের ক্ষেত্রে বিপ্লব এনে দিয়েছে। অচেনা জায়গায় হোক বা দুর্গম পাহাড়ে, জঙ্গলে হোক বা গভীর সমুদ্রে— জিপিএস ব্যবস্থার সুবিধা থাকলে পথ হারানোর ভয় নেই। নির্বিঘ্নে গন্তব্যে পৌঁছতেও কোনও সমস্যা নেই। জিপিএস ব্যবস্থা চালু করার জন্য যে উপগ্রহ বা স্যাটেলাইট মহাকাশে পাঠানো হয়, তাকে বলা হয় ন্যাভিগেশন স্যাটেলাইট। আবহাওয়া সংক্রান্ত পূর্বাভাস দিতেও এই স্যাটেলাইট খুব জরুরি।

পৃথিবীর অধিকাংশ দেশই যেখানে মার্কিন জিপিএস ব্যবস্থার সাহায্যে কাজ চালায়, সেখানে ভারত এবার কাজ করতে পারবে সম্পূর্ণ নিজস্ব জিপিএস-এর সাহায্যেই। এই ব্যবস্থার সুবিধা ভারতের প্রতিবেশী দেশগুলিকেও দেওয়া হবে।

● **প্রথম তৃণভোজী সরীসৃপের খোঁজ :**

বছর কয়েক আগে চিনে খোঁড়াখুঁড়ি করতে গিয়ে পাওয়া যায় এক আজব প্রাণীর দুই জীবাশ্ম। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, সরীসৃপটির নাম অ্যাটোপোডেন্টেটাস ইউনিকাস। অর্থাৎ যার দাঁতের গঠন আজব এবং অদ্বিতীয়। আজ থেকে প্রায় আড়াই হাজার লক্ষ বছর আগে তারা গভীর জলে চরে বেড়াত। তবে এখনও পর্যন্ত যে হাতে গোনা জলজ তৃণভোজী সরীসৃপের খোঁজ পাওয়া গিয়েছে, এটি সব চেয়ে পুরনো বলে অনুমান তাঁদের।

জীবাশ্ম পরীক্ষা করে বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, সরীসৃপটি আকারে প্রায় কুমিরের মতোই দীর্ঘ। রয়েছে একটি লম্বা লেজও। ছোট ছোট দুটো হাত পা-ও রয়েছে, তবে তা শরীরের ভার বেশি বইতে পারে না বলেই ধারণা গবেষকদের। পাতলা চামড়া দিয়ে হাত পায়ের আঙুলগুলো জোড়া। যেমন আজব দেহের আকার, তেমনই অদ্ভুত গঠন মাথার খুলিরও। জীবাশ্মে যে খুলি পাওয়া গিয়েছে তাতে কোনও ক্ষয়ক্ষতি ছিল না। তা সবিস্তার পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে, দেহের অনুপাতে মাথা ছিল অনেকটাই ছোট আর হাতুড়ির মতো চ্যাপ্টা। সেই সঙ্গে দাঁতের গঠন বলছে, গভীর জলের নীচে ছোট গাছপালা খেয়েই থাকত তারা।

● **অরুণাচলে 'হোয়াইট চিক্‌ড ম্যাকাক' বাঁদরের হদিস :**

অরুণাচলপ্রদেশের আনজাও জেলার অরণ্যে 'হোয়াইট চিক্‌ড ম্যাকাক' প্রজাতির বাঁদরটির সন্ধান পাওয়া গেছে। এত দিন ভাবা হতো শুধু তিব্বতের মোদগ এলাকাতেই তাদের দেখা মেলে।

একদল প্রাণী বিশেষজ্ঞ ও গবেষক গত বছর মার্চে পাখির ছবি তুলতে অরুণাচলের পূর্ব সীমানায় জঙ্গলে ঘুরতে ঘুরতে এই বাঁদরটি দেখতে পান। সবরকম পরীক্ষার পরে এখন নিশ্চিত হওয়া গিয়েছে— আনজাওয়ে মেলা বাঁদরটি রেস্যাস ম্যাকাক, অরুণাচল ম্যাকাক, অসম ম্যাকাক ও তিব্বতি ম্যাকাকের চেয়ে ভিন্ন প্রজাতির। তার মুখ ঘিরে বড় লোমের বিন্যাস, গলা থেকে পেটের লোমশ অংশ, কেশহীন ছোট লেজ, কালচে লাল মুখ, ঘাড়ে লম্বা ও ঘন চুল, থুতনির চারপাশে সাদাটে ধূসর রঙই তাদের অন্য ম্যাকাক প্রজাতি থেকে স্বতন্ত্র করেছে।

উল্লেখ্য, ২০১৩-১৪ সালে দক্ষিণ-পূর্ব তিব্বতের মোদগ এলাকায় ৬ মাসের অভিযান চালানোর পরে চিনা জীববিজ্ঞানীদের একটি দল একই প্রজাতির বাঁদরের সন্ধান পেয়েছিলেন। ২০১৫ সালে নতুন প্রজাতির অস্তিত্ব নিয়ে নিশ্চিত হওয়ার পর তাঁরা বাঁদরটির নাম দিয়েছিলেন 'হোয়াইট চিক্‌ড ম্যাকাক'।

● **পলিড্যাকটিলিজম-এর জেরে ৩১-টি আঙুল :**

হাত-পা মিলিয়ে মোট ৩১-টি আঙুল নিয়ে জন্মাল এক শিশু। কয়েক মাস আগের এই ঘটনা ঘটেছে চিনের বেজিংয়ে। জানা গিয়েছে, গত জানুয়ারিতে জন্মানো এই শিশুটির নাম হং হং। চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন, ডাক্তারি পরিভাষায় এই অবস্থাকে বলে পলিড্যাকটিলিজম। মানুষ, কুকুর এবং বিড়ালের ক্ষেত্রে এই ঘটনা ঘটতে পারে। চিলড্রেন হেলথকেয়ার অব আটলান্টার তরফে জানানো হয়েছে, প্রতি ১০০০ জনের মধ্যে এক জনের ক্ষেত্রে এই বিরল ঘটনা ঘটে। হং হংয়ের মায়েরও এই সমস্যা রয়েছে। তাঁর হাত এবং পায়ে ছ'টি করে আঙুল। কিন্তু অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে হং স্বাভাবিক জীবন পেতে পারে।

● **খরা কাটাতে মেঘে বৃষ্টির বীজ :**

আবহাওয়ার পরিবর্তন ও তার জেরে বিশ্ব উষ্ণায়নের কারণে সারা বিশ্ব জল সংকটের সম্মুখীন। অনাবৃষ্টির কারণে বাড়ছে খরা। এই পরিস্থিতিতে কৃত্রিম বৃষ্টি নামানোর পদ্ধতির ওপর আস্থা রাখছে বহু দেশ। প্রথমে, বিমানগুলি মেঘের উপর সোডিয়াম ক্লোরাইড অর্থাৎ নুনের গুঁড়ো ছড়িয়ে দেবে। এরপর ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড ও ক্যালসিয়াম অক্সাইডের মিশ্রণের প্রলেপ দেওয়া হবে মেঘের গায়ে। এতে শুকনো মেঘের আর্দ্রতা বাড়বে, আয়তনে ও ওজনেও ভারী হবে। সব শেষে কিছু বরফও রাখা হবে সেই মেঘে যাতে শুকনো মেঘগুলি পরিণত হবে জলভরা মেঘে। তাতেই নাকি নামবে বৃষ্টি।

মেঘের গায়ে বৃষ্টি বোনার এই পদ্ধতি ২০১১ সালেই শুরু করেছে চিন। এর পেছনে দেড় হাজার লক্ষ ডলার খরচও করেছে তারা। এক দশকের সব চেয়ে খারাপ খরা পরিস্থিতির মুখে দাঁড়িয়ে তাইল্যান্ড। মেঘেদের সঙ্গে বিজ্ঞানের মেলবন্ধনে এবার কৃত্রিমভাবে বৃষ্টি নামবে তাইল্যান্ডের বুকে। চলতি বছরে তাইল্যান্ডের মতোই এই পদ্ধতিতে বৃষ্টি নামানোর চেষ্টা করবে জর্ডনও। এর আগেও ১৯৮৯ সালে এই চেষ্টা করেছিল জর্ডন। তবে যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে তা সফল হয়নি।

খরা কাটাতেই যে এই প্রযুক্তিকে হাতিয়ার করা হচ্ছে তা নয়। ১৯৬৭ সালে মার্কিন-ভিয়েতনাম যুদ্ধের সময়ে এই উপায়েই যুদ্ধে সুবিধে পেতে ও শত্রুদেশে দুর্ভোগ তৈরি করার জন্য ভিয়েতনামে বেশি বৃষ্টিপাত ঘটিয়েছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

খেলা

● **টি-২০ বিশ্বকাপে দ্বৈত চ্যাম্পিয়ন ওয়েস্ট ইন্ডিজ :**

আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিলের টি-২০ বিশ্বকাপ প্রতিযোগিতার মহিলা ও পুরুষ, উভয় সংস্করণেই চ্যাম্পিয়ন হল ওয়েস্ট ইন্ডিজ।

ভারতে প্রথমবার এই টুর্নামেন্ট আয়োজিত হল। শেষবারের মতো দু-বছর অন্তর টি-২০ প্রতিযোগিতার সমাপ্তি হল এবারে। পরবর্তীতে চার বছর অন্তর অন্তর হবে তা। পরের আসর বসবে ২০২০ সালে।

এ বছর পুরুষদের টুর্নামেন্টের ষষ্ঠ আসর বসে ৮ মার্চ থেকে ৩ এপ্রিল। পূর্বতন চ্যাম্পিয়ন শ্রীলঙ্কা সুপার টেন পর্বে ইংল্যান্ডের কাছে ১০ রানে পরাজিত হয়ে প্রতিযোগিতা থেকে বিদায় নেয়। কলকাতার ইডেন গার্ডেন্সে ফাইনালে ইংল্যান্ডকে পরাজিত করে ওয়েস্ট ইন্ডিজ শিরোপা জয় করে। ভারতীয় ব্যাটসম্যান বিরাট কোহলি টুর্নামেন্টের সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিন হন, অন্যদিকে বাংলাদেশের তামিম ইকবাল এবং আফগানিস্তানের মোহাম্মদ নবী যথাক্রমে টুর্নামেন্টের সর্বোচ্চ রান সংগ্রহকারী এবং সর্বোচ্চ উইকেট সংগ্রহকারী হন।

অন্যদিকে, এটা ছিল মহিলাদের প্রতিযোগিতার ৫ম আসর। পূর্বতন চ্যাম্পিয়ন অস্ট্রেলিয়াকে ৮ উইকেটে পরাজিত করে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দল প্রথমবারের মতো শিরোপা লাভ করে। মহিলাদের প্রতিযোগিতাটি ১৫ মার্চ থেকে ৩ এপ্রিল পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়। সবমিলিয়ে ১০টি দেশ এই প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়।

ক্রিস গেইলদের মাঠে নামার আগেই টি-২০ বিশ্বকাপে প্রথম চ্যাম্পিয়ন হয় ওয়েস্ট ইন্ডিজের মেয়েরা। চার নম্বর বিশ্বকাপ জয়ের দৌড়ে থাকা অস্ট্রেলিয়াকে ইডেনে ফাইনালে আট উইকেটে হারায় তারা। ক্যারিবিয়ানদের জেতার জন্য ১৪৯ রানে টার্গেট রেখেছিল অস্ট্রেলিয়া। জবাবে ব্যাট করতে নেমে তিন বল বাকি থাকতেই ১৪৯-২ পৌঁছে যান স্টেফানি টেলররা। তাদের জয়ের নেপথ্যে ১৮ বছর বয়সি ওপেনার হেইলি ম্যাথেউজের ৪৫ বলে ৬৬ রানের পাশাপাশি ক্যাপ্টেন স্টেফানির ৫৭ বলে ৫৯ রানের দুরন্ত ইনিংস। এর আগে টি-২০-তে আট বার অস্ট্রেলিয়ার মুখোমুখি হয়ে এক বারও জয়ের মুখ দেখেনি ওয়েস্ট ইন্ডিজের মেয়েরা। এবারও অস্ট্রেলিয়া প্রথমে যে ভাবে দ্রুত রান তুলছিল তাতে চাপে পড়ে গিয়েছিল ক্যারিবিয়ানরা।

● **আইসিসি-র প্রথম স্বাধীন চেয়ারম্যান শশাঙ্ক মনোহর :**

বিসিসিআই প্রেসিডেন্ট পদ থেকে ইস্তফা দেওয়ার দু'দিনের মধ্যেই শশাঙ্ক মনোহরকে আইসিসি-র প্রথম স্বাধীন চেয়ারম্যান হিসেবে ঘোষণা করা হল। ক্রিকেটের সর্বোচ্চ নিয়ামক সংস্থার সংশোধিত গঠনতন্ত্র অনুযায়ী এখন থেকে আইসিসি চেয়ারম্যানের ক্রিকেট প্রশাসনের অন্য কোনও পদে থাকা চলবে না। আগে নিজের দেশের বোর্ড সামলেও আইসিসি-র সর্বোচ্চ পদে থাকা যেত। এখন থেকে আর তা হবে না। প্রসঙ্গত, বিসিসিআই-এর নতুন প্রেসিডেন্ট হয়েছেন অনুরাগ ঠাকুর।

আইসিসি-র চেয়ারম্যান বাছাইয়ের সময়সীমা ছিল ২৩ মে। তার এগারো দিন আগেই আইসিসি সর্বসম্মতিক্রমে মনোহরকে চেয়ারম্যান হিসেবে মেনে নিয়েছে।

সরকারি ঘোষণা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শশাঙ্ক মনোহর তাঁর দু'বছর মেয়াদের নতুন দায়িত্বে চলে এলেন। জুন মাসে এডিনবার্গে আইসিসি-র বার্ষিক সভায় তিনি কাজ শুরু করবেন।

● **র‍্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষে সানিয়া-মার্টিনা জুটি :**

রোমে মরসুমের ৫ নম্বর খেতাব জিতে নিলেন মার্টিনা হিঙ্গিস-সানিয়া জুটি। অন্যদিকে আবার মাদ্রিত ওপেনের ফাইনালে হেরে গিয়েও শীর্ষ স্থান ধরে রাখলেন তারা। ডব্লিউটিএ ডাবলস র‍্যাংঙ্কিংয়ে ১২০৪৫ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে থেকে গেলেন সানিয়া-মার্টিনা জুটি। মহিলা সিঙ্গলসে শীর্ষ স্থান ধরে রাখলেন সেরেনা উইলিয়ামস। রাদওয়ানস্কাকে তিন নম্বরে নামিয়ে দ্বিতীয় স্থানে উঠে এলেন জার্মানির আঞ্জেলিক কেরবার। ডোপ কেলেঙ্কারির জন্য সেরা ১০ থেকে ছিটকে গেলেন রাশিয়ার মারিয়া শারাপোভা।

অন্যদিকে, অস্ট্রেলিয়ার স্যাম গ্রোথকে সঙ্গে নিয়ে বুসান ওপেন জিতে এটিপি র‍্যাঙ্কিংয়ে ৫৬ থেকে ৫৪ নম্বরে উঠে এলেন লিয়েন্ডার পেজ। ভারতের রোহন বোপান্না ডবলস র‍্যাঙ্কিংয়ে ১৩ নম্বরে রয়েছেন।

সিডনি, ব্রিসবেন, অস্ট্রেলিয়া ওপেন এবং সেন্ট পিটার্সবার্গের পর এ বার রোম মাস্টার্স (ইটালিয়ান ওপেন)। ৮ মে ইটালিয়ান ওপেনে মেয়েদের টেনিসে বিশ্বের এক নম্বর জুটি সানিয়া মির্জা ও মার্টিনা হিঙ্গিস হারালেন এলিনা ভেসনিনা ও একাতেরিনা মাকারোভা জুটিকে। এই নিয়ে ইন্দো-সুইস জুটির ১৪-টি খেতাব জয়।

● **ফেডারেশন কাপ জয় মোহনবাগানের :**

দেশের এক নম্বর নক আউট টুর্নামেন্ট জিতে ভারত-সেরার ট্রফি তুলে নিল মোহনবাগান। ২১ মে গুয়াহাটির ইন্দিরা গান্ধী স্টেডিয়ামে সোনি-জেজে-কাতসুমি-গ্লেনের তোলা ঝড়ে বিধ্বস্ত হল আইজল এফসি। ফেডারেশন কাপের সেমিফাইনালে ৫-০ জয়ের পর ফাইনালেও ৫-০ জয় (সোনি ৪৮, ধনচন্দ্র ৫৯, জেজে ৭৩, ৮৮, বিক্রমজিৎ, ৮২) পেল সঞ্জয় সেনের টিম। ফেড কাপে যা আগে কখনও হয়নি।

ফেডারেশন কাপের ৩৭তম আসর শুরু হয় ৩০ এপ্রিল, ২০১৬-তে। ২০১৫-১৬ সালের আই-লিগের সেরা ৮ দল অংশগ্রহণ করে এ বারের টুর্নামেন্টে। সবচেয়ে বেশি বার ফেডারেশন কাপ জিতেছে মোহনবাগান। মোট ১৪ বার। এবারের ফেড কাপে সবচেয়ে বেশি গোল জেজের। ৮ গোল করেছেন তিনি। আগে ভাইচুং ভুটিয়া এবং ওকোলি ওডাফার ছিল ৭ গোল। ফেডারেশন কাপের ফাইনালের ইতিহাস সবচেয়ে বড় জয় মোহনবাগানের ৫-০। এর আগে সর্বোচ্চ জয় ছিল ১৯৭৯ সালে। বিএসএফ ৩-০ হারিয়েছিল মফৎলালকে। এই গুয়াহাটিতেই ফেড কাপে সবচেয়ে বেশি গোলও মোহনবাগানের ১৭। আগে ১৫ গোল ছিল। সেই রেকর্ডও বাগানই করেছিল ১৯৭৭।

● **টেস্ট ও একদিনের র‍্যাঙ্গিংয়ের শীর্ষে অস্ট্রেলিয়া :**

আইসিসির টেস্ট ও একদিনে র‍্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষে উঠে এল অস্ট্রেলিয়া (মে মাসের গোড়ায় প্রকাশিত)। একদিনের র‍্যাঙ্কিংয়ে দ্বিতীয় স্থানে নিউজিল্যান্ড ও তৃতীয় স্থানে ভারত। একমাত্র টি-২০-তে শীর্ষে রয়েছে ভারত। দ্বিতীয় স্থানে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও তৃতীয় স্থানে নিউজিল্যান্ড।

টেস্ট র‍্যাঙ্কিংয়ে অস্ট্রেলিয়া ১১৮ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে রয়েছে শীর্ষে। ছ'পয়েন্ট নেমে দ্বিতীয় স্থানে ভারত (১১২)। এক পয়েন্ট পিছনে তৃতীয় স্থানে রয়েছে পাকিস্তান। ইংল্যান্ড ১০৫ পয়েন্ট নিয়ে রয়েছেন চতুর্থ স্থানে। ৯৮ পয়েন্ট নিয়ে নিউজিল্যান্ড রয়েছে পাঁচে। তৃতীয় স্থান থেকে নেমে ছ'য়ে নেমে গিয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা (৯২)। এর পর শ্রীলঙ্কার পয়েন্ট ৮৮, ওয়েস্ট ইন্ডিজ ৬৫ ও বাংলাদেশ ৫৭ আর ১০ নম্বরে জিম্বাবোয়ে।

● **প্রিমিয়ার লিগ জিতে ইতিহাস লেস্টার সিটির :**

৬৪ বছরের ইতালীয় ক্লদিও র‍্যানিয়ারির হাত ধরে দু'টো ম্যাচ বাকি থাকতেই প্রিমিয়ার লিগ চ্যাম্পিয়ন হল লেস্টার সিটি। স্ট্যামফোর্ড ব্রিজে চেলসির সঙ্গে টটেনহ্যাম ড্র করার সঙ্গে সঙ্গে ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে গেল লেস্টার সিটি।

অথচ এর আগে চ্যাম্পিয়নশিপের ধারে কাছেও আসতে পারেনি তারা। সেই অসম্ভব স্বপ্নকে সম্ভব করলেন র‍্যানিয়ারি। ১ মে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডকে হারাতে পারলেই চ্যাম্পিয়ন হত লেস্টার। কিন্তু সে দিন ১-১ গোলে রেড ডেভিলসদের সঙ্গে ম্যাচ ড্র করে তারা। ফলে তাদের তাকিয়ে থাকতে হয়েছিল দু'নম্বরে থাকা টটেনহ্যাম আর চেলসি ম্যাচের দিকে। লড়াইয়ে টিকে থাকতে হলে স্ট্যামফোর্ড ব্রিজে এ দিন জিততেই হত স্পার্সদের। কিন্তু ম্যাচ শেষ হয় ২-২ ফলে। ক্লদিও র‍্যানিয়ারি জুভেন্তাস, চেলসি বা আটলেতিকো মাদ্রিদকে কোচিং করালেও তেমনভাবে সফল হননি। ২০০৪ সালে তাঁর হাত ধরে লিগে দু'নম্বর হয় চেলসি। কিন্তু সব কিছুকে ছাপিয়ে গেল এ দিনের সাফল্য।

● **ফেডারেশন কাপ জাতীয় অ্যাথলেটিক্স :**

ফেডারেশন কাপ জাতীয় অ্যাথলেটিক্সে একশো মিটারে ষোলো বছরের পুরনো জাতীয় রেকর্ড (১১.৩৮ সেকেন্ড) ভেঙে সোনা জিতলেন ওড়িশার দ্যুতি চন্দ। সময় ১১.৩৩ সেকেন্ড। পুরুষদের ১০০ সেমিফাইনালে জাতীয় রেকর্ড করলেন ওড়িশার অমিয় কুমার মল্লিক (১০.২৬ সেকেন্ড)।

নিজের জাতীয় রেকর্ড নিজেই ভাঙলেন ললিতা বাবর। মেয়েদের তিন হাজার মিটার স্টিপলচেজে। রিও অলিম্পিক্সের ছাড়পত্র পাওয়া ললিতার (৯ : ২৭.৯) সোনা জয়ের পাশাপাশি রুপো জিতে সুধা সিংহ (৯ : ৩১.৮৬) এদিন রিওর ছাড়পত্র পেলেন। এর আগে সুধা ম্যারাথনে রিও অলিম্পিক্স টিকিট পেয়েছেন। ৪০০ মিটারে রাজীব আরোকিয়া (৪৫.৪৭) জাতীয় রেকর্ড করে সোনা পেলেও অলিম্পিকের টিকিট ফস্কালেন ০.৭ সেকেন্ডের জন্য।

● **তিরন্দাজি তারকা দীপিকা কুমারীর বিশ্বরেকর্ড :**

ভারতীয় তিরন্দাজি তারকা দীপিকা কুমারী বিশ্বকাপে রিকার্ভ ইভেন্টে বিশ্বরেকর্ড স্পর্শ করলেন ২৭ এপ্রিল। প্রাক্তন বিশ্বসেরা দীপিকা ৭২-অ্যারো র‍্যাঙ্কিং রাউন্ডে অলিম্পিক্স সোনাজয়ী কোরিয়ার কি বো বায়ের রেকর্ড ছুঁলেন ৬৮৬ পয়েন্ট স্কোর করে। লন্ডন অলিম্পিক্সে ব্যক্তিগত ও দলগত বিভাগে সোনা রয়েছে এই কোরীয় তিরন্দাজের। তিনি তার দেশেরই কিংবদন্তি পার্ক সুং হিয়ুনের ১১ বছরের বিশ্বরেকর্ড (৬৮২ পয়েন্ট) ভাঙেন ২০১৫ সালেতে গুয়াংঝুতে।

এদিন প্রথম পর্বে ৩৪৬ পয়েন্ট পান ঝাড়খণ্ডের তিরন্দাজ দীপিকা। দ্বিতীয় পর্বে ৩৪১ পয়েন্ট পেলেই কোরীয় তারকার নজির টপকে ফেলতেন। কিন্তু এমন একটা অবস্থায় শেষ দিকে পরপর দুটো ৯ পয়েন্ট পান তিনি। দীপিকাকে তাই রেকর্ড স্পর্শ করেই সন্তুষ্ট থাকতে হয়।

● **আজলান শাহ হকির ফাইনালে ভারতের হার :**

সুলতান আজলান শাহ কাপের ফাইনালে ১৭ এপ্রিল ভারত অস্ট্রেলিয়ার কাছে হারল ০-৪-এ।

গ্রুপের শেষ ম্যাচে যে রকম দাপটে মালয়েশিয়াকে হারিয়ে ফাইনালে উঠেছিলেন সর্দার সিংহরা, ঠিক ততটাই দাপটে ফাইনালে তাদের হাত থেকে ম্যাচ ছিনিয়ে নিল অস্ট্রেলিয়া। শুধু তাই নয়, অস্ট্রেলিয়া টুর্নামেন্টে একটাও ম্যাচ না হেরে জেতার নজিরও গড়ল। সব মিলিয়ে রেকর্ড ন'বার চ্যাম্পিয়ন হল তারা। তথা আজলান শাহ হকির রজত জয়ন্তী বর্ষে রুপো নিয়েই ভারতকে সন্তুষ্ট থাকতে হল।

● **লা লিগায় চ্যাম্পিয়ন বার্সেলোনা :**

গ্রানাদা এফসি-কে ৩-০ হারিয়ে লা লিগায় চ্যাম্পিয়ন হয়ে গেল বার্সেলোনা। সুয়ারেস হ্যাটট্রিক করলেন। ২২ মিনিটে প্রথম গোল করেন তিনি। পরের গোলও বিরতির আগে। ৩৮ মিনিটে হেডে। আর হ্যাটট্রিকের গোল একদম শেষে। ৮৬ মিনিটে। এই শতাব্দীতে আট বার লা লিগা চ্যাম্পিয়ন হল বার্সেলোনা। সব মিলিয়ে ২৪ বার।

রোনাল্দো যেমন মরসুমে ৫০তম গোল করে ফেললেন, তেমনই সুয়ারেস রেকর্ড করে ফেললেন। এবারের লা লিগায় ৪০ গোল সুয়ারেসের। ১৯৮৯-৯০ সালে রিয়ালের হয়ে হুগো সাঞ্চেসের ৩৮ গোলের রেকর্ড ছিল। টিমকে চ্যাম্পিয়ন করার পাশাপাশি, এদিন সেই রেকর্ডও ভেঙে দিলেন সুয়ারেস। সোনার বুটও নিয়ে গেলেন। এখানে ৯৫ মাচে ৮৪ গোল হয়ে গিয়েছে তাঁর। এর আগে লিভারপুলের ১৩৩ ম্যাচে ৮২ গোল ছিল সুয়ারেসের।

বিনোদন

● **জাতীয় পুরস্কার :**

জাতীয় পুরস্কার বিজয়ীদের নাম আগেই (মার্চ ২৮) ঘোষণা করা হয়। ৩ মে অনুষ্ঠিত হয় পুরস্কার বিতরণ সমারোহ। ভারত সরকারের চলচ্চিত্র উৎসব নির্দেশনালয় শ্রেষ্ঠত্বের নিরিখে বিভিন্ন শ্রেণিতে এবছর যাদের সম্মানিত করেছে, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন : অভিনেতা-অমিতাভ বচ্চন (পিকু), অভিনেত্রী-কঙ্গনা রানাওয়াত (তনু ওয়েডস্ মনু রিটার্নস), চলচ্চিত্র-বাহুবলী: দ্য বিগিনিং, নির্দেশনা-সঞ্জয় লীলা ভানসালি (বাজিরাও মস্তানি)। এছাড়াও এবার দাদা সাহেব ফাল্কে সম্মানে ভূষিত করা হয়েছে অভিনেতা মনোজ কুমারকে।

● **পপ তারকা প্রিন্স প্রয়াত :**

মারা গেলেন মার্কিন পপতারকা 'প্রিন্স' রজার্স নেলসন। বয়স হয়েছিল ৫৭ বছর। ২১ এপ্রিল সকালে মিনেসোটার পেসলি পার্কে নিজস্ব রেকর্ডিং স্টুডিওর লিফ্টে তাঁর নিথর দেহ মেলে।

জন্ম জুন ৭, ১৯৫৮। দীর্ঘ ৩৫ বছরের কর্মজীবনে ৩৯-টি অ্যালবাম প্রকাশ করেছেন প্রিন্স। শুধু গায়ক নন, নিজের গান তিনি নিজেই লিখতেন। খোলা মঞ্চ হোক বা ক্যামেরার সামনে, সব জায়গাতেই দারুন জনপ্রিয় ছিলেন 'প্রিন্স'। ২০০৪ সালে 'পার্পল রেন' ছবির গানের জন্য অস্কার এবং ২০০৭ সালে 'হ্যাপি ফিট' ছবিতে 'সং অব দ্য হার্ট' গানটির জন্য গোল্ডেন গ্লোব পুরস্কার পেয়েছিলেন তিনি। পেয়েছেন সাতটি গ্র্যামি-সহ বহু খেতাব।

● **পুলিৎজার পেলেন সঙ্ঘমিত্রা কলিতা :**

পুলিৎজার সম্মান পেলেন সাংবাদিক সঙ্ঘমিত্রা কলিতা। লস অ্যাঞ্জেলস টাইমস টিমের সদস্য হিসেবে ব্রেকিং নিউজ রিপোর্টিং বিভাগে তিনি এই পুরস্কার জেতেন। সঙ্ঘমিত্রা ও তাঁর দল সান বার্নান্ডনো হামলার তদন্তের জন্য এই পুরস্কার পান। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবাদপত্র, অনলাইন জার্নালিজম, সাহিত্য ও সংগীতে সাফল্যের জন্য অন্যতম উল্লেখযোগ্য এই পুলিৎজার সম্মান।

অসমের বাসিন্দা মহেশ ও নির্মলা কলিতার সন্তান সঙ্ঘমিত্রা কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটির ছাত্রী ছিলেন। মার্কিন সংবাদ সংস্থা অ্যাসোসিয়েট প্রেস-এর নিউ জার্সি ব্যুরোর চাকরি দিয়ে সাংবাদিকতার কেরিয়ার শুরু করেন তিনি। নিউ ইয়র্কের সংবাদপত্র নিউজ ডে-তে ভারতীয় অর্থনীতি ও বিশ্ববাজারে ভারতের অবস্থান নিয়ে প্রতিবেদনের সিরিজ লিখে পরিচিতি পান তিনি। ২০০৩ সালে বেস্ট বিজনেস স্টোরি হিসেবে প্রকাশিত হয় তাঁর বেশ কিছু লেখা।

বিবিধ

● **১০০ মিনিটের মধ্যেই দিল্লি থেকে আগরা :**

গতিমান এক্সপ্রেসের সূচনার মধ্যে দিয়ে গতির প্রশ্নে নতুন মাইলফলক স্পর্শ করল ভারতীয় রেল। ৫ এপ্রিল ঠিক সকাল ১০টায় দিল্লির নিজামুদ্দিন স্টেশন থেকে গতিমান এক্সপ্রেসের ফ্ল্যাগ অফ করেন রেলমন্ত্রী সুরেশ প্রভু। গন্তব্য আগরা। সময় লাগলে ১০০ মিনিট।

বর্তমান ভারতীয় রেলের যা পরিকাঠামো তাতে আধুনিক ইঞ্জিনগুলি প্রায় ১৮০ কিলোমিটার গতি তুলতে সক্ষম। এলএইচবি কোচগুলিও সেই গতির সঙ্গে যাতে পাল্লা দিয়ে ছুটতে পারে সেই ভেবেই তৈরি করা হচ্ছে। চলতি বাজেটেই গতিমান ট্রেন চালানোর প্রতিশ্রুতি দেন রেলমন্ত্রী সুরেশ প্রভু। শতাব্দী এক্সপ্রেসের মডেলে স্বল্প দূরত্বের দু-তিনটি শহরের মধ্যে যোগাযোগ বাড়াতেই ব্যবহার হবে গতিমান। শতাব্দীর মতোই বসার ব্যবস্থা চেয়ারকারে। এছাড়া প্রথমবার এই ট্রেনেই রেলের পক্ষ থেকে ট্রেন হোস্টেসের মাধ্যমে পরিষেবা দেওয়ার শুরু করল রেল। ট্রেন যাত্রীদের জন্য রয়েছে বিনামূল্যে ইন্টারনেট পরিষেবা। যা ওয়াই-ফাই ব্যবস্থার মাধ্যমে নিখরচায় দিতে একটি বেসরকারি সংস্থার সঙ্গে হাত মিলিয়েছে রেল।

● **'প্রাচীনতম' কুঠারের হদিস অস্ট্রেলিয়ায় :**

পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার কিম্বারলে অঞ্চলে 'কার্পেন্টার্স গ্যাপ' বলে একটি জায়গা থেকে সন্ধান পাওয়া যায় মানুষের তৈরি 'সবচেয়ে প্রাচীন' কুঠারের অংশ। তৈরি হয় প্রায় ৫০ হাজার বছর আগে। বিজ্ঞানীদের ধারণা, এখানে এসেই অস্ট্রেলিয়ায় প্রথম ঘাঁটি গাড়ে একালের মানুষ। তবে আস্তানাটির খোঁজ মিলেছিল বছর কুড়ি আগেই। কিন্তু ২০১৪ সালে সেখানকার ভাঙা মূর্তি, অস্ত্র ইত্যাদি ঘাঁটতে ঘাঁটতে বিজ্ঞানীদের হঠাৎ দৃষ্টি আকর্ষণ করে কুঠারের এই অংশটি। সম্প্রতি তা 'অস্ট্রেলিয়ান আর্কিওলজি' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।

ছোট্ট নখের মতো টুকরোটা। ওটা যে আসলে একটা কুঠারের অংশ, তা প্রথম দেখার বোঝার কোনও উপায় নেই। তবে টুকরোটি পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর পুরাতত্ত্ববিদেরা জানিয়েছেন, এটি তৈরি ৪৫ থেকে ৪৯ হাজার বছর আগে। উপাদান, ব্যাসাল্ট অর্থাৎ আগ্নেয় শিলা। ❑

সংকলক : রমা মন্ডল এবং পম্পি শর্মা রায়চৌধুরী

যোজনা ? ক্যুইজ

বিষয় : বিশ্ব পরিবেশ দিবস

১. ১৯৭২ সালে 'স্টকহোম কনফারেন্স অন হিউমান এভায়রনমেন্ট' আয়োজিত হয় সুইডেনে। সেই দিনটি আজ বিশেষভাবে পালিত হয়। কোন দিন?

২. পরিবেশ সংক্রান্ত সচেতনতা ও সংরক্ষণের নিরিখে ২২ এপ্রিল দিনটি কেন তাৎপর্যপূর্ণ?

৩. পরিবেশ ও সংরক্ষণের ক্ষেত্রে রাষ্ট্র ও নাগরিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য ভারতীয় সংবিধানের কোন কোন ধারায় লিপিবদ্ধ আছে?

৪. ব্যাঘ্র সংরক্ষণ প্রকল্প 'প্রোজেক্ট টাইগার'-এর সূচনা কবে হয়েছিল?

৫. উত্তর আমেরিকার এক প্রজাতির পাখির শেষ পাখিটি ১৯১৪ সালে সিনসিনাটির চিড়িয়াখানায় মারা যায়। এই বিলুপ্ত প্রজাতির নাম কি?

৬. ভারতের কোন রাজ্যে প্রথমবার 'পরিবেশ বিদ্যা'-কে আলাদা একটি বিষয় হিসেবে বিদ্যালয়-স্তরে পাঠ্যসূচির আওতায় আনা হয়?

৭. 'ওয়ার্ল্ড ওয়াইল্ডলাইফ ফান্ড' কবে স্থাপিত হয়?

৮. ক্লোরোফ্লুরো কার্বন বায়ুমণ্ডলের উপর কী প্রভাবে ফেলে?

৯. শিম্ব-জাতীয় (লেগুমিনাস) উদ্ভিদের গোড়ায় এক প্রকার ব্যাকটেরিয়া বাস করে। এর ফলে একাধিকবার শিম্ব-চাষের মাধ্যমে মাটির গুণমানের উন্নতি হয় ও সারের প্রয়োজন কমে। এই ব্যাকটেরিয়ার নাম কী?

১০. BOD আর COD-র অর্থ কী?

১১. GLO বলতে আমরা কী বুঝি?

১২. আপতিত সূর্যরশ্মির সাপেক্ষে প্রতিফলিত সূর্যরশ্মির মানকে কী বলা হয়?

১৩. কোন চুক্তির উপর ভিত্তি করে কিয়োটো চুক্তিতে 'নমনীয়তার কৌশল'-গুলি যোগ করা হয়?

১৪. MIC একটি অত্যন্ত বিষাক্ত, উদ্বায়ী ও দাহ্য গ্যাস। সর্বদা ক্রিয়াশীল এই গ্যাসটি প্রচুর কার্বন ডাই-অক্সাইড উৎপন্ন করে। এর পুরো নাম কী?

১৫. ভারতে বন্যপ্রাণী সপ্তাহ বা 'ওয়াইল্ডলাইফ উইক' কবে পালন করা হয়?

উত্তর :

১. বিশ্ব পরিবেশ দিবস (জুন ৫)। ২. 'আর্থ ডে' (পৃথিবী দিবস)। ১৯৭০ সাল থেকে ২২ এপ্রিল 'আর্থ ডে' পালন করা হয়। ৩. ৪৮এ এবং ৫১জি। ৪. ১৯৭৩। ৫. 'প্যাসেঞ্জার পিজিয়ন' (এক্টোপিস্টেস মাইগ্রেটোরিয়াস)। এক প্রকার বন্য পরিযায়ী পায়রা। ৬. মহারাষ্ট্র (২০০৬ সাল নাগাদ)। ৭. ১৯৬১। ৮. ক্লোরোফ্লুরো কার্বন বা CFC-র প্রভাবে বায়ুমণ্ডলে ওজোন (O_3)-এর মাত্রা হ্রাস পায়। ৯. নাইট্রোসমোনাস। এই ব্যাকটেরিয়া বাতাসের নাইট্রোজেন গ্যাস অজৈব নাইট্রোজেন যৌগে পরিবর্তন করে মাটিকে আরও উর্বর করে। তাই সারের প্রয়োজন কমে যায়। ১০। BOD অর্থাৎ রায়োকেমিকাল বা বায়োলজিকাল অক্সিজেন ডিমান্ড আর COD, অর্থাৎ কেমিকাল অক্সিজেন ডিমান্ড। ১১. GLO অর্থাৎ গ্রাউন্ড লেভেল ওজোন মাটির কাছে সূর্যালোকের উপস্থিতিতে উদ্বায়ী জৈব যৌগ ও নাইট্রোজেন-এর অক্সাইড-এর মধ্যে রাসায়নিক বিক্রিয়া হলে এই গ্যাস তৈরি হয়। তবে এধরনের ওজোন পরিবেশের জন্য ক্ষতিকারক। ১২. অ্যালবেডো (Albedo)। ১৩. মারাকেশ চুক্তি। 'কনফারেন্স অফ পার্টিস'-এর জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত তৃতীয় আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে স্বাক্ষরিত হয়েছিল কিয়োটো চুক্তি (Kyoto Protocol)। মারাকেশ চুক্তি (Marrakech Accord) স্বাক্ষরিত হয় সপ্তম দফায়, ২০০১ সালে। ১৪. মিথাইল আইসোসায়ানেট। কার্বারিল নামক কীটনাশক উৎপাদনের অন্যতম প্রধান উপাদান এই গ্যাস। গ্যাসটিকে স্থিতিশীল রাখার জন্য ব্যবহার করা হয় ফসজিন গ্যাস আর ঠান্ডা রাখার জন্য ইস্পাতের হিমায়িত কক্ষে সংরক্ষণ করা হয়। ১৫. ২-৮ অক্টোবর। সূচনা হয় ১৯৫২ সালে।

১০ কোটি এলইডি বাল্ব বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা ছুঁল 'উজালা' প্রকল্প

'সকলের জন্য সুলভে এলইডি-র মাধ্যমে উন্নত জ্যোতি' (উন্নত জ্যোতি বাই অ্যাফোর্ডেবেল এলইডি-স্ ফর অল) বা সংক্ষেপে 'উজালা' (অর্থাৎ উজ্জ্বলতা) ভারত সরকারের একটা প্রকল্প যার প্রধান উদ্দেশ্য বিদ্যুৎ বা শক্তি সাশ্রয় (এনার্জি এফিশিয়েন্সি) করা ও কার্বন নির্গমন ৩০-৩৫ শতাংশ কমানো। সম্প্রতি ১০ কোটি এলইডি বাল্ব বণ্টনের লক্ষ্যমাত্রা ছুঁল এই সফল প্রকল্প।

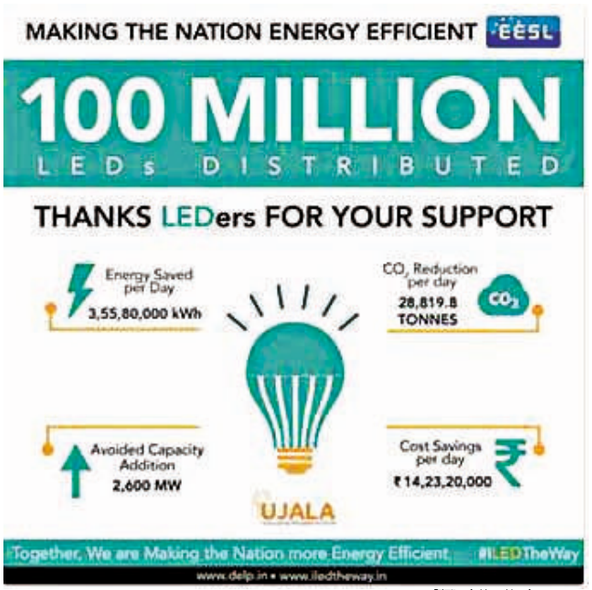

সূত্র : http://pib.nic.in

উজালা প্রকল্পের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সাশ্রয়কারী আলোর ব্যাপারে সচেতনতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। ২০১৪-১৫ সালে মাত্র ৩০ লক্ষ এলইডি বাল্ব বিতরণ করা হয়েছিল। ২০১৫-১৬ সালে মোট ১৫ কোটিরও বেশি এলইডি বাল্ব বিতরণ করা হয়েছে। এর মধ্যে ৯ কোটি এলইডি বাল্ব উজালা প্রকল্পের মাধ্যমে সরকারের তরফ থেকে দেওয়া হয়, এবং বাকিটা শিল্পমহলের অবদান। ভারত সরকার নিশ্চিত যে এ বছর আরও ২০ কোটি এলইডি বাল্ব বণ্টন করা সম্ভব হবে। আশা করা যায় যে উজালা প্রকল্পের মাধ্যমে অবিরাম প্রচেষ্টা ও শিল্পমহলের সহযোগিতায় ২০১৯ সালের মার্চ মাসের মধ্যে ৭৭ কোটি 'ইনএফিশিয়েন্ট' (অতিরিক্ত মাত্রায় বিদ্যুৎ ব্যয়কারী) বাল্ব বদলে ফেলার উদ্দেশ্য সফল হবে।

বিশ্বজুড়ে দেখা গেছে যে বাড়িতে বিদ্যুৎ সাশ্রয়কারী আলোর ব্যবহার করা শক্তি সাশ্রয়ের ক্ষেত্রে অন্যতম কার্যকরী পদক্ষেপ। ভারতে ১০ কোটি এলইডি বাল্ব বণ্টনের মাধ্যমে বছরে ১,২৯৮ কোটি কিলোওয়াট-আওয়ার বিদ্যুৎ সাশ্রয় করা সম্ভব হয়েছে। এর ফলে বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষেত্রে 'পিক লোড' (বিদ্যুতের চাহিদার সর্বোচ্চ মাত্রা) ২৬ হাজার মেগাওয়াট কম হয়েছে। আর সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব হল যে আমাদের দেশ বছরে ১ কোটি টনেরও বেশি কার্বন ডাই-অক্সাইড নির্গমন কমাতে পেরেছে। এলইডি (লাইট এমিটিং ডায়োড) বাল্বের জন্য সিএফএল (কম্প্যাক্ট ফ্লোরেসেন্ট লাইট)-এর তুলনায় অর্ধেক ও 'ইনক্যান্ডেসেন্ট' (তাপোজ্জ্বল) বাল্বের দশ ভাগের এক ভাগ বিদ্যুৎ খরচ হয়। উজালা বিশ্বের বৃহত্তম ভরতুকি-হীন এলইডি বণ্টন প্রকল্প। যে সব উপভোক্তা এই বাল্ব ব্যবহার করছেন, তাদেরও বিদ্যুতের মাশুলবাবদ খরচ অনেকটাই কমেছে। রাজ্য সরকারগুলোও স্বেচ্ছায় এই প্রকল্প গ্রহণ করছে এবং ইতিমধ্যে ১৩ রাজ্যে প্রকল্পটি চালু রয়েছে। এক মাসের মধ্যেই 'এনার্জি এফিশিয়েন্সি সার্ভিসেস লিমিটেড' (ইইএসএল) আরও ৩ রাজ্যে বণ্টনের কাজ শুরু করবে।

উজালা প্রকল্পের মাধ্যমে জাতীয় সাশ্রয় :

- আনুমানিক বার্ষিক বিদ্যুৎ সাশ্রয়—১,২৯৮ কোটি কিলোওয়াট-আওয়ার
- পিক লোড -এর আনুমানিক হ্রাস—২৬০০ মেগাওয়াট
- উপভোক্তাদের বিদ্যুতের বিলে আনুমানিক বার্ষিক ব্যয় হ্রাস—৫,১৯৫ কোটি টাকা
- আনুমানিক বার্ষিক গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমনে হ্রাস—১ কোটি টন কার্বন ডাই-অক্সাইড

উজালা প্রকল্পের সুবিধা পেতে উপভোক্তাকে শুধু www.delp.in ওয়েবসাইটে গিয়ে তার নিকটতম বণ্টন কেন্দ্র খুঁজে নিতে হবে। এই প্রকল্প আজ এক বিপ্লবে পরিণত হয়েছে এবং প্রত্যেক ব্যক্তিরই ভূমিকা এখানে গুরুত্বপূর্ণ। এলইডি বাল্ব ব্যবহার করার ফলে যে পরিমাণ বিদ্যুৎ সাশ্রয় করা হচ্ছে, তা দেশের অন্যত্র কোনও বাড়িকে আলোকিত করতে সাহায্য করছে।

Published on 10th of every month
Posted on 12-13 of every month
DHANADHANYE (Yojana-Bengali)
Price Rs. 22.00

June, 2016
R.N.I. No. 19740/69

Subscription Coupon

[For New Membership / Renewal / Change in Address]

I want to subscribe to _____ (Journal's name & language)

☐ 1. yr. for Rs. 230/- ☐ 2. yrs. for Rs. 430/- ☐ 3. yrs. for Rs. 610/-

DD/MO No. _____ Date _____

Name (in block letters) _____

Category Student / Academician / Institution / Others

Address _____

_____

PIN ☐☐☐☐☐☐

Phone _____

P.S. : For Renewal / change in address — please quote your subscription No. ☐

Please allow 8 to 10 weeks for the despatch of 1st issue.

ATTENTION PLEASE

The DD/MO should be drawn in favour of :

The Editor

Dhanadhanye (Yojana - Bengali)

Publications Division

8, Esplanade East, Kolkata-700 069

কেন্দ্রীয় তথ্য এবং সম্প্রচার মন্ত্রকের পক্ষে প্রকাশন বিভাগের অতিরিক্ত মহানির্দেশক, ড. সাধনা রাউত কর্তৃক
৮ এসপ্ল্যানেড ইস্ট, কলকাতা-৭০০ ০৬৯, ফোন ঃ ২২৪৮ ২৫৭৬ থেকে প্রকাশিত এবং
ইস্ট ইন্ডিয়া ফটোকম্পোজিং সেন্টার, ৬৯, শিশির ভাদুড়ী সরণী, কলকাতা-৭০০ ০০৬ থেকে মুদ্রিত।